বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে মসজিদের ভূমিকা

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ-২০১৩)

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ আবদুল বাকী

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

GIFT

গবেষক

মোঃ রেজাউল করিম

পি-এইচ.ডি.গবেষক

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ৪/২০০৮-২০০৯

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library

465996

465996

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে মসজিদের ভূমিকা

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি–এইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ – ২০১৩)

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রত্যয়ন পত্র		৫
কৃতজ্ঞতা স্বীকার		৬
প্রতি বর্ণায়ন		৭-৮
সংকেত সূচি		৯-১০
ভূমিকা		১১-১৬
প্রথম অধ্যায়	: বাংলাদেশের মসজিদ এবং সমাজজীবনে মসজিদের ভূমিকা	১৭-৬৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	: নারীর মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে বিশ্বসভ্যতা, বিভিন্ন ধর্ম ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ	৬৫-২২৭
তৃতীয় অধ্যায়	: বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের কারণ ও প্রকৃতি	২২৮-২৬৫
চতুর্থ অধ্যায়	: নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ইসলামী বিধান এগুলোর প্রচার ও প্রসারে মসজিদের ভূমিকা	২৬৬-২৮৫
উপসংহার		২৮৬-২৮৭
গ্রন্থপঞ্জী		২৮৮-৩০০

465996

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পি-এইচ.ডি. গবেষক **মোঃ রেজাউল করিম** (রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ৪/২০০৮-০৯) আমার সার্বিক তত্ত্বাবধায়ন ও নির্দেশনায় **"বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে মসজিদের ভূমিকা"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছে। এটি গবেষকের মৌলিক ও একক গবেষণা কর্ম। ইতোপূর্বে অভিসন্দর্ভটি কোথাও প্রকাশিত হয়নি বা ডিগ্রি লাভের জন্য অন্য কোথাও উপস্থাপিত হয়নি। আমি পি-এইচ.ডি. ডিগ্রি প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে অভিসন্দর্ভটি জমা নেয়ার জন্য সুপারিশ করছি।

(ড. মুহাম্মদ আবদুল বাকী)

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক, পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু। যাঁর সীমাহীন অনুগ্রহে **"বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে মসজিদের ভূমিকা"** শীর্ষক গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হলো। অজুত-কোটি দরূদ মানবতার মুক্তিদূত বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর প্রতি, যিনি দিয়েছেন সত্য ও সুন্দরের শাশ্বত নির্দেশনা।

শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং এই গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক **অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুল বাকী** স্যারের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাঁর সহযোগিতা ও নির্দেশনা ছাড়া এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব ছিলো না। বিভাগীয় সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ নানা পরামর্শ প্রদান করে গবেষণাকে ত্রুটিমুক্ত করার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। তাঁদের প্রত্যেককে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। গবেষণা কর্মে আমি যাঁদের লেখা ব্যবহার করেছি তাঁদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমার মা, সহধর্মিণী, সহোদর, স্বজন, বন্ধু, সহকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে যাঁরা আমাকে এ কাজে উৎসাহ দিয়েছেন, আমি তাঁদের নিকটও কৃতজ্ঞ।

০২/০২/২০১০
(মোঃ রেজাউল করিম)

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি বর্ণায়ন

মূল বর্ণ	প্রতি বর্ণায়ন	মূল বর্ণ	প্রতি বর্ণায়ন	মূল বর্ণ	প্রতি বর্ণায়ন
a	এ, আ	o	অ, ও	ز	য
ay	ে	p	প	س	ছ
b	ব	r	র, ড়, ঢ়	ش	শ
bh	ভ	s	স	ص	ছ
c	ক, স	sh	শ	ض	দ
ch	চ	t	ট	ط	ত
d	ড / দ	th	দ, থ, ছ	ظ	য
dh	ধ	u	উ	ع	'অ 'ই 'উ
dj	জ	v	ভ	غ	গ
f	ফ	w	ওয়া	ف	ফ
g	গ / জ	y	ে / আই	ق	ক
gh	ঘ	z	জ	ك	ক
h	হ	ا	অ, আ	ل	ল
i	ই / আই	ب	ব	م	ম
j	য	ت	ত	ن	ন
jh / zh	ঝ	ث	ছ	و	ওয়া

Dhaka University Institutional Repository

মূল বর্ণ	প্রতি বর্ণায়ন	মূল বর্ণ	প্রতি বর্ণায়ন	মূল বর্ণ	প্রতি বর্ণায়ন
k / q	ক	ج	জ	ه	হ
kh	খ	ح	হ	لا	লা
l	ল	خ	খ	ء	আ
m	ম	د	দ	ي	য়্যা /ইয়া
n	ন	ذ	য		
o	ও অ	ر	র, ড়, ঢ়		

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত সূচী

অপ্র : অপ্রকাশিত

আ : আলাইহিস সালাম

ইং : ইংরেজি

বাং : বাংলা

হি : হিজরি

খ্রি : খ্রিস্টাব্দ

খ্রি পূ : খ্রিস্ট পূর্ব

জ : জন্ম

মৃ : মৃত্যু

সা : সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

রা : রাদিআল্লাহু আনহু / রাদিআল্লাহু আনহুম / রাদিআল্লাহু আনহা / রাদিআল্লাহু আনহুন্না

রহ : রহমাতুল্লাহু আলাইহি / রহমাতুল্লাহু আলায়হা

ড : ডক্টর

অনূ : অনূদিত

অনু : অনুবাদ

পৃ : পৃষ্ঠা

খ. : খণ্ড

ইফাবা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

প্রাগুক্ত : পূর্বে কথিত বা উল্লিখিত (একই সূত্র পরপর ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত)

পূর্বোক্ত : পূর্বে কথিত বা উল্লিখিত (একই সূত্র অন্য সূত্রের পরে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত)

টী. : টীকা

v. : Volume

p : page

pp. : pages

ibid : in the same book or same piece of writing as the one that has just been mentioned (from Latin 'ibidem).

op.cit : used in formal writing to refer to a book or an article that has already been mentioned.

USD : United State's Dollar

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ। এর জনসংখ্যার ৮৯.৬% ভাগ মুসলিম।[1] তৃতীয় বিশ্বের[2] দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম দরিদ্র[3] এই দেশটি নানাবিধ সমস্যায় আক্রান্ত যার মধ্যে নারী নির্যাতনের

---

[1] *Bangladesh: An Overview, 2008 Statistical Yearbook of Bangladesh.* Government of The People's Republic of Bangladesh, 28th Edition, March 2009, p.XVII

[2] মাও সে তুং-এর আমলে চীন এই তৃতীয় বিশ্ব (Third World) তত্ত্ব হাজির করে। এই তত্ত্বানুযায়ী দুই পরাশক্তি ও উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহকে নিয়েই প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব। আর এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অনুন্নত দেশসমূহকে নিয়েই গঠিত তৃতীয় বিশ্ব। তৃতীয় বিশ্বের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত পশ্চাৎপদতা এবং দারিদ্র্য। চীন নিজেকেও এই বিশ্বের অন্তর্ভূক্ত বলে দাবি করে। কিন্তু কার্যত দেখা যায় যে, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বের অন্তর্ভূক্ত নয় এমন সব দেশের অবস্থা এক রকম নয়। যেমন, চীন-ভারত প্রভৃতি দেশের উন্নয়নের পর্যায় ভুটান, বাংলাদেশ বা ইথিওপিয়ার উন্নয়নের পর্যায়ের সঙ্গে তুলনীয় নয়। অন্যদিকে তৈলসমৃদ্ধ কুয়েত-ব্রুনেই প্রমুখ দেশের প্রাচুর্য তো বলতে গেলে সীমাহীন। কিছুদিন পূর্বে জাতিসংঘ বিশ্বের দরিদ্রতম ও অনুন্নত দেশসমূহকে চতুর্থ বিশ্ব বলে চিহ্নিত করেছে। (হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ*, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, আগস্ট-২০০০, পৃ.১৯৬-৯৭) এ হিসেবে বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের পরিবর্তে চতুর্থ বিশ্বের অন্তর্ভূক্ত হওয়াই বেশি যৌক্তিক।

[3] কেউ কেউ বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে দেখতে চান এবং সে হিসেবে উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যেই বাংলাদেশকে অন্তর্ভূক্ত করেন। জনগোষ্ঠীর কেউ কেউ আন্তর্জাতিক বিবেচনায় বিত্তশালী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুবাদে কিংবা দেশের অবকাঠামোগত ও যোগাযোগ উন্নয়ন এবং বিত্তশালী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষাপটে তাদের বক্তব্যকে অনেকে সত্য বলে বিশ্বাসও করেন। কিন্তু পরিসংখ্যান এবং বাস্তবতা প্রমাণ করে, বাংলাদেশ প্রকৃতই একটি দরিদ্র দেশ। বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪০ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। শহরে এই হার ২৮.৪% ভাগ এবং পল্লীতে ৪৩.৮ শতাংশ। বর্তমানে চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে দেশের ২৫.১ শতাংশ লোক যাদের ১৪.৬ শতাংশ শহরে বাস করে আর পল্লী অঞ্চলে বাস করে ২৮.৬ শতাংশ লোক। (মোঃ রুহুল আমিন, *আমার বিশ্ব*, ওরিয়েন্ট পাবলিকেশন্স, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৮, পৃ.৭৯-৮০) একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠি দেশটিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রার মান, শিক্ষা ও সঞ্চয়। বাংলাদেশের মানুষের বার্ষিক মাথাপিছু আয় ৫৯৯ মার্কিন ডলার (*অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৮*, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ঢাকা ২০০৯)। ২০০৭-২০০৮ সালে মানব উন্নয়ন সূচকে ১৭৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিলো ১৪০তম (*জনসংখ্যা বিষয়ক জরিপ প্রতিবেদন রিপোর্ট*, নিপোর্ট, ২০১০)। শিক্ষায়-সঞ্চয়ে এ দেশের অবস্থা হতাশাব্যঞ্জক। শিক্ষিত বা কর্মক্ষম লোক নয় বরং স্বাক্ষর জ্ঞান আছে দেশে এমন লোকদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৬২.৬৬% ভাগ। (*অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৮*, পৃ.১) সুতরাং বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ নয়। সন্দেহাতীতভাবে দরিদ্র দেশ। জনগোষ্ঠীর কিছু সংখ্যক লোকের উন্নতি দেশকে উন্নয়নশীল প্রমাণ করে না বরং দেশে বিদ্যমান দারিদ্র্যের সর্বজন স্বীকৃত প্রমাণই প্রতিষ্ঠা করে।

Dhaka University Institutional Repository

কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। নারী নির্যাতন বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সামাজিক সমস্যা।[১] ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক কাঠামো, সম্পদ ও সুযোগের অসম বণ্টন, মানসিক চাপ ও বিচ্যুত আচরণ, সামাজিক পরিবর্তন, জনসংখ্যার ত্রুটিপূর্ণ কাঠামো, মৌল-মানবিক চাহিদার অপূরণ, সাংস্কৃতিক শূন্যতা ও ভিনদেশী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ, মূল্যবোধগত দ্বন্দ্ব, অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও শহরায়ন, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নিরক্ষরতা এবং বিশেষত নৈতিক অবক্ষয়জনিত নানা কারণে বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের মত সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে। একটি মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশে সমস্যা তৈরির এ সকল কারণ এবং কারণের প্রতিক্রিয়া হিসেবে সৃষ্ট নারী নির্যাতন সমস্যার উপস্থিতি পুরোপুরি অনভিপ্রেত, অনাকাঙ্ক্ষিত ও অবাস্তব। কারণ ইসলামে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি প্রতিটি দিক ও বিভাগের সকল সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়েছে। সমস্যার যেন উদ্ভবই না ঘটে তা নিশ্চিত করতে নানা রকম কার্যকর নৈতিক ও বিধানগত প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয়েছে। কেউ যদি এ সকল বিধান মেনে না চলে কিংবা মেনে চলায় শৈথিল্য দেখায় অথবা বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এ সকল বিধান মেনে চললে, বিধানের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন করলেই কেবল একজন মানুষ মুসলিম হিসেবে গণ্য হতে পারে, অন্যথায় নয়।[২] রাসূলুল্লাহ

---

[১] বাংলাদেশে দৃশ্যমান-বিদ্যমান সমস্যাসমূহের সবগুলোকে এককভাবে এবং সামষ্টিকভাবে সামাজিক সমস্যা হিসেবে গণ্য করা যায়। কারণ এ দেশের প্রতিটি সমস্যা অপরাপর সমস্যার সাথে সম্পৃক্ত। একটি অপরটির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। একটি সমস্যা অন্য একটি সমস্যা থেকে উদ্ভূত। যেমন বাহ্যত দারিদ্র্য একটি অর্থনৈতিক সমস্যা। কিন্তু এর উদ্ভব ও বিস্তারে অশিক্ষা, বেকারত্ব, সম্পদের অসম বণ্টন, অপরিকল্পিত পরিবার ব্যবস্থাপনা, রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও স্থিতিশীলতা ইত্যাদি নানা কারণ দায়ী। আবার দারিদ্র্যের প্রকৃতি ও প্রভাব এমন যে, আর্থিক সমস্যা হলেও তা সমাজবদ্ধ মানুষকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে তা সামাজিক সমস্যা। সাধারণ একটি মিথ্যাচারকেও ব্যক্তিগত সমস্যা হিসেবে দেখার উপায় নেই। কারণ ব্যক্তি সমাজের অন্যান্য লোকদের সাথে মিথ্যাচার করে এবং এর কুপ্রভাব সামাজিকভাবেই সকলকে ভোগ করতে হয়। সমস্যার প্রকৃতি ভিন্ন হলেও সামষ্টিক প্রভাব বিবেচনায় তাই বাংলাদেশের অধিকাংশ সমস্যাকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

[২] বাংলাদেশে অধিকাংশই আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে মুসলিম। মা-বাবা বা পূর্বপুরুষ মুসলিম ছিলেন বলেই আমাদের মুসলিম নামকরণ হয়েছে, আমরা রমযান শেষে ঈদ করি, হজ করি, কুরবানী করি, শবে বরাতে-জুম'আয় মসজিদে হাজির হই। কিন্তু জেনে বুঝে ইসলাম মেনে চলি না। অথচ আমাদের মনে রাখা অত্যন্ত জরুরী যে, প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ছাড়া কেউ যেমন উত্তরাধিকারসূত্রে চিকিৎসক হতে পারে না, তেমনি প্রয়োজনীয় জ্ঞান, মূল্যবোধ ও চরিত্র ছাড়া কেউ মুসলিমও হতে পারে না। উত্তরাধিকারসূত্রে মুসলিম হওয়ার কারণে আমরা সৌভাগ্যবান যে, আমরা ন্যূনতম পর্যায়ের হলেও একটা ইসলামী পরিবেশ পেয়েছি। না হলে হয়তো কোনোদিন আমাদের ইসলাম গ্রহণ করাই

Dhaka University Institutional Repository

(সা) বলেছেন, "সে ব্যক্তি মুমিন নয় যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুমিন নিরাপদ নয়।"[১] মহানবী (স)এর এ ঘোষণা সাধারণভাবে সকল নির্যাতনের বিরুদ্ধে ইসলামের সুদৃঢ় অবস্থানের এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত। অন্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাকে তিনি মুমিন হওয়ার শর্ত ঘোষণা করার মাধ্যমে নির্যাতনের পথ স্থায়ীভাবে রুদ্ধ করে দিয়েছেন। নারী নির্যাতনও এর অন্তর্ভুক্ত। তাই ব্যক্তি যদি মুসলিম হতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই নারী নির্যাতন থেকে দূরে থাকতে হবে। ইসলামের এ শিক্ষার কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের বাংলাদেশে নারী নির্যাতন জাতীয় সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার কথা না। কুর'আন মজীদে প্রত্যক্ষ ঘোষণায় মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'আলা এ কাজ নিষিদ্ধ করেছেন। মহানবী (স) আখিরাতে তো বটেই এমনকি পৃথিবীতেই একে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা দিয়েছেন এবং এ অপরাধের দণ্ডবিধান কার্যকর করেছেন। এমতবস্থায় বিচ্ছিন্নভাবে মুসলিমদের কেউ কেউ এই নারী নির্যাতনের অপরাধে লিপ্ত হলেও হতে পারে। কিন্তু মুসলিম সমাজে এ সমস্যা সামষ্টিক সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হবে, এটা অকল্পনীয়। কারণ মুসলিম হওয়ার পাশাপাশি নারী নির্যাতনের মত অনাচারে অভ্যস্ত হওয়া একেবারেই অসম্ভব। এটা হতে পারে তখনই যখন মুসলিমগণ নামে মাত্র মুসলিম হবেন। কাজে, বিশ্বাসে, আচরণ ও মূল্যবোধে মুসলিম হবেন না। চিন্তায়, দর্শনে, নীতি প্রণয়নে মুসলিম হবেন না।[২]

দুঃখজনক ব্যাপার হলো, বাংলাদেশে শেষোক্ত অবস্থাই বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের দেশে নির্বিচারে চলছে নারী নির্যাতন। যে সকল বিষয় মুসলিমের জন্য হারাম, মুসলিমরা বুঝে বা না বুঝে, জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে সে হারামই জীবনে অনুশীলন করছেন, লালন করছেন। মুসলিম দেশে বিপুল জনগোষ্ঠী নিরক্ষর থাকছেন। যারা শিক্ষা গ্রহণ করছেন, তাদের

হতো না। আল্লাহর অশেষ করুণায় আমাদের জন্ম যেহেতু মুসলিম পরিবারে হয়েছে সুতরাং আমাদের একান্ত কর্তব্য, এ পরিচয়ের প্রকৃত দাবি পূরণ এবং যথার্থ বৈশিষ্ট্য অর্জনে চেষ্টা করা।

[১] মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খতীব, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, দিল্লী ১৩৮৭ হিজরি, পৃ.১১

[২] মুসলিম দেশ হিসেবে এবং মুসলিম হিসেবে কেন বাংলাদেশে উল্লিখিত সমস্যাসমূহ থাকা উচিত নয় তা কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতির আলোকে অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আকারে আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণভাবে শুধু এইটুকু জেনে রাখাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য কেবল এমন কাজের আদেশই দিয়েছেন যা কল্যাণময়। রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর নির্দেশনা অনুসারে শুধু এমন নৈতিক গুণাবলি ও কার্যক্রম সম্পন্ন করার নির্দেশই দিয়েছেন, যা মানবতার কল্যাণ ও মুক্তির পক্ষে। মুসলিম হতে হলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এই আদেশ-নিষেধসমূহ মেনে নিতে হবে। যারা মানবে না, তাদের জন্ম যে বংশেই হোক, বাহ্যত তাদের পরিচয় যা-ই হোক, কুরআন-সুন্নাহ অনুসারে তারা মুসলিম নয়।

Dhaka University Institutional Repository

খুব কম সংখ্যকই কুর'আন পড়তে পারছেন। যারা কুর'আন পড়তে পারছেন, তাদের অত্যন্ত কম সংখ্যক কুর'আন বুঝতে পারছেন। কুর'আন-হাদীস না পড়ে, না বুঝে মুসলিম হওয়ার কারণে বাংলাদেশের মুসলিমগণ অন্যান্য স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মত ইসলামকে তাদের বংশগত উত্তরাধিকার ভাবছেন। সত্যিকথা হলো, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই উত্তরাধিকার সূত্রে মুসলিম। জেনে-বুঝে-মেনে মুসলিম হয়েছেন, রয়েছেন এবং থাকার চেষ্টা করছেন, এমন মানুষের সংখ্যা এ ভূখণ্ডে অত্যন্ত কম। এ কারণে ইসলামে নিষিদ্ধ হওয়ার পরও নারী নির্যাতনের মত সমস্যা বাংলাদেশে বিদ্যমান।[১]

অন্তর্গত হিসাব যা-ই থাক, প্রত্যক্ষ বক্তব্য হলো, বাংলাদেশ একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। বাহ্যিক এই অবস্থা বিবেচনায় রেখে, এই দেশের মানুষের বর্তমান বোধ, বিশ্বাস ও বিবেচনা কাজে লাগিয়ে এ দেশটিকে ইসলামী বিধানের আলোকে কীভাবে নারী নির্যাতনের সমস্যা থেকে মুক্ত রাখা যায় এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে সেই পথই অনুসন্ধান করা হয়েছে। কেননা আকস্মিকভাবে বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো বদলে ফেলা যাবে না। হঠাৎ করেই মানুষের মানসিকতা বদলে দেওয়া যাবে না। চাইলেই বাংলাদেশের মানুষের জীবন ও চরিত্রে মিশে যাওয়া মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি রাতারাতি নির্মূল করা সম্ভব নয়। এটি অত্যন্ত বাস্তব সম্মত বক্তব্য যে, বাংলাদেশে কোনো শাসক বা রাজনৈতিক দলের হাতে এমন কোনো ম্যাজিক নেই বা নেই যাদুর দৈত্য যাকে বললেই এ দেশ জঞ্জালমুক্ত হবে। শত-সহস্র বছরে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে, দেশি-বিদেশি নানা ধরনের শোষণ আর দুঃশাসনে বাংলাদেশের মানুষ নিজেদেরকে রক্ষা করতে করতে অথবা পরিবর্তিত বিভিন্ন সময়-দুঃসময়ের সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে নিতে নিজেদের মানসিকতার যে ক্ষতি করেছেন, অন্তর্গত জগতে যে ক্ষত তৈরি করেছেন এবং যে কারণে ইসলাম বিরুদ্ধ হওয়ার পরও নারী নির্যাতনে লিপ্ত হচ্ছেন, মুহূর্তেই সেই ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা যাবে না, সেই ক্ষত সারানো সম্ভব হবে না।[২] আমাদের যা করতে হবে তা হলো, বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষ যে আবেগ ও নীতি লালন করেন, যে বিশ্বাস পোষন করেন, যে

---

[১] আহমদ বশির ও মুর্তজা মুহাইমেন, *বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা : একটি মূল্যায়ন*, ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র স্মরণিকা, ঢাকা ২০০৯, পৃ.২৩

[২] হযরত রাসূলুল্লাহ (স)এর কর্মধারা ও জীবনদর্শন পর্যালোচনা করলেও আমরা এ সত্যই প্রত্যক্ষ করি। তিনি পৌত্তলিকতা সমৃদ্ধ একটি দেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু দীন প্রচার শুরু করেই মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেননি। বরং সময় নিয়ে তাদেরকে এর অসারতা ও ক্ষতির বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করিয়েছেন। শেষে তারাই নিজেরাই এ থেকে ফিরে এসেছে। নিজেরাই মূর্তি ভেঙেছে। কিন্তু মহানবী (স) নিজে মূর্তির গায়ে একটি আঁচড় দেননি।

Dhaka University Institutional Repository

মূল্যবোধ ধারণ করেন সেগুলোর আলোকে আপাতত হাতের কাছে যা আছে তা দিয়ে সবচেয়ে ভালো থাকার উপায় অন্বেষণ করা। এরপর পর্যায়ক্রমে সকল বিষয় ও বিধানসমূহ মেনে মানায় অভ্যস্থ হওয়া। কারণ অংশত বিধান মানার পর মানুষ যখন এর সুফল পেতে শুরু করবে তখন স্বভাবতই তারা পুরোপুরি বিধান মানায় আগ্রহী হয়ে উঠবে।[১]

এ দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের ধর্মীয় আবেগ যতোটুকু অবশিষ্ট রয়েছে ততোটুকুর সদ্ব্যবহার করে ইসলামের বিধানের আলোকে কীভাবে বাংলাদেশকে নারী নির্যাতন মুক্ত করা সম্ভব এ গবেষণা অভিসন্দর্ভে সে পথ নির্দেশ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে মুসলিম

---

[১] এ ক্ষেত্রে একটি বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। তা হলো ইসলাম কোনো আংশিক জীবনব্যবস্থা নয়। জীবনের বিশেষ কোনো দিকের জন্যই শুধু ইসলাম বিধি-বিধান প্রদান করেনি। বরং জীবনের সকল বিভাগ ও প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিধি-বিধান দেয়ার কারণেই ইসলাম হলো পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। (দ্রষ্টব্য: আল-কুর'আন / সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯, ৮৩-৮৫; সূরা নিসা, আয়াত: ১২৫; সূরা মায়িদা, আয়াত: ৩; সূরা আনআম, আয়াত: ৭১, ১২৫-১২৭; ১৬১-১৬৪; সূরা তওবা, আয়াত: ৩৩; সূরা ইউনূস, আয়াত: ৩১-৩২; সূরা রূম, আয়াত: ৩০; সূরা ফাত্হ, আয়াত: ২৮; সূরা সাফ, আয়াত: ৯)) কেউ যদি আংশিক ইসলাম মেনে চলে বা ইসলামের কোনো কোনো বিধান মেনে চলে তাহলে সে এর কিছু কিছু সুবিধা হয়তো পাবে, কিন্তু পুরোপুরি কল্যাণ লাভের জন্য পূর্ণ আনুগত্য আবশ্যক। ইসলামের দাবি এবং আল্লাহর নির্দেশও তাই। (দ্রষ্টব্য: আল-কুর'আন / সূরা বাকারা, আয়াত: ১১২, ১৩০-৩৪, ১৩৬, ২০৮-১০; সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৫০-৫৩, ৮৩-৮৫) বাংলাদেশে সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে জীবনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান মেনে নিয়ে অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে ইসলামী আইন চালুর চেষ্টা করা হলে হয়তো মহান আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করবেন। কিন্তু কেউ যদি এই বিশ্বাসই পোষণ করে যে, সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আইন নেই অথবা থাকলেও তা পুরোনো। বর্তমান আধুনিক সময়ে ইসলামের সকল আইন চলবে না। । তাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইসলামী আইন আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্য আইন অনুসরণ করে। তাহলে সে অবশ্যই আর মুসলিম থাকবে না। কারণ ইসলামী বিশ্বাসে এটা প্রবলভাবে স্বীকার করা হয় যে, আইন দেয়ার ক্ষমতা শুধুই আল্লাহর। (দ্রষ্টব্য: আল-কুর'আন / সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮৫; সূরা নিসা, আয়াত: ১৩৫-৩৬; সূরা মায়িদা, আয়াত: ৪৪-৪৯; সূরা আনআম, আয়াত: ১৬০; সূরা নূর, আয়াত: ৪৮-৫০; সূরা আহযাব, আয়াত: ৩৬)। তাই কেউ যদি ইসলামের অপূর্ণতার বিশ্বাস নিয়ে অন্য কোনো মতবাদ বা ধর্মীয় রীতি পালন করেন তাহলে তিনি শিরকের অপরাধে অপরাধী হবেন। তাকে মুশরিক বলা হবে; মুসলিম নয়। তাই বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান সমাজব্যবস্থা কায়িম রেখে কীভাবে ইসলামের বিভিন্ন বিধান থেকে উপকার লাভ করা যায়, এ অভিসন্দর্ভে সেই কর্মকৌশল অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের প্রচেষ্টা চালানো হলেও এটি মুক্তির স্থায়ী পথ নয়। বাংলাদেশের মানুষকে যদি স্থায়ী সত্যিকারের মুক্তি পেতে হয় তাহলে পরিপূর্ণ ইসলামের কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। ব্যক্তি জীবন থেকে আন্তর্জাতিক জীবনের প্রতিটি স্তরেই এর অন্যথা হতে পারবে না।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের কেন্দ্র মসজিদকে। অর্থাৎ মসজিদকে কেন্দ্র করে ইসলামের বিধানসমূহের ভিত্তিতে বাংলাদেশকে কীভাবে নারী নির্যাতনের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা যায় এবং মুক্ত রাখা যায় এ অভিসন্দর্ভ সে পথ অন্বেষণেরই একটি প্রয়াস। এ লক্ষ্যে অভিসন্দর্ভের শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়েছে **"বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে মসজিদের ভূমিকা"**। বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অভিসন্দর্ভের আলোকে নারী নির্যাতন সমস্যা প্রতিরোধে প্রয়াস চালালে আমাদের বিশ্বাস তা অনেকখানি সফলতা লাভ করবে এবং সবার জন্যই ইতিবাচক ফল বয়ে নিয়ে আসবে। উদাহরণত বাংলাদেশের মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সেবা এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির কথা বলা যায়। দৃশ্যত এই প্রকল্পটি ব্যর্থ হওয়ার কারণ হলো, এ কাজে মসজিদকে সম্পৃক্ত না করা। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে যাঁরা বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করেন তাঁরা প্রায় প্রত্যেকে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত। তাঁদের মধ্যে অনেক অমুসলিমও রয়েছেন। তাঁরা যখন মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সেবার কথা বলেন, পরিকল্পিত পরিবার গঠনের কথা বলেন তখন ধর্মীয় বিশ্বাসগত অবস্থান থেকে এর মর্যাদা বা হুকুম সম্পর্কে পুরোপুরি অন্ধকারে থেকে যাওয়ার কারণে ধর্মভীরু সাধারণ মানুষ এ ব্যাপারে তেমন কোনো আগ্রহ দেখান না। অনেক ক্ষেত্রে একে উম্মাতে মুহাম্মাদীর সংখ্যা কমানের আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ মনে করে এর থেকে পুরোপুরি দূরে থাকেন। অথচ পরিকল্পিতভাবে এই প্রকল্পের সাথে যদি বাংলাদেশের আলিমগণকে সম্পৃক্ত করা যেতো, তাঁরা যদি মসজিদ থেকে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা এবং পরিকল্পিত পরিবার গঠনের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্পর্কে বলতেন, তাহলে ধর্মভীরু সাধারণ মানুষ তা নিয়ে কোনো সংশয় পোষণ করতেন না। পরিণতিতে দেশ অপরিকল্পিত, অশিক্ষিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত জনশক্তির অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারতো। এ কারণে বাংলাদেশের বর্তমান সমাজ কাঠামো বহাল রেখে মসজিদ ও মসজিদ সংশ্লিষ্ট আলিমগণের প্রভাব ও ভূমিকা ব্যবহার করে বাংলাদেশকে কীভাবে নারী নির্যাতনের অভিশাপ্ত মুক্ত করা যায় এবং কীভাবে নারী নির্যাতন প্রতিরোধের স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় তাকেই আমরা আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করেছি। এ গবেষণা যদি নানাবিধ সামাজিক সমস্যায় আক্রান্ত আমাদের এই প্রিয় দেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা নারী নির্যাতন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সামান্যতম ভূমিকা রাখতেও সক্ষম হয়, তাহলে আমরা এই শ্রম ও সাধনাকে সার্থক মনে করবো।

(মোঃ রেজাউল করিম)

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় : বাংলাদেশের মসজিদ এবং সমাজজীবনে মসজিদের ভূমিকা

বাংলাদেশ পরিচিতি

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, উন্নয়নশীল মুসলিম দেশ। ২৬ মার্চ ১৯৭১ দেশটির স্বাধীনতা ঘোষিত হয় এবং ৩০ লক্ষ মুক্তিকামী মানুষের আত্মত্যাগের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ অর্জিত হয় চূড়ান্ত বিজয়। স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের ব্যাপ্তি তাই কেবল চার দশকের কিছু অধিক কালের। কিন্তু বাংলা নামের জনপদটি হাজার বছরের ঐতিহ্যিক ইতিহাসের ধারাবাহিকতা। বাংলাদেশ একটি অতি প্রাচীন দেশ। ইতিহাসের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের উত্তর-পূর্বের যে অঞ্চলে ১৯৭১ সালে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়, অতি প্রাচীনকাল থেকে তা একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ভৌগোলিক অঞ্চল বলে পরিচিত ছিলো।[১] ইসলামের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক সুপ্রাচীন। আজ থেকে সাড়ে সাত হাজার বছর আগে হযরত নূহ (আ)এর সময়ে সংঘটিত মহাপ্লাবনের[২] পর আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদে বিশ্বাসী তাঁর প্রপৌত্র 'বঙ' এ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। এরপর যে জনগোষ্ঠী গড়ে ওঠে তা বঙ্গ জনগোষ্ঠী নামে অভিহিত হয়। কালের বিবর্তনে এ বঙ্গ থেকেই বঙ্গদেশের নামকরণ হয়েছে।[৩] শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) আরবে ইসলাম প্রচার শুরু করার পর বঙ্গে তাওহীদী ধারার বিশ্বাস প্রবর্তনের নতুন

---

[১] ড. এম এ আজিজ ও ড. আহমদ আনিসুর রহমান, *প্রাচীন বাংলাদেশ*, (ড. কে এম মোহসীন ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ*), ইফাবা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, পৃ.১

[২] কুরআন মজীদে (৭:৬৪, ১০:৭৩, ১১:৩৬-৪৮) হযরত নূহ (আ)এর মহাপ্লাবনের উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহর হুকুম না মানা এবং আল্লাহর নবীর প্রবল বিরোধিতার কারণে হযরত নূহ (আ)এর সমকালীন বিশ্বের সকল অবিশ্বাসীদের ধ্বংস করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে 'গযব' হিসেবে এ মহাপ্লাবন হয়েছিলো। এতে গুটিকয়েক মু'মিন ছাড়া সকল মানুষ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। এ মহাপ্লাবন কখন ঘটেছিলো তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২৩০০, কেউ বলেন: আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে। আবার কারো মতে, খ্রিস্টের জন্মের সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে এ প্লাবন ঘটেছিল। তবে একথা সত্য যে, খ্রিস্টপূর্ব ৩১০২ কিংবা খ্রিস্টপূর্ব ৩১০০ অব্দে পৃথিবীর অনেক স্থানেই এক মহাপ্লাবন সংঘটিত হয়েছিল। – মনসুর মূসা (সম্পাদনা), *বাঙলাদেশ*, এম.আই চৌধুরী, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা-১৯৭৪, পৃ.৪৬

[৩] গোলাম হোসায়ন সলিম, *রিয়াযুস সালাতীন*, বাংলা অনুবাদ: *বাংলার ইতিহাস*, আকবর উদ্দীন অনূদিত, ঢাকা, ১৯৭৪ পৃ. ১৬ ও ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভাবনা তৈরি হয়। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা)এর শাসনকালে (৬৩৪-৪৪খ্রিস্টাব্দ) সাহাবী মামুন ও মুহায়মিন (রা)এর নেতৃত্বে একদল সাহাবী ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বঙ্গে আগমন করেন।[১] এরপর আউলিয়া কিরাম-সূফী সাধকগণ অত্র অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।[২] ক্ষমতাসীন শাসকদের বিরোধিতা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের সমর্থন, স্বীকৃতি, আগ্রহ ও আনুকূল্যে ইসলাম এদেশে সাদরে গৃহীত হয়।[৩] সাহাবী ও সূফীগণের চরিত্র মাধুর্য ও জীবনমুখী শিক্ষা সহজেই অত্যাচারিত, উৎপীড়িত সমাজকে আকৃষ্ট করে এবং পরিত্রাণের আশ্বাস দেয়।[৪] ফলে ব্যাপক সংখ্যক সাধারণ মানুষ শান্তিপূর্ণ ও সম্মানজনক জীবনের প্রত্যাশায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তুর্কি বীর মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী বাংলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশে সেন শাসনের অবসান ঘটিয়ে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন।[৫] এরপর সুদীর্ঘকাল বাংলায় মুসলিম শাসন বহাল থাকে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিকট নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় প্রায় ২শ বছরের বৃটিশ শাসনের সূচনা হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভাগের সময় বাংলাদেশ পূর্ব বাংলা নামে পাকিস্তানের অংশ হিসেবে স্বাধীনতা লাভ করে, পরবর্তীতে এর নামকরণ হয় পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ নামে স্বাধীন দেশের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় বাংলাদেশের বর্তমান ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে (১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার[৬]) মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতাই বহাল ছিল।[৭] বর্তমান বাংলাদেশেও তা বিদ্যমান রয়েছে।

---

[১] ড. কাজী দীন মুহম্মদ, *বাংলায় ইসলাম*, (ড. কে এম মোহসীন ও অন্যান্য), পূর্বোক্ত, পৃ.১৭৮-৮০

[২] প্রফেসর ড. আ. ন. ম. রইছ উদ্দীন, *সূফিবাদ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়*, ঢাকা ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ.৪৩-৪৮

[৩] ড. এম এ আজিজ ও ড. আহমদ আনিসুর রহমান, *প্রাচীন বাংলাদেশ*, পূর্বোক্ত, পৃ.৩২

[৪] আখতারুল আলম, *ইতিহাসের বাংলা ঃ বাংলার ইতিহাস*, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ.৭

[৫] ড. মুহাম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, মার্চ ২০০৩, পৃ.১৪৭

[৬] ২০১২ সালের মার্চ মাসে সমুদ্রসীমা নিয়ে মায়ানমারের সঙ্গে একটি মামলায় জয়ী হওয়ার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বর্তমান আয়তন প্রায় দ্বিগুণ বলে সরকারি ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

[৭] দেখুনঃ আব্দুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, ঢাকা-১৯৮০ / ড. হাসান জামান, *সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য*, ঢাকা-১৯৬৭ /M. A. Rahim, *Social and Cultural History of Bengal*, Dhaka-1968 / M. Anamul Haque, *A History of Sufism in Bengal*, Dhaka, 1980 / ড. আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি*, রংপুর, জানুয়ারি ২০০৩/ প্রফেসর এ.কে.এম আবদুল আলীম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী ঢাকা, জুন ১৯৯০

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদ পরিচিতি

মসজিদ আল্লাহর ঘর, ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র। এটি মুসলিম সমাজের প্রাণকেন্দ্র। ইসলাম প্রচার, প্রসার, প্রতিষ্ঠা, মুসলিমদের প্রশিক্ষণ এবং আনুষ্ঠানিক সমন্বিত ইবাদতের প্রাতিষ্ঠানিক কেন্দ্র মসজিদ। মহানবী (স) মসজিদ থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন, যুদ্ধের কৌশল নির্ধারণ করেছেন, দেশে-বিদেশের খ্যাতিমান লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। মুসলিমদের শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত করার উদ্যোগ নিয়েছেন। মসজিদে প্রশিক্ষণ নিয়েই সাহাবী (রা)গণ খুলাফায়ে রাশিদার স্বর্ণযুগ রচনা করেছেন। মুসলিম সমাজ ও মসজিদ তাই এক ও অভিন্ন অস্তিত্বের স্মারক। দেহ ও প্রাণের যে সম্পর্ক, ইসলামের সঙ্গে মসজিদের বা মুসলিম সমাজের সঙ্গে মসজিদের সম্পর্কও তেমন। প্রাণহীন দেহ যেরূপ অসার লাশ, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার পরিপন্থী যে মসজিদ তাও ঠিক তদ্রূপ ইমারত মাত্র।[১] ইসলামের প্রাথমিক যুগে হযরত মুহাম্মদ (সা) সাহাবীগণসহ মসজিদে সালাত আদায় করতেন এবং সালাত শেষে তাঁদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তব্য প্রদান করতেন। তাঁর বক্তব্য শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রেই কার্যকর হয়নি, বরং দৈনন্দিন সামাজিক জীবনেও এর প্রভাব বিস্তার করেছিল। মসজিদে নববী থেকেই রাসূলুল্লাহ (সা) ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। তাই মসজিদ সামাজিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল এবং ইবাদতের গৃহ হিসেবে পরিগণিত।[২]

মসজিদ শব্দের মূল শব্দ হলো [3]سجد এর বিশেষ্য হলো السجدة সীন অক্ষর যের যোগে سجد يسجد মাসদার থেকে।[৪] শব্দটির اسم فاعل পুংলিঙ্গ হলো ساجد ও اسم فاعل স্ত্রীলিঙ্গ হলো ساجدة اسم فاعل - مبالغة এর জন্য سجاد ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তখন এর বহুবচন হয় سجود অর্থ হয় অধিক ক্রন্দনরত সিজদাকারী।[৫] ইমাম রাগিব ইস্পাহানীর মতে, سجد يسجد অর্থ হচ্ছে অনুনয়-বিনয় করা। আল্লাহর সম্মুখে বিনয় প্রকাশ ও তাঁর ইবাদতকে سجود বলা হয়ে থাকে। এ শব্দের ব্যবহার মানুষ,

---

[১] ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে মসজিদের ভূমিকা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২য় সংস্কারণ-১৯৮৭, পৃ. ৭

[2] Bos-worth and others, *The Encyclopaedia of Islam,* vol. vi, leiden: E-J Brill, 1991. p.646

[৩] সম্পাদনা পরিষদ কতৃক সম্পাদিত, *দায়েরায়ে মা'আরিফে ইসলামিয়াহ* (উর্দু বিশ্বকোষ), ২০ তম খণ্ড, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, লাহোর, ১৯৮০, পৃ. ৫৮৮

[৪] *আল-মুনজিদ*, আল-মাকতাবাতুশ শারকিয়াহ, বৈরূত, ৪০তম সংস্করণ-২০০৩, পৃ. ৩২১

[৫] *দায়েরায়ে মা'আরিফে ইসলামিয়াহ*, পূর্বোক্ত. পৃ. ৫৮৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রাণী ও জড় পদার্থের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হয়ে থাকে।[১] বিশেষত ইসলামী শরী'আতে সিজদা সালাতের একটি অন্যতম রুকন হিসেবেই প্রসিদ্ধ। আর ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হলো সিজদা। তাই সালাত আদায়ের স্থানকে মসজিদ হিসেবে অভিহিত করা হয়।[২] যে স্থানে আল্লাহ তাআলার 'ইবাদতের উদ্দেশ্যে সিজদা করা হয় অর্থাৎ মুসলমানদের ইবাদতের স্থানকেই মসজিদ বলা হয়ে থাকে।[৩] হিউজেস জনগণের প্রার্থনার স্থান ও সিজদার স্থানকে মসজিদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৪]

রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় অবস্থান কালে (৬১০-৬২২খ্রি) কখনও কা'বা শরীফের নিকট, কখনও বা হযরত আবূ বকর (রা)এর নির্মিত বিশেষ একটি স্থানে সালাত আদায় করতেন। মক্কায় সালাত আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট কোন স্থান ছিলো না।[৫] আবার সালাতের সময় হলে অনেক সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কার পার্বত্য উপত্যকায় চলে যেতেন। তাঁর সাথে হযরত আলী (রা)ও যেতেন। দু'জনে সেখানে সালাত আদায় করে অপরাহ্নে ফিরে আসতেন।[৬] মক্কায় অবস্থাকালে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবীগণকে নিজগৃহে সালাত আদায় করার অনুমতি দিয়েছিলেন।[৭]

মসজিদসমূহ ইট বা পাথরের তৈরি হয়। আয়তাকার বিশিষ্ট মসজিদে সালাত আদায় করার জন্য প্রশস্ত জায়গা থাকে। ভেতরে ছাত্রদের জন্যও জায়গা থাকে। কেন্দ্রীয় দেয়ালটিতে কা'বা দিক নির্দেশক মিহরাব থাকে। মিহরাবের ডান পার্শ্বে শুক্রবারে খুৎবা দেয়ার জন্য মিম্বার থাকে।[৮] জুমু'আ মসজিদ আয়তনে একটু বড় থাকে। জুমু'আর সালাত আদায় করার জন্য প্রশস্ত জায়গা থাকে।[৯] যিনি

---

[১] রাগিব ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাতু ফি গারীবিল কুরআন*, রাশিদীয়া কুতুবখানা, করাচী, পাকিস্তান, তাব, পৃ. ২২৯

[2] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০

[3] Edward William lane, *Arabic-English lexicon,* part 4, Asian educational services, New Delhi, 1985, p. 1307-1308.

[4] Thomas Patrick Hughes, *Dictionary of Islam,* Adam publishers and distributors, New Delhi. 2nd ed,-2003, p. 329

[৫] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মসজিদের ইতিহাস*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ-১৪২৪/২০০৩, পৃ. ১০৫

[৬] আবদুল মালিক বিন হিশাম, *সীরাতুন নববিয়্যাহ (ইবনে হিশাম)*, ১ম খণ্ড, দারুত তাকওয়া, মিসর, ২০০৮, পৃ. ১২৪

[৭] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, দিল্লী, ১৪০২ হি, পৃ. ৬০

[8] Thomas Patrick Hughes. op, cit,p.329

[9] *The world book Encyclopaedia,* Vol-13, London. 1992, p. 633

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদের মুসল্লীগণের সালাত পরিচালনা করেন তাঁকে ইমাম বলা হয়। মসজিদ বা মসজিদ সংলগ্ন স্থানে তিনি ছাত্রদেরকে শিক্ষাও দিয়ে থাকেন। অনেক মসজিদে 'আযানের জন্য মু'আয্যিন নিযুক্ত থাকেন এবং মসজিদের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন মুতাওয়াল্লীও থাকেন। মসজিদ মুসলিম মিল্লাতের জন্য অতীব মর্যাদাপূর্ণ স্থান।[1] মসজিদ মূলত ব্যবহার হয়ে থাকে 'ইবাদতের ও সামাজিক জীবনের কেন্দ্র হিসেবে। মসজিদের স্থাপত্য কৌশল বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।[2]

ইসলামে মসজিদের অনেক মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মসজিদকে আল্লাহ তাআলা তা'আলা অনেক উচ্চাসন প্রদান করেছেন। আর মসজিদের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে মহাগ্রন্থ আল-কুর'আনে অনেক আয়াত বিদ্যমান।[3] যেমন একটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَـئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নামের যিকর করতে (বা তাঁকে স্মরণ করতে) বাধা দেয় এবং মসজিদসমূহকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করে? অথচ ভয়ে ভীত না হয়ে তাদের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা বৈধ ছিলো না! পৃথিবীতে তাদের জন্য আছে লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে ভয়ঙ্কর শাস্তি।[4] মসজিদ হচ্ছে জনগণের জন্য পূনর্মিলন কেন্দ্র ও শান্তি নিকেতন। আর মাস্‌জিদুল হারামে অবস্থিত মাকামে ইব্‌রাহীমকে আল্লাহ তা'আলা মুসলিম জাতির জন্য মুসাল্লা বানিয়ে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

---

[1] ibid. p. 629-30

[2] Gordon D. Newby, *A concise Encyclopaedia of Islam,* Oxford, 2006. p. 143

[3] আবূ মু'আয খালিদ বিন আবদুল 'আল, *ইত্তেহাফুস সাজিদ বি আহকামিল মাসাজিদ*, জামী'আতু ইহ্ইয়াউত তুরাসূল ইসলামী, আন্দালুস, ১৪২৮/২০০৭, পৃ. ১৪

[4] সূরা আল-বাকারা, আয়াত নং-১১৪

Dhaka University Institutional Repository

(স্মরণ কর সে সময়ের কথা) যখন আমি মানব জাতির জন্য কাবাকে মিলনকেন্দ্র এবং নিরাপত্তার স্থানে পরিণত করেছিলাম (এবং বলেছিলাম) তোমরা 'মাকামে ইব্রাহীম'কে[১] সালাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর।' আর আমি আমার ঘরকে তাওয়াফকারীদের জন্য, ইতিকাফকারীদের জন্য এবং রুকূ ও সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখতে ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ দিয়াছিলাম।[২]

অপরাপর উপাসনালয় থেকে মসজিদ একটু ভিন্ন ধরনের। ইসলামের বিধান অনুযায়ী যে কোন মুসলিম, যে কোন সময় মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করতে পারেন। কিন্তু পুরোহিত ছাড়া গীর্জা বা অন্যান্য উপাসানালয়ে গিয়ে যে কোন লোক যে কোন সময় তাদের প্রার্থনা করতে পারে না। এতেই মসজিদের মর্যাদা ফুটে উঠে। মুসলমানগণ জাম'আতের সময় ইমামের পরিচালনায় ইমামের সাথে জামা'আত আদায় করতে পারেন। ইসলামের এ উদারনীতির ফলেই সমগ্র বিশ্বে তৈরী হয়েছে ছোট মসজিদ ও জুমু'আ মসজিদ।[৩] আর মসজিদের মর্যাদা ও পবিত্রতার জন্যই হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদে উচ্চস্বরে শোরগোল করতে নিষেধ করেছেন।[৪] মুসলিম জাতি যতদিন মসজিদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে ততদিন সে গৌরব ও উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হতে থাকবে। কারণ এ মসজিদ ধনী-গরীব সকলেই এক সারিতে দাঁড়িয়ে একত্রে সালাত আদায় করে। সিজদা ও রুকু'র সময় একজনের শরীর অন্যজনের সাথে মিলিত হয়। মসজিদের কাতারে কারও জন্য কোন স্থান নির্ধারিত থাকে না। কেউ ধাক্কাধাক্কি করে কারও আগে যায় না। যখন কোন মানব হৃদয় মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত হয়, আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদতের জন্য সে মসজিদে গমন করে সালাত, ই'তিকাফ এবং সালাত আদায়কারিগণের অবস্থা জানার জন্য উদ্‌গ্রীব হবে- তবে সে-ই হবে মসজিদের অধিবাসী।[৫] এ থেকেই মসজিদের উচ্চ মর্যাদা পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে।

মসজিদে গমন করা, মসজিদের সঙ্গে অন্তর সম্পৃক্ত করা এবং এক সালাত আদায় করার পর অন্য সালাতের জন্য অপেক্ষা করা পূর্ণ ঈমানদারের নিদর্শন। মসজিদ মুসলিম মিল্লাতের জন্য একটি

[১] যে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ইব্রাহীম (আ) কাবা ঘর পূননির্মাণ করেন সে পাথর রক্ষিত স্থানটিকে মাকামে ইব্রাহীম বলা হয়েছে।

[২] সূরা আল-বাকারা, আয়াত নং-১২৫

[৩] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *বাংলাদেশের মসজিদ*, সুবর্ণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১১

[৪] ইমাম ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

[৫] শায়খ মুহাম্মদ বিন সালিম বীহানী, (উর্দূ অনু) ড. মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ মুখতার, *ইসলাহে মু'আশারা আওর ইসলাম*, জামি'আ 'উলূমুল ইসলামিয়াহ, করাচী, ২য় সংস্করণ ১৪১৪/১৯৯৪. পৃ. ৮৯

Dhaka University Institutional Repository

স্বর্গোদ্যান। তাই সমজিদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় এ দু'আ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر পাঠ করলে জান্নাতের ফল ভক্ষণ করা হয়।[১] মসজিদের মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষার্থে যে কোন মুসলমান যখনই মসজিদে প্রবেশ করে তখনই মসজিদে বসার পূর্বে তাঁকে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নিতে হয়।[২] 'আদাবুল মাসজিদ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, "যে ব্যক্তি মসজিদের নিকট থাকে, সে মসজিদের নৈকট্য দ্বারা বহু উপকৃত হওয়ার সুযোগ পায়। আর যে ব্যক্তি মসজিদ হতে দূরে থাকে, সে মসজিদে গমন করলে পদক্ষেপের আধিক্য দ্বারা বেশী নেকী বর্ধনের সফলতা অর্জন করতে পারে। পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার রহমতের অবারিত দ্বার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলের জন্যই সতত উন্মুক্ত থাকে।[৩]

দেহ ও পোশাক-পরিচ্ছদের যাবতীয় অপবিত্রতা ও দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে পবিত্র হয়ে এবং অন্তরকে কুফ্র, শিরক, দুশ্চরিত্রতা, হিংসা-লোভ-লালসা ইত্যাদি থেকে পবিত্র হয়ে মসজিদে প্রবেশ করা উচিত।[৪] মসজিদের পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্তে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পিয়াজ ও দুর্গন্ধ যুক্ত বস্তু খেয়ে মসজিদে গমন করতে নিষেধ করেছেন।[৫] মসজিদের মর্যাদা রক্ষার্থে সমজিদে প্রবেশ করার সময় পড়তে হয় اللهم افتح لى ابواب رحمتك এবং বের হওয়ার সময় পড়তে হয় اللهم انى اسءلك من فضلك[৬] যে বা যারা মসজিদ নির্মাণ কাজে বা মসজিদ আবাদ রাখার স্বার্থে সহযোগিতা করবে- এমনকি সে যদি অমুসলিমও হয়, তবুও ইহজগতে তাঁর প্রাপ্য সম্মান সে পাবে। সমগ্র কুর'আনে মসজিদ শব্দটি ২৮ বার উল্লেখ করা হয়েছে এর দ্বারাই মসজিদের মর্যাদা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।[৭] The message of Tableg and Da'wah গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। "An army is likely to face defeat, it the arms and ammonities already exhausted,

---

[১] মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল-খতীব, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০

[২] আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান আদ-দারিমী, *আস-সুনান*, বৈরূত, ১৪১২ পৃ. ২৩১

[৩] মুফতী মুহাম্মদ শফী, *আদাবুল মাসজিদ*, আশরাফিয়া কুতুবখানা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, পৃ. ৬১

[৪] মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.), অনু. মাওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দীন খান, *মা'আরিফুল কুরআন*, খাদেমুল হারামাইন বাদশা ফাহ্দ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, মদীনা মুনাওয়ারা, ১৪১৩/১৯৯২, পৃ. ৬১

[৫] মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-খাতীব, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০

[৬] আহমাদ বিন শুআ'আব আন-নাসাঈ, *আস-সুনান*, কায়রো, ১৪০১ হি, পৃ. ৮৪

[৭] মাওলানা আমিনুল ইসলাম, *তাফসীরে নূরুল কুরআন*, ১ম খ. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২য় সংস্করণ- ১৯৮৮, পৃ. ৪৬৪

Dhaka University Institutional Repository

cannot be replenished and it armory is empty. The armory of the Muslims in the ideological battle, is the Mosque. If the Muslims weaken or inhore the mosques. Their spiritual energy will not be replenished and their defeat is evitable.[1] তাই তো কবি কাজী নজরুল ইসলারে আকুতি:

"মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই।

যেন গোর থেকেও মুয়াযযিনের আযান শুনতে পাই।"[২]

মসজিদে সালাত আদায়ের মধ্যে রয়েছে অনন্য সাধারণ ধর্মীয়, সামাজিক, নৈতিক ও সামরিক শিক্ষা। মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের মাধ্যমে সদাচারণ করা এবং ইমামের অনুসরণ করা জরুরী-এ শিক্ষা লাভ করা যায়। সৈনিকগণ যেমনি সেনাপতির আদেশ পালন করে তেমনি মুক্তাদিগণও সালাতে ইমামের অনুসরণ করতে শিখে।[৩] মসজিদে সালাতের জামা'আত ঐক্যের জন্য একটি বিরাট শক্তি। মসজিদে প্রতিদিন পাঁচবার মুসলমানদের মিলন ঘটে। তাঁদের সুখ-দুখের বিষয় অবগত হওয়ার সুযোগ পায়। এর ফলে পারস্পরিক সহানুভূতির মাধ্যমে সমাজে সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে উঠে। শুক্রবারে জুমু'আর সালাত এ ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বকে আরও বেশী সুদৃঢ় করে।[৪]

জুমু'আর সালাত যেমনিভাবে মসজিদে গিয়ে আদায় করতে হয় তেমনি পঁচ ওয়াক্তের ফরয সালাতও মসজিদে গিয়ে জামা'আতের সাথে আদায় করা অনিবার্য কর্তব্য।[৫] আল্লামা ইকবাল (জ.১৮৭৩খ্রি.-মৃ.১৯৯৩খ্রি.) বলেন, "The real object of prayer however is better achieved when the act of prayer be comes congregational. The spirit of all true

---

[১] A.Z.M. Shamsul Alam, *The message of Tableg and Dawah,* Islamic foundation Bangladesh, Dhaka, 1993, p. 1042

[২] আবদুল কাদির সম্পাদিত, *নজরুল রচনাবলী*, ৪র্থ খ. বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২য় সংস্কারণ-১৯৮৪, পৃ. ৪৮০

[৩] আবদুল ওয়াহাব যুহরী, *ইসলাম কা নেযামে হায়াত*, কিতাব মঞ্জিল, লাহোর, ২য় সংস্করণ-১৯৫৯, পৃ. ৪৩

[৪] অধ্যাপক নাজির আহমেদ ও ড. মুহাম্মদ নুরুল আমিন, *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস*, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৭৪

[৫] ইমাম শাফে'ঈ (র.), *তাহকীক খায়রি সা'ঈদ*, আল মাওসু'আতুল উম্মে, ১ম খণ্ড, আল-মাকতাবাতুত তাওফিকিয়াহ, মিসর, ২০০২, পৃ. ২৫৭

Dhaka University Institutional Repository

prayer is social.[1] মসজিদে জামা'আতের গুরুত্ব এতই অধিক যে, যারা মসজিদের জামা'আত পরিত্যাগ করে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেও বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেয়ার হুমকি প্রদান করেছেন।[২] মসজিদের জামা'আতের ফযীলত এতই অধিক যে, একাকি সালাত আদায় করার চেয়ে জামা'আতে সালাত আদায় সাতাশ গুণ বেশী মর্যাদাসম্পন্ন।[৩]

মানব সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে মসজিদের ভূমিকা অনবদ্য। সালাতের জন্য মসজিদে উপস্থিতি এবং জামা'আতের পাবন্দী হওয়া, ইসলামী দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া ও আনুগত্য করা, ইসলামী দলের কাজে নিবেদিত থাকা প্রভৃতি হলো ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি ও উন্নতির প্রাণ। একতা, সাম্য ও চিন্তার আদান-প্রদানের পবিত্র মাধ্যম। একজন মূর্খলোক দৃষ্টান্তের সাহায্যে মসজিদে অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করতে পারে এবং একজন 'আলিম তাবলীগ করতে সহজেই সামর্থ্য হন। সমজিদে একজন গরীব ব্যক্তি আমীরের পাশাপাশি বসে, দীনের ন্যায়-বিচারের ছায়ায় আত্মাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে।[৪] হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও খুলাফা রাশিদীনের সময় এ প্রথা প্রচলিত ছিলো যে, যখন কোন জটিল সমস্যার উদ্ভব হত বা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সমস্যা দেখা দিত অথবা ধর্মীয় ফরমান জারী করার প্রয়োজন হত, তখন সকলেই উদ্ভূত সমস্যার ব্যাপারে মসজিদে সমবেত হতেন। তা ছাড়া মসজিদে সালাতের অধিবেশন মুসলমানদের ধর্মীয় একতা ও রাজনৈতিক সমস্যার একান্ত দিক নিদর্শন বলে বিবেচিত হত।[৫] দেওয়ান মুহাম্মদ আযরফ (জ. ১৯০৬খ্রি–মৃ.১৯৯৯খ্রি.) বলেন, "মুসলিম জীবনের ঐক্য, প্রেম, মৈত্রী, সৌহার্দ প্রভৃতি সৃষ্টির জন্য তাদের প্রত্যেক দিবা-রাত্রিতে অন্তত পক্ষে পাঁচবার একত্রিত হওয়ার সুযোগ দান করে বলে সালাতের রয়েছে এক সামাজিক গুরুত্ব। প্রকৃত পক্ষে হযরত রাসূল-ই-আকরাম (সা.) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে মসজিদ ছিলো

---

[1] Sir Muhammad Iqbal, *The Re-construction of religious Thought in Islam,* kitab bhavan, New Delhi, Fifth ed.-1994. p. 92

[২] মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল–কুশায়রী, *আস–সহীহ,* দেওবন্দ ১৪০০ হিজরি, পৃ. ২৩২

[৩] সুলায়মান বিন আহমদ আত্–তাবরানী, *মু'জামুস সাগীর,* দারুল ফিকর, বৈরূত, ২য় সংস্করণ ১৯৮১, পৃ. ২৫-২৮

[৪] কাযী মুহাম্মদ সুলায়মান মানসূরপুরী, *রাহমাতুল্লিল 'আলামীন,* ১ম খ, মাকতাবাতে ইসলামিয়াহ, লাহোর, পাকিস্তান, ২০০৬, পৃ. ২৭৩

[৫] আল্লামা শিবলী নু'মানী, *সীরাতুন্নবী,* ৫ম খ, দারুল হাদীস, পাকিস্তান, ২০০২, পৃ. ৩৬

একাধারে পার্লামেন্ট, সুপ্রীম কোর্ট, গবেষণাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়। মসজিদকে কেন্দ্র করেই জীবন বিকাশের ধারাগুলো চালু ছিল।[১]

অন্যদিকে ফরযসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয হলো জুমু'আর সালাত। এটি ইসলামী সমাবেশগুলোর মধ্যে এক মহাসমাবেশ। 'আরাফাতের সমাবেশ ব্যতীত জুমু'আর সালাতই সবচেয়ে গুরুত্ব বহন করে। নিছক অবহেলা করে যে ব্যক্তি এ জুমু'আর সালাত পরিহার করে আল্লাহ তাআলা তাঁর অন্ত-রে দ্বার রুদ্ধ করে দেন।[২] এজন্যই আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে মসজিদে গিয়ে জুমু'আর সালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

"হে মুমিনগণ! জুমুআর দিন যখন তোমাদেরকে সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে অগ্রসর হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে!"[৩] অত্যাবশ্যকীয় সময়ে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য পেয়ে থাকে। আর জুমু'আর সময় দু'আ কবুল হয়ে থাকে। অন্তরে সুপ্ত বাসনাসমূহ কবুল হয়। আর এ নৈকট্য লাভের কাঙ্খিত ও প্রত্যাশিত সময়টি হলো জুমু'আর দিনে যাতে অনেক কার্যাবলী সংঘটিত হয়েছে।[৪]

জুমু'আর সালাতের একটি অপরিহার্য অংশ খুৎবা প্রদান করা। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও সাহাবীগণের খুৎবা ছিলো পরিপূর্ণাঙ্গ ও পর্যবেক্ষণ মূলক। আল্লাহ তাআলার দিকে আহবান ও মানব-প্রেমে পরিপূর্ণ ছিলো সে খুৎবা। আর আজকাল খুৎবায় এ সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ও উপেক্ষিত। খুৎবার আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে।[৫] মুসলিম উম্মাহ্র বাস্তব প্রয়োজন ও কর্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের

---

[১] মোহাম্মাদ আজরফ, *জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৪১১/১৯৯১, পৃ. ৮১

[২] ইবনু কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ্ তাহকীক ওয়ায়িল আহমদ আবদুর রহমান, *যাদুল মা'আদ*, ১ম খণ্ড, আলমাকতাবাতুত তাওফিকিয়াহ, মিসর, তাবি, পৃ. ১৬৫

[৩] সূরা আল-জুমু'আ, আয়াত নং-৯

[৪] শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা*, ২য় খ, গাওসিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, তাবি, পৃ. ২৮

[৫] মুহাম্মদ সায়্যিদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, ১ম খ. দারুল ফাত্হ লি ই'লামিল 'আরাবী, মিসর, ১৪১৯, পৃ. ৩৭০

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ের আলোচনা এবং 'ইবাদাত-বন্দেগী, লেন-দেন, শিক্ষা-দীক্ষা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি সকল পর্যায়ের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করাই হচ্ছে জুমু'আর খুৎবার একমাত্র উদ্দেশ্য। হযরত মুহাম্মদ (সা.) সাহাবীগণ (রা.) তাবি'ঈন, তাব্'তাবি'ঈন, সালফ্-সালিহীন সকলেই খুৎবাতে রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় কর্তব্যের আলোচনা পেশ করতেন। কিন্তু পরবর্তী যুগে মুসলিম মিল্লাতের খুৎবার প্রয়োজনীয় বিষয় পেশ করা রীতিমত বন্ধ হয়ে যায়। শুধু খুৎবা রসম-রিওয়াজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সমজিদে পঠিতহয় গদ বাঁধা খুৎবা।[১] জুমু'আর খুৎবায় মুসলিম জাতির সকল বিষয়ই শিক্ষার সুযোগ থাকে। জুমু'আর খুৎবার ভূমিকা খুবই তাৎপর্যবহ।

মুসলিম সমাজে, ইসলামী জীবন দর্শন, মূল্যবোধ ও চেতনায় এবং মুসলিম রাষ্ট্রে মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ২৩ বছর নুবুওয়াতের জীবন (৬১০-৬৩২খ্রি.), ১৩ বছর মক্কায় (৬১০-৬২২খ্রি.) এবং ১০ বছর (৬২২-৬৩২খ্রি.) মদীনায় অবস্থান করেন। মক্কার জীবনে তিনি মসজিদুল হারামের কর্তৃত্ব লাভ করতে পারেননি। সে স্থান ছিলো মুশরিকদের দখল। যে কা'বা গৃহ আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদতের জন্য তৈরী- সেখানে কাফিররা ৩৬০ টি দেব–দেবীর মূর্তি স্থাপন করে তাদের পুঁজা করত। তখনও হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রাষ্ট্রীয় ক্ষতার অধিকারী হননি।[২] মুসলমানগণ একই আল্লাহ তাআলার উপর বিশ্বাসী। মসজিদ হলো তাঁদের রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার মূল কেন্দ্র। তাই হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইসলামের দাওয়াত প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন।[৩] মসজিদ যেহেতু মুসলিম জাতির সালাত, কিরা'আত, যিক্র, শিক্ষা-দীক্ষা, 'আকীদা এবং ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান- এজন্যই হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে (৬২২খ্রি.) মদীনায় কুবা পল্লীতে তাক্ওয়ার ভিত্তিতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।[৪] কুবায় মসজিদ প্রতিষ্ঠার পর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সেখান থেকে মদীনায় পৌছেন। পথিমধ্যে বনূ সালিমদের এলাকায় ১০০ জন সঙ্গীসহ জুমু'আর সালাত আদায় করেন। মদীনাতে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মসজিদে নববী

---

[১] অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক, *মানব সভ্যতায় মসজিদের অবদান*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ৩য় সংস্করণ-১৪২৫/২০০৪, পৃ. ৭৪

[২] ড. মুস্তাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

[৩] শায়খ তুআহাল ওয়ালী, *আল-মাসজিদু ফিল ইসলাম*, দারুল 'ইলম লিল মালাঈন, বৈরূত ১৯৮৮, পৃ. ১৫৯

[৪] আবু মু'আয খালিদ বিন আবদুল 'আল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণ করেন (৬২২খ্রি.)।[১] আর এ মসজিদেই হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ধর্মপ্রচারসহ রাষ্ট্রীয় সকল কর্মকান্ড পরিচালনা করতেন।

Philip K. Hitti বলেন, "It developed in them the sense of social equality and the consciousness of believers which the religion of Mohammad had theoretically substituted for blood relationship. The prayer ground htus became "the first drill ground of islam.[2]

ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় মূল্যের ভিত্তিতে তিনটি স্থানের গুরুত্ব বিশেষভাবে নিহিত রয়েছে। একটি মক্কার মসজিদুল হারাম, যার দিকে মুখ করে মুসলমানগণ আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদত করে থাকেন। সারা বিশ্বের মুসলমানগণ হজ্জের সময় এ স্থানে মিলিত হন। একইভাবে মদীনার মসজিদ যেখানে মুহাম্মদ (সা.) নূতন ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত রচনা করেছেন। আর এ কারণেই মসজিদে নববী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। আরেকটি হলো বায়তুল মুকাদ্দাস- যা পূর্ববর্তী নবীগণের আবাসস্থল এবং মুসলিম জাতির প্রথম কিবলা।[৩] ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মসজিদ কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। আর সালাত আদায়ের জন্য এটি বিশেষ স্থান। এ গুরুত্বের জন্যই একে মসজিদ বলা হয়েছে। এখানে সকলে একই ইমামের পেছনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সালাত আদায় করেন। সকলেই একজন ইমামকে অনুসরণ করেন গরীব-ধনী, প্রভু-ভৃত্য সকলেই মহারাজাধিরাজের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়।[৪]

সমাজ সংস্কার মসজিদ নির্মাণের অন্যতম লক্ষ্য। মানব সমাজে প্রচলিত মানবের সৃষ্টি মতবাদের মাধ্যমে যে কুসংস্কার চালু হয়, তা সমাজের গতিশীলতার জন্য বিরাট বাঁধা। মসজিদের শিক্ষার মাধ্যমে কুসংস্কার বিদূরীত করে সমাজ-প্রগতির ধারা অব্যাহত রাখাই মসজিদ নির্মাণের লক্ষ্য।[৫]

---

[১] ইবনু কায়্যিম আল-জাওযিয়াহ, তাহকীক ওয়ায়িল আহমদ আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪

[2] Philip K. Hitti, *History of the Arabs,* Mecmillan education LTD, London. Tenth ed. 1970. p.132.

[3] Abdul Kadar Tayob, *Islam a short introduction,* one world oxford, 2006,p.61-62

[4] Mofti Zafeeruddin, *Mosque in Islam,* Quzi publishers and distributors, New Delhi, 1996.p.11

[৫] এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম, *ইসলামে মসজিদের ভূমিকা*, ঢাকা, ২য় সংস্করণ-১৪২৫/২০০৪, পৃ.১০

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদ মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রের মূল প্রশাসনিক কেন্দ্র। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)- এর সম্পর্ক মসজিদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। এর কারণ শুধু ধর্মীয় নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিকও বটে। 'ইবাদতের কেন্দ্র ছাড়াও মসজিদ গণপ্রশসানিক কেন্দ্র। বিচারালয়, কল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবেও মসজিদ ব্যবহৃত হত এবং হতে পারে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) স্বয়ং মসজিদে নববীতে মামলা-মুকাদ্দামা মীমাংসা করতেন। প্রাথমিক যুগে মসজিদই ছিলো শাসক ও জনগণের সাধারণ সভার স্থান। যুদ্ধ সম্পর্কিত আলোচনাও মসজিদেই হত। শাসনকর্তাগণ প্রশাসন, যুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়ে মসজিদেই বক্তব্য রাখতেন। বক্তারা এর পক্ষে শ্লোগান ও দিতে পারতেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর ইন্তিকাল (৬৩২ খ্রি) এবং খুলাফা রাশিদীনের শাসনামলের (৬৩২-৬৬১ খ্রি) অবসানের পর শাসকগণ শাসন কার্যকে স্ব-স্ব স্বার্থের কারণে নিজ নিজ প্রাসাদ চত্বরে নিয়ে যায় । মসজিদসমূহ তখন শুধু 'ইবাদতের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে।[১]

মসজিদ ইসলাম প্রচার ও মুসলিম জাগরণের কেন্দ্র। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজেই মসজিদে নববীতে ইমামতির দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে হযরত আবূবকর (রা.) (মৃ. ১৩/৬৩৪) ইমামতির দায়িত্ব পালন করতেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর ইন্তিকালের (৬৩২ খ্রি) পর খলীফাগণ ইমামতির দায়িত্ব পালন করতেন।[২] চার খলীফা হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান ও হযরত আলী (৬৩২-৬৬১) শক্তিশালী রাজত্ব পরিচালনা করেছিলেন। আর তাঁদের সৈন্যবাহিনী ও কর্মচারীবৃন্দ পৃথিবীর সকল অংশেই খলীফাগণের অনুসৃত নীতির অনুসরণ করতেন। তাঁরা মসজিদে নববীতে জুমু'আর দিনে প্রশাসনিক কর্মকান্ডের বিবরণ পেশ করতেন এবং রাষ্ট্রের সকল বিষয়ের ব্যাপারেই মসজিদে আলোচনা করতেন। যে কোন অভিযোগ ও ধর্মীয় কর্মকান্ডের হিসাব নিকাশ মসজিদেই দিতেন।[৩]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর জীবদ্দশায় মুসলমানগণ মদীনার দু'-তিন মাইল উপকণ্ঠ হতে দৈনিক পাঁচওয়াক্ত সালাত মসজিদে নববীতে এসেই আদায় করতেন। খুলাফা রাশিদীনের যুগে (৬৩২-৬৬১ খ্রি) এ নিয়ম অনেকটাই চালু ছিল। পরবর্তী যুগে মুসলমানগণ বিজয়ী বেশে যে দেশ, নগর বা শহরে প্রবেশ করতেন-সেখানে তাঁদের সর্বপ্রথম কর্তব্য ছিলো মসজিদ নির্মাণ করা। মহানবী

[১] হারুনুর রশিদ, *রাজনীতি কোষ*, পূর্বোক্ত, পৃ.২৫৯

[2] Sir Thomas Arnold, *The caliphat,* Adam pubkishers and distributors, Delhi, Reprinted-1994,p.35

[3] M. M. pocthal, *Cultural side of Islam,* Kitab bhavan, New Delhi, 3rd ed. 1990, p.167

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর স্থাপিত মদীনার মসজিদের অনুকরণে তাঁরা সেখানে জামি মসজিদ নির্মাণ করতেন।[১] প্রাথমিক যুগে মদীনার মসজিদ ছাড়াও কূফা (প্রথম নির্মান ১৬/৬৩৭), বসরা (১৪/৬৩৫), ফুসতাত (২১-২২/৬৪১-৪২), কায়রোয়ান (৫৫-৫৬/৬৭৪-৭৫) প্রভৃতি মসজিদসমূহ ছিলো জামি মসজিদ।[২]

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মসজিদে নববীর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজে জ্ঞান-ভান্ডার বিতরণ করতেন। মসজিদে নববীর ছাত্রবৃন্দই মানব ইতিহাসের সর্বোত্তম জ্ঞানীরূপে পরিগণিত হয়ে ছিলেন। উট, ঘোড়া ও মেষ পালকের রাখাল হতে এবং কেনা গোলাম ও বাঁদী হতে তাঁরা উন্নীত হয়ে ছিলেন বিশেষজ্ঞ 'আলিম, ফকীহ্, বিশ্বখ্যাত সেনাপতি ও শাসনকর্তায়।[৩]

মুসলিম সমাজে মসজিদ হচ্ছে দীনী, ঈমানী, রাজনৈতিক, ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র ও শিক্ষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান। ইসলামের প্রাথমিক যুগে সমাজ সংস্কারমূলক কর্মসূচী মসজিদের ভেতর থেকেই নেয়া হত। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর যুগে, সাহাবা ও তাবি'ঈনের যুগে মসজিদ ছিলো বহুমাত্রিক ভূমিকার অধিকারী। আহলুস্ সুফ্ফাগণের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ চত্বরেই ছিল। মসজিদ চত্বর ছিলো সেনা ছাউনি, পার্লামেন্ট ভবন। মসজিদের মত এ বহুমাত্রিক ভূমিকা পৃথিবীর কোন প্রতিষ্ঠানেরই নেই। মুসলিম উম্মাহ যতদিন মসজিদের এ গুরুত্বের স্বীকৃতি দিয়েছে, মসজিদ থেকে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্মকান্ড পরিচালনা করেছে- ততদিন তাঁরা উন্নতির শীর্ষ চূড়ায় আরোহণ করেছেন। আর যখনই তাঁরা মসজিদের আদর্শ থেকে দূরে গেছে- তখনই অধঃপতনের শিকার হয়েছে।[৪]

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে সোনালী যুগের সূচনা করে সমগ্র বিশ্বকে আলোক উদ্ভাসিত করে তুলেছিলেন মসজিদই ছিলো তার উৎসমূল। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সাহিত্য-দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি শাস্ত্রে জীবনের সকল দিক ও বিভাগে এককালে যে সকল মুসলিম মনীষী,

[১] ড. ইয়াকুব আলী, *মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা*, উত্তরণ অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, রাজশাহী, ৫ম সংস্করণ, ১৪১৭/১৯৯৬, পৃ. ৩১

[২] প্রাগুক্ত

[৩] সম্পাদনা পরিষদ কতৃক সম্পাদিত, *সীরাত বিশ্বকোষ*, ৫ম খ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৪২৩/২৫০০৬, পৃ. ৩৭০

[৪] আবদুস সালাম রাহমানী, *তুযায়োনে মসজিদ*, আদ-দারুল ইলমিয়াহ, দিল্লী, ১৪১০/১৯৯০, পৃ.৩-৪

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞানী, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও পন্ডিত সমগ্র নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, এবং বর্তমান বিশ্বকে জ্ঞান সাধনার ঋণ- জালে আবদ্ধ রেখেছেন তাঁদের বুনিয়াদী জ্ঞানার্জন, প্রেরণা লাভ ও চরিত্র শিক্ষার ভিত্তি ছিলো এ পবিত্র মসজিদ।[১]

মসজিদে নববী ছিলো ইসলামের একটি অজেয় দূর্গ। তথা হতেই দীন ও দুনিয়ার সকল বিধি-বিধান ও আইন-কানুনের বিন্যাস হয়েছিল। এখানেই শিক্ষা দেওয়া হত যুদ্ধ-নীতি ও যুদ্ধের কলা-কৌশল এবং তথা হতেই পরিচালিত হত সামরিক অভিযান। দেশ-বিদেশের প্রতিনিধি দল এখানেই উঠত। পৃথিবীর প্রথম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো মসজিদে নববীর এক প্রান্তে।[২] মাওলানা আকরাম খাঁ বলেন, "হিজরী প্রথম সন হতে খলীফাগণের সুবর্ণ যুগের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই মসজিদই ইসলামের সর্বপ্রধান, বরং একমাত্র কর্মকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। দৈনিক ও সাপ্তাহিক উপাসনার জন্য মুসলমানদিগের সে সম্মেলন হইত, তাহা ব্যতিত সকল প্রকার শাসন-বিচার, শালিস-পঞ্চায়েত, সমর ও সন্ধি ইত্যাদি সংক্রান্ত আলোচনা ও পরামর্শ, বিদেশে দূত প্রেরণ বা বৈদেশিক রাজ- দূতগণের সাথে দেখা-সাক্ষাত, ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনা, উপদেশ ও পরামর্শ, এক কথায় জাতিগত, ধর্মগত, দেশগত সকল প্রকার আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা ও পরামর্শ এই আড়ম্বড়হীন মসজিদ প্রাঙ্গণ হতে সম্পাদিত হইত।[৩]

সত্য যুগে মসজিদ ছিলো জীবন্ত। তখন মসজিদ যেমন ছিলো ধর্মীয় অনুষ্ঠান কেন্দ্র, তেমনি ছিলো শিক্ষা কেন্দ্র, প্রচার কেন্দ্র। ইসলামী আদর্শকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যাঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, বাড়ি-ঘর যথা সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন, তাঁদের থাকা-খাওয়া মসজিদেই হয়েছে। তাঁদের মন-মস্তিষ্কের উন্নতির খোরাকে, সাহিত্য-সাধনা, আলোচনা মসজিদেই হয়েছে।[৪]

মসজিদ ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার এক অনন্য মাধ্যম। সমবেতভাবে মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে দৈনিক পাঁচবার এবং সপ্তাহে একবার আবেদন-নিবেদন করার এক বিরাট সুযোগ মসজিদ ইসলামের অনুসারিগণকে দান করেছে। মুসলিম মিল্লাতের সমাবেশের এমন উৎকৃষ্ট স্থান মসজিদ ব্যতীত আর অন্য কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। মসজিদে প্রবেশ করার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার নিকট সাধারণ

---

[১] অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০

[২] সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *সীরাত বিশ্বকোষ*, ৫ম খ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৯

[৩] মোহাম্মাদ আকরাম খাঁ, *মুস্তফা চরিত*, কাকলী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৩৮৫-৮৬

[৪] মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, *মসজিদ ও জীবন্ত মসজিদ*, ঢাকা, ৫ম সংস্করণ-২০০৩, পৃ. ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

গোলাম হিসেবে পৃথিবীর বুকে প্রকৃত সাম্য-মৈত্রী প্রতিষ্ঠার শপথ গ্রহণ করে। আইন-শৃঙ্খলা প্রশিক্ষণের সুযোগ তাঁরা এখানে পায়। রাষ্ট্র বা সমাজের নেতার মুসলিম মিল্লাতের প্রতিটি সদস্যের অভাব-অভিযোগ জানার বিরাট সুযোগ এখানে আছে।[১] আল্লাহ তাআলার ঘর মসজিদ উত্থান-পতনের কেন্দ্র। যে কওমের মসজিদ আবাদ ও জীবন্ত, সে কওম তত উন্নত। যে কওমের মসজিদ অনাবাদ-মুর্দা সে কওমও জীবনহীন মুর্দা।[২] বস্তুত পক্ষে মসজিদ একটি প্রাণময় নগর বা জনপদের মেরুদন্ড, একটি বিবর্তনশীল সমাজের জন্ম ও বিকাশের স্নায়ুকেন্দ্র এবং একটি ক্রমবর্ধনশীল সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞান।[৩]

মসজিদ আল্লাহর ঘর। এটি মুসলমানদের 'ইবাদতের পবিত্রতম স্থান। ইসলামী জিন্দেগীর প্রাণকেন্দ্র। যেমনিভাবে মসজিদ 'ইবাদত কেন্দ্র তেমনিভাবে মুসলিম জগতের শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের সূতিকাগার। পৃথিবীর যেখানেই মুসলমান, সেখানেই মসজিদ বিদ্যমান। মসজিদের হারানো আদর্শ ও কর্মসূচী পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে মুসলিম জাতি পেতে পারে তাঁদের হৃত গৌরব। তবে এজন্য প্রয়োজন সঠিক নেতৃত্ব ও চেতনাবোধ। তবেই মসজিদ হবে আবার জীবন্ত, প্রাণবন্ত এবং সূচনা হবে বিশ্ব শান্তির।[৪]

মসজিদের ইতিহাস

এই পর্যায়ে আমাদের স্মরণ করতে হবে মসজিদের প্রকৃত মর্যাদা ও ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা। সকলেই জানেন, নবী-ই-করীম (স) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে প্রথমে কুবার এবং তার পরে শহরের কেন্দ্রস্থলে সর্বপ্রথম যে কাজটি সম্পাদন করেন, তা হলো মসজিদ নির্মাণ। প্রথমে তিনি মদীনার উপকণ্ঠে অবস্থিত কুবা নামক স্থানে উপস্থিত হলেন এবং মাত্র চার দিনের অবস্থান কালেই তিনি এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, যা এখন পর্যন্ত 'মসজিদ-ই-কুবা' নামে পরিচিত। পরে মদীনার কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হয়েও তিনি সর্বপ্রথম এই মসজিদ নির্মাণের কাজটিই সম্পাদন করেন। মদীনায় অবস্থিত মসজিদে নববী খোদ রাসূল-ই-করীম (স) ও অন্যান্য মুসলমানের শারীরিক পরিশ্রমের ফলে নির্মিত। তখন একটি কবিতার ছত্র তিনি এবং অন্যান্য সব মুসলমান সানন্দে পাঠ

---

[১] ড. ইয়াকুব আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩

[২] মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

[৩] মোহাম্মদ শামসুল হক, *ইসলামী স্থাপত্য: তত্ত্ব ও দর্শন*, ঢাবি পত্রিকা, দ্বাত্রিংশ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮৮, পৃ. ১৬৫

[৪] ড. আসাদ শফিক, *মসজিদের সামাজিক প্রভাব : পর্যালোচনা*, ইফাবা, মুহররম ১৪০০, পৃ.২৭

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, "হে আমাদের আল্লাহ তাআলা! পারিশ্রমিত তো পরকালেই প্রাপ্য। অতএব (এই দুনিয়ায়) তুমি আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি রহমত বর্ষণ কর।"[১]

রাসূল-ই-করীম (স) মদীনায় উপস্থিত হয়ে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে ইতিপূর্বেই একটি ইসলামী সমাজের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন-তা সবারই জানা কথা। তাঁর নির্মিত মসজিদটি শুধু যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় ও জুম'আর জামা'আত অনুষ্ঠানের কেন্দ্র ছিল, তা-ই নয়। এই মসজিদই ছিলো হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর নেতৃত্বে নতুন গঠিত ইসলামী সমাজের উৎস।[২] এখান থেকেই রাসূল-ই-করীম (স) যাবতীয় সামষ্টিক ও রাষ্ট্রিক কাজ আঞ্জাম দিতেন। এই মসজিদেই বিচারকার্য সম্পন্ন হতো, বাদী-বিবাদীর বক্তব্য শুনে রায় দেওয়া হতো, যুদ্ধের ফয়সালা করা হতো, অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্রদের অভাব-দরিদ্র্য মোচনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো, বেকার কর্মক্ষম লোকদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করা হতো, বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাত ও কথাবার্তা বলা হতো। কুরআন মজীদের আয়াত নাযিল হলে এই মসজিদের মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে রাসূল-ই-করীম (স) তা পাঠ করে সকলকে শোনাতেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) কর্তৃক নিয়োজিত ওহী লেখকগণ এখানে বসেই রাসূল-ই-করীম (স) এর নির্দেশে তা লিপিবদ্ধ করতেন। এখানেই কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা দান করা হতো। ইসলামী শরীয়াতের বিস্তারিত বিশ্লেষণ এখানেই পেশ করা হতো।[৩] মসজিদই ছিলো প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের সচিবালয়, তা-ই ছিলো ঘর-বাড়ি বা আশ্রয়হীন মুসলমানদের প্রথম আশ্রয় ও আবাসস্থল-তা-ই ছিলো সকল কাজ সম্পন্ন করার কেন্দ্র। মসজিদের এই মর্যাদা অব্যাহতভাবে চলেছে কয়েক শত বছর পর্যন্ত। বলা বাহুল্য, মুসলিম সমাজে যতদিন মসজিদের এই মর্যাদা ও ভূমিকা অব্যাহত রয়েছে, ততদিন মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্র ছিলো পুরোপুরি আদর্শিক পর্যায়ে। উত্তরকালে যেদিন মসজিদ এই মর্যাদা হারিয়েছে, সেদিনই মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্র ইসলামের আদর্শিক পর্যায় থেকে পতিত হয়েছে। অতএব মুসলিম সমাজকে যদি আবার ইসলামের আদর্শিক স্তরে উন্নীত করতে হয়, তা'হলে মসজিদ-কেন্দ্রিক ইসলামী সমাজ গঠনের প্রক্রিয়া আবার শুরু করতে হবে।[৪]

---

[১] গালিব কান্দুলাবী, *মাসাজিদুল মুজাসসাম*, কায়রো ১৯৮৯, পৃ.৬৭

[২] অধ্যাপক লুৎফর রহমান, *মসজিদের সামাজিক ভূমিকা*, বর্ণমালা, ঢাকা ১৯৭৯, পৃ.২৯

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪

[৪] এ কে এম সিরাজুল ইসলাম, *মসজিদ ও আমাদের সমাজ*, সিন্দাবাদ প্রকাশনী, ঢাকা ২০০২, পৃ.৩৭

Dhaka University Institutional Repository

মোটকথা, ইসলামের সেই প্রাথমিক যুগে মসজিদ যখন তার উপর্যুক্ত ভূমিকা পালন করত, তখন প্রকৃতপক্ষেই ইসলামী সমাজ দাঁড়িয়েছিল, সঠিকভাবে কাজ করছিল, জীবন্ত ছিল। মুসলিম জনগণের উপর মসজিদের প্রভাব বা মসজিদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাভক্তি ও পবিত্রতাবোধ এখনও অক্ষুন্ন রয়েছে। তবে বিপুল সংখ্যক মুসলিম পরিচয় দানকারী ব্যক্তি এ মসজিদের সাথে ন্যূনতম কোনো সম্পর্কও রাখে না এটা দুঃখের সাথেই স্বীকার করতে হচ্ছে। মুসলিম দেশসমূহে পাশ্চাত্যেও সেকুলারিজম বা ধর্মহীনতা-ধর্মনিরপেক্ষতার যে ব্যাপক প্রচার, শিক্ষা ও প্রভাব চলছে, সে কারণে সার্বিকভাবে আজকের মসজিদ তার আসল ভূমিকা পালন করতে বা মসজিদ-কেন্দ্রিক সমাজ গঠন প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা চলতে পারছে না। পাশ্চাত্য প্রভাবে আমাদের ব্যক্তি-জীবন ও পারিবারিক জীবন যেমন ব্যাহত হচ্ছে, তেমনি সমাজ-পরিবেশও পাশ্চাত্যমুখী হয়ে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাবধারা গ্রহণ করে পাশ্চাত্য জাহিলিয়াতের নিঃসীম অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। ফলে মসজিদ তার প্রকৃত মর্যাদা অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছে।[১]

বাংলাদেশের মসজিদ

মধ্যযুগ ইউরোপের ইতিহাসে যুগবিন্যাস ভিন্নতর হলেও ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন, বিশেষত দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে আফগানিস্তানের ঘোরী বংশীয়দের দিল্লি অধিকারের সময় থেকেই ভারতবর্ষের ইতিহাসে মধ্যযুগের শুরু বলে সাধারণত ধরে নেওয়া হয়। দিল্লি অধিকারের পর কয়েক বছরের মধ্যেই মুসলমানদের বাংলায় আগমন ঘটে। ১২০৪-০৫ খ্রিষ্টাব্দের দিকে বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বঙ্গবিজয় থেকেই সূচনা হয় বাংলায় মুসলিম শাসনের। বাংলায় মুসলিম শাসন শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও পরিবর্তন ঘটায়। এতদিন যে উপাদানগুলি সমাজ ও সংস্কৃতিকে গড়ে তোলে তা ছিলো সাধারণ কথায় হিন্দু ও ভারতীয় উপাদান। কিন্তু এরপর তা আর অবিমিশ্র ভারতীয় হিন্দু উপাদান হিসেবেই থাকে না, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম উপাদানও এর সাথে যোগ হয়। মুসলমান তথা আরব, পারস্য দেশীয় ও আফগানদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় ও বহিরাগত মুসলিম উপাদানের সমন্বয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন আসে এবং তা আখ্যাত হয় 'ভারতীয় ইসলামী' বা 'ভারতীয় মুসলিম' উপাদানরূপে। এ সময়ে বাংলায় যে স্থাপত্যশিল্পের বিকাশ ঘটে তা শুধু সাধারণভাবে 'ভারতীয় মুসলিম'ই নয়, বিশেষভাবে স্থানীয়ও। এটি এমন একটি

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপত্যরীতি যা রূপলাভ করে স্থানীয় হিন্দু-বৌদ্ধ রীতির সঙ্গে মুসলিম উপাদানের সংমিশ্রণে। মুসলমানগণ নিয়ে এসেছিলেন তাদের ধর্মীয় প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ গঠনশৈলী এবং হিন্দু ও বৌদ্ধরা তাতে যোগান দিয়েছেন নির্মাণের কলাকৌশল। বলা বাহুল্য যে, মুসলমানগণ ইমারতের কাঠামো পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পৃক্ত এমন কিছু নির্মাণশৈলীও আমদানি করেন যার সাথে ইতঃপূর্বে ভারতীয়দের কোন পরিচয় ছিলো না। এগুলি হচ্ছে কোন ইমারতের সদরের বহির্ভাগের কাঠামো নির্মাণে খিলান ও স্তম্ভ এবং গম্বুজ তুলে ধরার জন্য পেন্ডেন্টিভ ও স্কুইঞ্চের ব্যবহার। মূলত এগুলি মুসলিম উপাদান নয়। মুসলমানরা প্রাক-ইসলাম যুগে ব্যবহৃত রোমান-বাইজেন্টীয় ও পারসিক উৎস থেকে এগুলি গ্রহণ করে এমনভাবে প্রয়োগ করেছেন যে, সারা ইসলামী বিশ্বে সেগুলি মুসলিম ইমারতের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। হিন্দু-বৌদ্ধ টেকনিকের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হয় ছাদ ধরে রাখার জন্য ব্যবহৃত স্তম্ভ, সর্দল (লিন্টেল) ও কড়ি-বরগা এবং ইমারতের কোণ ভরাটের জন্য কর্বেল রীতির প্রয়োগ। এগুলি হচ্ছে সুদীর্ঘকালের পাথর খোদাই কাজের রীতির সাথে সম্পৃক্ত টেকনিক।[১]

সুলতানি আমল বখতিয়ার খলজীর বঙ্গবিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সূচনা হয় বাংলায় মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের। মিনহাজের তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, বখতিয়ার খলজী 'মসজিদ মাদ্রাসা ও খানকাহ' নির্মাণ করিয়েছিলেন। কিন্তু নিছক অনুমান ছাড়া এসব নির্মাণকাজের ধরন ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অতি সামান্যই জানা যায়। অপরাপর দেশের সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং এদেশের পরবর্তী সময়ের জ্ঞাত উদাহরণ থেকে অনুমান করা যায় যে, তারা যুদ্ধকালে শত্রুদের পরিত্যক্ত স্থানীয় উপকরণ এসব কাজে ব্যবহার করেছিলেন।[২] উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে মুসলমানগণ তাদের বিজয়ের পরপরই প্রয়োজনবোধে শত্রুদের পরিত্যক্ত গির্জা ও মন্দিরগুলিকে মসজিদরূপে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশে এটা সম্ভব ছিলো না, কারণ মন্দিরগুলির স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য, প্রধানত এদের আকার ও দিগ্বলনের কারণে এগুলি মসজিদে রূপান্তর করার অনুপযোগী ছিল। কাজেই নির্মাণ কারিগরদের (বেশির ভাগ স্থানীয়) হাতে মসজিদের নকশা তুলে স্থানীয় উপকরণ দিয়ে তাদের নিজস্ব নির্মাণশৈলী মোতাবেক মসজিদের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করতে বলাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল। এর ফল ছিলো সুস্পষ্ট; স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করে স্থানীয় নির্মাণপদ্ধতিতে মসজিদ নির্মিত হয়।

---

[1] HC CREIGHTON, *Ruins of Gaur*, London, 1817, p.57

[২] M. A. Rahim, *Social and Cultural History of Bengal,* op.cit, p.120

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গবিজয়ের পরে এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে যে অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা বিরাজ করছিল, তাতে এই সময়ে বহু ইমারত নির্মিত হয়েছিলো এমনটি মনে করা স্বাভাবিক নয়। শিলালিপিতে বিধৃত কতিপয় বরাত এবং এখনও বিদ্যমান জাফর খান গাজী মসজিদ ও সমাধিসৌধ এবং পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার ত্রিবেণীতে অবস্থিত বরী মসজিদ ও মিনার ছাড়া অপর কোন ধর্মীয় ও সেক্যুলার ইমারতের টিকে থাকার নজির নেই।[1]

এমনকি, যে জাফর খান গাজীর মসজিদ ও বরী মসজিদ যথাক্রমে ত্রয়োদশ শতকের শেষদিকে এবং চতুর্দশ শতকের প্রথমদিকে নির্মিত বলে কথিত, সেগুলিতেও পরবর্তীকালের মসজিদের নির্মাণবৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। গৌড়ের কদম রসুল ও রাজশাহীর বাঘা মসজিদ এর সঙ্গে জাফর খান গাজীর মসজিদের, বিশেষত সম্মুখদিকের স্তম্ভ ও ভেতরের মিহরাবের তুলনা করলে প্রমাণিত হয় যে, এগুলি হোসেন শাহী আমলে নির্মিত অথবা সেসময়ে পরিবর্তিত ও পুনর্নির্মিত। বরী মসজিদের অবয়বের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অবস্থা। এই মসজিদের স্তম্ভ, খিলান ও পেডেন্টিভ গৌড়ের দরসবাড়ি বা ধুনিচক মসজিদ এর স্তম্ভ খিলান ও পেডেন্টিভের মধ্যে এমনই সাদৃশ্য বিদ্যমান যে, এই মসজিদ দুটি নিঃসন্দেহে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে পরবর্তী ইলিয়াসশাহী শাসনামলে নির্মিত হয়েছিল।[2]

১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দে ইলিয়াসশাহী বংশের ক্ষমতালাভের ফলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এতকাল দিল্লির সুলতানের অধীনস্থ শাসনকর্তাগণ বাংলা শাসন করতেন। এই শাসনকর্তারা মাঝেমধ্যে বিদ্রোহী হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন। কিন্তু ইলিয়াসশাহী বংশের ক্ষমতা লাভের ফলে প্রায় সমগ্র দেশের উপর কর্তৃত্ব ও স্থানীয় উনিয়ে একটি সার্বভৌম রাজবংশ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। হাজী ইলিয়াস শাহ ই বাংলায় সর্বপ্রথম 'শাহ-ই-বাঙ্গালা' উপাধি ধারণ করেন। এই বংশের সুলতানগণ মধ্যখানে তেইশ বছরকাল বিরতিসহ ১৩৪২ থেকে ১৪৮৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গদেশ শাসন করেন। এই তেইশ বছর (১৪১৩-১৪৩৫) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন শিহাবউদ্দীন বায়েজীদ শাহ এবং রাজা গণেশ ও তাঁর বংশধরগণ। ইলিয়াস শাহী বংশের পর অল্প সময়ের জন্য ক্ষমতায় আসেন হাবশী শাসকগণ (১৪৮৭-১৪৯৩)। এঁদের পর ১৪৯৪ থেকে ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গদেশ শাসন করেন হোসেনশাহী বংশীয়রা। ১৫৩৮ থেকে ১৫৬৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শূর বংশীয় এবং ১৫৬৩ থেকে ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মুগলদের বঙ্গদেশ বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত শাসন কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন কররানী বংশীয় শাসকগণ। ১৩৪২ থেকে ১৫৭৬ পর্যন্ত সময়টি ছিলো বাংলায় মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসের সবচেয়ে

---

[1] ibid, p.123

[2] ibid, 125

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বপূর্ণকাল। এসময় স্থাপত্যশিল্প তার স্বকীয় রীতি পরিগ্রহ করে এবং সাধারণত একে বাংলা রীতি বলে আখ্যাত করা হয়। এই বাংলা রীতি দিল্লির সুলতানি রীতি বা ভারতের অন্যান্য আঞ্চলিক রীতি থেকে ভিন্নতর। এই নতুন রীতিতে ইলিয়াসশাহী ও হোসেন শাহী সুলতানরা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।[1]

স্বাধীন যুগের যেসকল সৌধ এখনও টিকে আছে তার সবগুলিই রাজধানী শহর অথবা বিভাগীয় সদরে অবস্থিত। এর থেকে বোঝা যায় যে, তখনকার সময়ে স্থাপত্যশিল্প ছিলো একান্তই শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপার। যেসব নগর বা শহরে এসব সৌধ টিকেছিলো তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গৌড়-লখনৌতি, পাণ্ডুয়া-ফিরুজাবাদ, মাহমুদাবাদ বা মুহম্মদাবাদ, খলিফাতাবাদ, সোনারগাঁও ও বাঘা। এদের সবগুলিই ছিলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্র। সুরা, কুসুম্বা, শৈলকুপা, নবগ্রাম, মসজিদবাড়ি, রামপাল প্রভৃতি স্থানে ছোট অথচ স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ যেসব মসজিদ রয়েছে তার থেকে বোঝা যায় যে, এসব স্থান একসময় ছিলো ছোট প্রশাসনিক কেন্দ্র বা বাজার।[2]

যেসব স্থাপত্য নিদর্শন এখনও টিকে আছে তার অধিকাংশই ধর্মীয় ইমারত। এর কারণ সুস্পষ্ট। ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে ইমারতগুলি পরিত্যক্ত হলেও এদের উপকরণ অপহৃত বা লুণ্ঠিত হয়নি। গৌড়-লখনৌতি ও পাণ্ডুয়া-ফিরুজাবাদের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে যে, ব্যক্তিগত ইমারত তৈরির জন্য কিভাবে পুরাতন সেক্যুলার ইমারতগুলি অপহৃত বা লুণ্ঠিত হয়েছে।

ধর্মীয় শ্রেণীর ইমারতের মধ্যে মসজিদের প্রাধান্যই সর্বাধিক। এগুলি আবার দুধরনের- শুক্রবারের জুমা'র নামাযের জন্য জামে মসজিদ এবং ওয়াক্তিয়া মসজিদ। এই ওয়াক্তিয়া মসজিদকে কখনও কখনও পাঞ্জেগানা মসজিদও বলা হয়। শুধু পাঞ্জেগানা বা দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের জন্য ব্যবহৃত হয় বলে এই মসজিদগুলির এরূপ নাম দেওয়া হয়েছে। জামে মসজিদকে আলাদাভাবে শনাক্তকরণের চিহ্ন হচ্ছে এগুলি আকারে বড় এবং এতে সাধারণত উত্তর-পশ্চিম কোণে শাহী গ্যালারি বা মাকসুরা থাকে অনেকটা দোতলার মতো। শাসক বা তার প্রতিনিধির নিরাপত্তা বিধানের জন্য এই গ্যালারি বা মাকসুরা নির্মাণ করা হয়। খলিফাতাবাদ মসজিদ অর্থাৎ বর্তমান বাগেরহাট জামে মসজিদে (আদিনা মসজিদ এর পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম মসজিদ) শাহী গ্যালারি না থাকার কারণ এখানে গ্যালারির বিকল্প হিসেবে মধ্যবর্তী মিহরাবের উত্তর পাশে একটি গুপ্ত পথ তৈরি করা হয়েছে।

[1] M A Karim, *Socio-Religious History of East Bangal,* Dhaka 1978, p.77

[2] ibid, p.80

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম দিকের শাসকগণ মিহরাবকে বেষ্টনকারী মাকসুরায় পৌছার জন্য মাঝেমধ্যে এই পথটি ব্যবহার করতেন।[১]

জামে মসজিদগুলি সচরাচর আয়তাকার ও বহু গম্বুজবিশিষ্ট। এতে মধ্যখানে লম্বালম্বিভাবে ভাগ করা খিলানযুক্ত বিস্তৃত 'নেভ' থাকে। হজরত পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ ছাড়া কোন জামে মসজিদেই 'রিওয়াক' বেষ্টিত খোলা 'সাহান' নেই। ঐতিহ্যবাহী জামে মসজিদের এই বৈশিষ্ট্যটি ভারতের বাইরে অথবা দিল্লির কোন মসজিদেও সংযোজন করা হয় নি। স্থানীয় আবহাওয়া এই নকশার জন্য অনুপযোগী বলেই তা করা হয় নি।[২]

আদিনা মসজিদ (১৩৭৩) ও খলিফাতাবাদ মসজিদ (পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ) ছাড়া সুলতানি আমলের প্রতিনিধিত্বকারী নিম্নোক্ত জামে মসজিদগুলি নজির হিসেবে উল্লেখ করা যায়: গুণমন্ত মসজিদ (পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ), তাঁতিপাড়া মসজিদ (আনু. ১৪৮০), দরসবাড়ি মসজিদ (১৪৭৯), গৌড়-লখনৌতির ছোট সোনা মসজিদ (১৪৯৪-১৫১৯) ও বড় সোনা মসজিদ (১৫২৬), রাজশাহীর বাঘা মসজিদ (১৫২২) ও কুসুম্বা মসজিদ (১৫৫৮) এবং সম্প্রতি উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত বারো বাজারের (যশোর) সাতগাছিয়া ও মনোহর দিঘির জামে মসজিদ (পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ অথবা ষোড়শ শতকের প্রথম দিকের)। রাজকীয় গ্যালারি নেই অথচ শিলালিপিতে জামে মসজিদ বলে উল্লিখিত একমাত্র মসজিদ হচ্ছে মুন্সিগঞ্জ জেলার রামপালের মসজিদ। এই মসজিদটি পরবর্তী ইলিয়াসশাহী বংশের শেষ সুলতান জালালুদ্দীন ফতেহ শাহ কর্তৃক ৮৮৮ হিজরিতে (১৪৮৩ খ্রি) নির্মিত হয়।[৩]

ওয়াক্তিয়া মসজিদগুলি আকারে ছোট এবং সাধারণত বিভিন্ন এলাকায় নির্মিত হয়ে থাকে। এগুলি শুধু নামাযের জন্যই নয়, সামাজিক বৈঠক অনুষ্ঠানস্থল এবং প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষালয়রূপেও ব্যবহৃত হতো। এই মসজিদগুলি সাধারণত এক গম্বুজ বিশিষ্ট। এ ধরনের কোন কোন মসজিদের সম্মুখভাগে উত্তর ও দক্ষিণে বিস্তৃত খিলানাকৃতি বারান্দাও থাকে। জামে ও ওয়াক্তিয়া উভয় ধরনের মসজিদের খিলান তৈরি হয় বাংলার চিরায়ত কুটিরের অনুকরণে চৌচালা আকৃতিতে। এধরনের মসজিদের চৌচালা খিলানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো গৌড়-লখনৌতির চামকাটি মসজিদ (১৪৭৫), খনিয়া দিঘি

---

[1] ইয়াসিন আহমেদ, *বাংলাদেশের মসজিদ*, ঢাকা ২০০১, পৃ.২৯

[2] প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫

[3] অধ্যাপক লুৎফর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ.২৭

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদ ও লট্টন মসজিদ (পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকের), বাগেরহাটের রণবিজয়পুর মসজিদ ও বিবি বেগনি মসজিদ (পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের), বারো বাজারের জোড় বাংলা ও গোড়ার মসজিদ (পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ বা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকের), সোনারগাঁয়ের গোয়ালদি মসজিদ (পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ বা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকের) এবং দিনাজপুরের সুরা মসজিদ (পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ বা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকের)।[১]

টিকে থাকা অপরাপর ধর্মীয় শ্রেণীর সৌধ হচ্ছে কিছুসংখ্যক সমাধিসৌধ। এই সৌধগুলি দুধরনের: ইমারত ও পাথরে বাঁধানো কবর। এ ছাড়া রয়েছে গৌড়-লখনৌতির দুটি মাদ্রাসা ভবন। এদের একটির ভিত সম্প্রতি খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে। ইমারতগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পাণ্ডুয়া-ফিরুজাবাদের জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের (১৪১৫-১৪৩২) সমাধি ও বাগেরহাটের খান জাহান এর (মৃত্যু ১৪৫৯) সমাধি। বর্গাকার ও এক-গম্বুজ বিশিষ্ট এই সৌধগুলি সম্ভবত নির্মিত হয়েছে দিল্লির বর্গাকার সৌধের অনুকরণে, যার সর্বপ্রাচীন উদাহরণ সুলতান ইলতুৎমিশ এর সমাধিসৌধ। এই ধরনের সৌধের উৎস প্রাক-ইসলামী যুগের সাসানীয় চাহারতক্। মনে হয়, সমাধিসৌধ নির্মাণ মোগল আমলে যত প্রচলিত ছিলো সুলতানি আমলে ততটা ছিলো না। পাথরে নির্মিত সমাধির মধ্যে ব্যাপকভাবে পরিচিত সোনারগাঁয়ে গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের সমাধি। পাথর খোদাই করে এই সমাধিটি নির্মিত। পাথরে নির্মিত অপরাপর সমাধি, যেমন গৌড়-লখনৌতিতে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ও তাঁর পরিবারবর্গের সমাধি, পাণ্ডুয়া-ফিরুজাবাদের শেখ জালালুদ্দীন তাবরিজি (মৃত্যু ১২২৬ বা ১২৪৪) ও নূর কুতুব আলম এর (মৃত্যু ১৪১৫) সমাধি থেকে এটি ব্যতিক্রমী। এসব পাথরে বাঁধানো সমাধির মধ্যে শুধু পুণ্যাত্মাদের সমাধি ছাড়া আর সব এমনই অরক্ষিত যে, এগুলি সহজেই প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা ও উদ্দেশ্যমূলক ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়ে পড়ছে। স্থানীয়ভাবে দরসবাড়ি মাদ্রাসা (১৫০৪) নামে পরিচিত গৌড়-লখনৌতির মাদ্রাসা ছিলো মধ্যখানে উন্মুক্ত চত্বরসহ বিশাল এক আয়তাকার ইমারত। মধ্যখানের পশ্চিম দিকের কক্ষ ছাড়া উন্মুক্ত চত্বরের চারপাশের কক্ষগুলি ডরমেটরিরূপে ব্যবহৃত হতো। মধ্যখানের অপেক্ষাকৃত বড় কক্ষটি

---

[1] ইয়াসিন আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ.৪০

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহৃত হতো মসজিদ হিসেবে। এই কক্ষের তিনটি মিহরাবই তার প্রমাণ। বেলবাড়ি মাদ্রাসা (১৫০২) নামে পরিচিত গৌড়ের অপর একটি মাদ্রাসা উদ্ধারের জন্য এখনও কোন খননকাজ হয়নি।[১]

গৌড়-লখনৌতির কদম রসুল (১৫৩১) এক আলাদা ধরনের ধর্মীয় সৌধের একক উদাহরণ। তবে সুলতানি আমলে ধর্মীয় সৌধ হিসেবে এর তেমন স্বীকৃতি ছিলো না। হোসেনশাহী বংশের নাসিরুদ্দীন নুসরত শাহ মসজিদের অবয়বে এটি নির্মাণ করান। তবে এর কেন্দ্রস্থলে ছিলো অতীব সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক হিসেবে মহানবী (সঃ)-এর পদচিহ্নের স্মারক স্থাপনের জন্য একটি মঞ্চ। এই রীতি মুগল আমলে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।[২]

সেক্যুলার সৌধ এখন খুব কমই টিকে আছে। টিকে আছে শুধু কয়েকটি ফটক (দাখিল দরওয়াজা , গুমতি গেট ও চিকা ভবন , শেষোক্তটি সম্ভবত একটি অফিস ভবন), আর আছে গৌড়-লখনৌতিতে কিছুসংখ্যক সেতুর অবশেষ (পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের) এবং গৌড়-লখনৌতি ও পাণ্ডুয়া-ফিরুজাবাদের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। গৌড়-লখনৌতি প্রাসাদের (পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের) বাইশগজী নামে পরিচিত চৌহদ্দি দেওয়ালের কিছু অংশ এবং মোজাইক করা পাকা মেঝের কিছু অবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। পাণ্ডুয়া-ফিরুজাবাদ প্রাসাদও (চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের) এখন সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত ও জঙ্গলে আচ্ছাদিত। এর কিছু অংশ এখন পরিণত হয়েছে চাষের জমিতে। এখন একটি হাম্মামের ভগ্নাংশ ও একটি ভাঙা বুরুজ থেকে প্রাসাদটিকে শনাক্ত করা হয়। এটি সম্ভবত মিনার নামে পরিচিত নগরের ফটকের কোণের একটি বুরুজ। মোটা স্তম্ভ ও দেয়ালের কারুকার্য সমেত দুই নগরের প্রাসাদগুলির যে বিবরণ চীনা ও পর্তুগিজ পর্যটকরা রেখে গেছেন, তা থেকে এ দুটি বিশাল নগরের গৌরবময় দিনের কথা জানা যায়। এগুলি ছিলো মধ্যযুগীয় নগরের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক উদাহরণ।[৩]

আকৃতি বা রীতি ব্যতিরেকে বাংলায় সুলতানি আমলের স্থাপত্যশিল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো যে, এ যুগের ইমারতগুলি ইটের তৈরি, দেওয়াল বেশ পুরু (১.৫ থেকে ৪ মিটার), সম্মুখভাগে পাথর অথবা পাথরের সরদল মাঝখান দিয়ে সরাসরি বসানো। যে বুরুজ সংযোজন করে ইমারতের কোণ মজবুত

---

[১] A CUNNINGHAM, *The Archaeological Survey of India Report*, Vol. XV, 'Report of a Tour in Bihar and Bengal in 1879-80', Calcutta, 1882, p.236

[2] M A Karim, ibid, p.85

[3] ibid, p.86

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়েছে তার বেশির ভাগই অষ্টভুজাকৃতি, কখনও কখনও গোলাকার এবং ছাদের শীর্ষভাগ সমতলে উঁচু ও চূড়াবিহীন। এক বুরুজ থেকে অন্য বুরুজ পর্যন্ত টানা ছাদ ধনুকের মতো বাঁকা, প্রচলিত কুঁড়েঘর আকৃতির অনুকরণে তৈরি। ছাদের উপরে উল্টানো পাত্র আকৃতির স্থানীয় ধরনের গম্বুজ। এই গম্বুজের বেশির ভাগই ত্রিকোণী পেন্ডেন্টিভের উপর এবং মাঝেমধ্যে স্কুইঞ্চের উপর বসানো। গম্বুজ স্থাপনের এ দুটি পদ্ধতিই বহিরাগত। বড় বড় ইমারতের অভ্যন্তরভাগে দ্বিকেন্দ্রিক সূচাগ্র খিলান বহনের জন্য গ্রানাইট পাথরের বাঁকা অথচ শক্ত দেশীয় স্তম্ভ সারিবদ্ধভাবে বসানো আছে এবং এর ফলে ভেতরে একটা খোলামেলা আবহের সৃষ্টি হয়েছে। ইমারতের ভেতর ও বাইরে ছিলার আলঙ্কারিক পট্টি বা বন্ধনী এবং স্থানীয় পোড়ামাটির ফলকের নকশা দ্বারা কারুকার্য করা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হচ্ছে বিভিন্ন ডিজাইনের ঝুলন্ত নকশা ধরে রাখার জন্য লতাপাতার ফ্রেম, যা মূলত মন্দির অলঙ্করণের শিকল ও ঘন্টার মোটিফ থেকে গৃহীত। মসজিদগুলিতে পূর্বদিকের প্রবেশপথ বরাবর সমসংখ্যক মিহরাবে ছিলো সম্মুখ দিকে গ্রিল করা খিলান এবং পুরো নকশাই আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে এমন ব্যাপকভাবে কারুকার্যমণ্ডিত ছিলো যে, এর মধ্য দিয়ে পুরো অভ্যন্তরভাগ তাৎক্ষণিকভাবে পরিদৃষ্ট হতো।[১]

ইমারতের উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্য বাংলায় সুলতানি স্থাপত্যকে একটি আলাদা রূপ দিয়েছে। এই রূপ ছিলো ভারতবর্ষ ও অপরাপর স্থানের মধ্যযুগীয় স্থাপত্য থেকে ভিন্নতর। এই বৈশিষ্ট্য এমন একটি রীতির জন্ম দিয়েছে যা স্পষ্টতই ছিলো স্বতন্ত্র বাঙালি রীতি। এই রীতি প্রচলিত ছিলো চর্তুদশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে এবং পরবর্তী শতাব্দীগুলিতেও এই ধারা অব্যাহত ছিলো বিশেষত মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে। অবশ্য মুগল ইমারতশিল্পের অনুপ্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত এই ধারা অক্ষুণ্ন ছিলো এবং সপ্তদশ শতাব্দী থেকে মুগল স্থাপত্যরীতিই স্বীকৃত ধারায় পরিণত হয়।

মুগল আমল বাংলায় মুগল স্থাপত্য ছিলো সুলতানি স্থাপত্য থেকে ভিন্নতর। এটি কোন স্বতন্ত্র বা জাতীয় রীতির বহিঃপ্রকাশ ছিলো না, বরং আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি, দিল্লি বা লাহোরে যে রাজকীয় মুগল স্থাপত্য গড়ে উঠেছিল, এটি ছিলো তারই প্রাদেশিক সংস্করণ। বাংলায় কর্মরত মুগলরা তাদের উত্তর ভারতীয় প্রভুদের মতোই ছিলেন মধ্য এশিয়া ও পারস্যের মুগল-তৈমুরীয়দের সরাসরি বংশধর এবং তারা বাদশাহদের প্রতিনিধিরূপে শাসনকর্তা হিসেবে বাংলায় প্রেরিত হয়েছিলেন। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন সম্রাটদের আত্মীয় বা তাদের আস্থাভাজন। এই আমলে বাংলায় প্রবর্তন করা হয় কেন্দ্রে মুগল

---

[1] Arnold D. Macgil, *An Introduction to Indian Religious Institution,* Vol-iv, London 1994, p.342

Dhaka University Institutional Repository

জীবন ও সংস্কৃতির উপর নির্ভরশীল প্রত্যক্ষ শাসন। প্রাক-মুগল আমলে বাংলার একটি নিজস্ব পরিচিতি ছিল। কিন্তু মুগল আমলে তা হারিয়ে যায় এবং বাংলা পরিণত হয় মুগল সামগ্রিক জীবনধারার ক্ষুদ্র সংস্করণসহ একটি মুগল প্রদেশে। স্থাপত্যের ক্ষেত্রে এর কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি।[1]

১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে আকবর এর সেনাপতিরা বাংলার পশ্চিম অংশ অধিকার করলেও জাহাঙ্গীর এর শাসনামলের (১৬০৫-১৬২৭) গোড়ার দিকের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র বাংলায় মুগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আকবর ও জাহাঙ্গীরের শাসনামলে বারো ভূঁইয়া নামে পরিচিত স্থানীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অনেকটা ব্যাপৃত থাকায় এই আমলে খুব কমই স্থাপত্য নির্মাণকর্ম সম্পন্ন হয়েছে। বাংলায় মুগলদের অধীনে যেসব স্থাপত্যকর্ম সম্পন্ন হয়েছে তার অধিকাংশই শাহজাহান ও আওরঙ্গজেব এর আমলে বাংলার সুবাহদারদের কাজ। আওরঙ্গজেবের সময়ে বাংলার সুবাহদারি বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের রূপ পরিগ্রহ করে এবং সুবাহদারগণ এতটাই ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন যে, তারা প্রায় স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করেন এবং স্বাধীনভাবেই তারা স্থাপত্যের ক্ষেত্রে স্ব স্ব অবদান রাখেন। ১৬৭৮-৭৯ খ্রিষ্টাব্দে স্বল্পকালীন বিরতিসহ শায়েস্তা খান ১৬৬৪ থেকে ১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন। তাঁর সময়ে বিশেষত রাজধানী ঢাকার আশপাশসহ দেশে এতো ইমারত নির্মিত হয় যে, কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁর কীর্তিকে একটি স্বতন্ত্র স্থাপত্যরীতি হিসেবে চিহ্নিত করে একে 'শায়েস্তা খানী রীতি' রূপে আখ্যাত করেছেন।[2]

এ আমলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে, শুধুমাত্র মুগলরাই তাদের পছন্দ মাফিক ইমারত নির্মাণ করে নি, হিন্দুরাও মন্দির নির্মাণ করেছে এবং দেশে এখনও সেসময়ে নির্মিত বহুসংখ্যক মন্দির টিকে আছে। এরূপ মনে করার কোন কারণ নেই যে, স্বাধীন সুলতানদের আমলে মন্দির নির্মিত হয় নি। এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক সম্পূর্ণ সেক্যুলার ইমারত হিসেবে পরিচিত। কিন্তু এরূপ ধারণা অবশ্যই করা যায় যে, কাল পরিক্রমায় সেগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে। সেকালে নির্মিত বিদ্যমান মন্দিরের স্বল্পতার কারণ মন্দিরগুলির ধরন, ছোট ও উর্ধ্বমুখী অবয়ব, বছরের একটা দীর্ঘ সময়ে প্রবল বৃষ্টিজনিত প্রতিকূল আবহাওয়া, রক্ষণাবেক্ষণের ধরন, যুদ্ধ ও শিল্পকর্মের শত্রু লুটেরাদের দৌরাত্ম্য।

---

[1] Arnold D. Macgil, ibid, p.345

[2] ABID ALL KHAN and HE STAPLETON, *Memoirs of Gaur and Pandua*, Calcutta, 1931, p.34

মুগল শাসনামলে সমভাবে হিন্দু ও মুসলিম জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং কালের ব্যবধান হিন্দু মন্দির-ইমারতের টিকে থাকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলির অন্তর্ভুক্ত। মুগল আমলের কয়েকটি মন্দির উল্লেখযোগ্য। এগুলি হলো ঢাকায় অবস্থিত ঢাকেশ্বরী মন্দির (অনেকটা আধুনিকায়িত), পাবনার জোড় বাংলা মন্দির (সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকের), ফরিদপুরের খালিয়ায় রাজারাম মন্দির (অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকের), দিনাজপুরে কান্তনগর মন্দির (১৭৫২), পুটিয়ায় গোবিন্দমন্দির ও শিবমন্দির (উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের), চান্দিনায় আটচালা মন্দির (উনবিংশ শতাব্দী)। পোড়ামাটির অলঙ্করণ শিল্পের উৎকর্ষের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন পরিলক্ষিত হয় কান্তনগর মন্দির ও গোবিন্দমন্দিরে।[1]

মুগল আমলের এখনও টিকে থাকা মুসলিম সৌধগুলি সুলতানি আমলের সৌধের মতোই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়- ধর্মীয় ও সেক্যুলার। ধর্মীয় সৌধগুলির মধ্যে বেশিরভাগই মসজিদ এবং এর পরেই আসে সমাধিসৌধ। অপরাপর ধর্মীয় কাঠামো যেমন ঈদগাহ, ইমামবারা ও কদম রসুল সংখ্যায় খুবই কম এবং এগুলি মুগল আমলের শেষের দিকের বা মুগল পরবর্তী যুগের এমন কিছু দুর্লভ উদাহরণ যাতে তেমন কোন লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থাপত্যশৈলী পরিদৃষ্ট হয় না।

মাদ্রাসার একটি দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় না। ঢাকার করতলব খান মসজিদ (১৭০০-১৭০৪) ও খান মুহম্মদ মির্ধা মসজিদ এর (১৭০৬) নিচতলার আলাদা আলাদা আবাসকক্ষ এবং মুর্শিদাবাদের কাটরা মসজিদ এ (১৭২৪-২৫) ডরমেটরি হিসেবে দ্বিতল খিলান আবৃত কক্ষসমূহ এখনও মসজিদের অংশ হিসেবে বিদ্যমান। এর থেকে বোঝা যায় যে, তখন মাদ্রাসাগুলি মসজিদের সংগেই সংশ্লিষ্ট ছিল, এদের কোন পৃথক অবস্থান ছিলো না।[2]

সুলতানি আমলের মতোই মুগল আমলের মসজিদগুলি ছিলো দুধরনের- জামে মসজিদ ও ওয়াক্তিয়া মসজিদ। মুগল জামে মসজিদগুলি কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণত ছিলো আকারে ছোট, তিন গম্বুজবিশিষ্ট এবং সম্মুখভাগে ছিলো উন্মুক্ত পাকা অঙ্গন (সাহান)। কিন্তু সুলতানি আমলের মসজিদে এ ধরনের কোন অঙ্গন ছিলো না। মুগল আমলের ব্যতিক্রমী জামে মসজিদগুলির মধ্যে রয়েছে রাজমহলের জামে মসজিদ (১৫৯৫-১৬০৫), ঢাকার করতলব খান মসজিদ (১৭০০-১৭০৪) এবং

[1] ABM HUSAIN, 'The Ornamentation of the Sultanate Architecture in Bengal', *Journal of the Bangladesh Shilpakala Academy*, Dhaka, 1978, p.132

[2] AH DANI, *Muslim Architecture in Bengal*, Dhaka, 1961, p.54

Dhaka University Institutional Repository

মুর্শিদাবাদের কাটরা মসজিদ (১৭২৪-২৫) ও চক মসজিদ (১৭৬৭)। এই ব্যতিক্রমী মসজিদগুলির মধ্যে রাজমহলের জামে মসজিদ মানসম্মত পরিকল্পনায় নির্মিত একটি বিশালকায় ইমারত এবং এতে পাণ্ডুয়া-ফিরুজাবাদের সুলতানি মসজিদের ঐতিহ্য অনুসরণ করা হয়েছে। এতে একটি পিপাকৃতি খিলান ছাদ নামায কক্ষের মূল অংশকে দুটি সমান ভাগে বিভক্ত করেছে। এই দুই অংশের দুপাশে রয়েছে দুটি বারান্দা এবং এর উপরিভাগে প্রতি পার্শ্বে চারটি বড় ও চারটি করে ছোট গম্বুজ স্থাপিত। অন্যান্য মসজিদগুলি পাঁচ গম্বুজবিশিষ্ট। তিন গম্বুজবিশিষ্ট মুগল মসজিদের সর্বোত্তম উদাহরণ গৌড়-লখনৌতির নিয়ামতউল্লাহ ওয়ালীর মসজিদ (সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ), ঢাকার লালবাগ কেল্লা মসজিদ ও সাতগম্বুজ মসজিদ (সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ) এবং মুর্শিদাবাদের পিলখানা মসজিদ (অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ)। এই ধরনের মসজিদের নমুনা সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে আছে। মুগল আমলের জামে মসজিদের অভ্যন্তরে কোন রাজকীয় গ্যালারি নেই। এই প্রদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে মুগলীকরণই এর কারণ। ওয়াক্তিয়া মসজিদগুলি সবই ছোট আকৃতির, এক গম্বুজবিশিষ্ট এবং সুলতানি আমলে নির্মিত এ জাতীয় মসজিদের তুলনায় এদের সংখ্যা অনেক বেশি। ঢাকার আল্লাকুরি মসজিদ (সপ্তদশ শতকের শেষের দিক) এ জাতীয় মসজিদের একটি উদাহরণ। মুগল আমলের মসজিদের একটি চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মূল নির্মাণকাঠামোর অবিচ্ছিন্ন অংশ অথবা সাজসজ্জা উপকরণ হিসেবে দোচালা নকশার সংযোজন। মুগল মসজিদে এই দোচালা নকশার সংযোজন ছিলো সুলতানি আমলের মসজিদের চৌচালা খিলান ছাদ প্রয়োগরীতির একটি বিশিষ্ট ব্যতিক্রম।[১]

সমাধিসৌধগুলিতে সাধারণত পুরানো ঐতিহ্য অনুসরণ করা হতো, যেমন গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার কাঠামো এবং অভ্যন্তরভাগে প্রস্তর নির্মিত একটি বা একাধিক সমাধি। ঢাকায় বিবি পরী র সমাধিসৌধ (আনু. ১৬৮৪) এবং রোহনপুর অষ্টভুজী সমাধিসৌধ এ (সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ) এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। বিবি পরীর সমাধিসৌধের মূল বর্গাকার অংশের মধ্যস্থলে গম্বুজটি স্থাপিত এবং এই বর্গাকার অংশের চারপাশ ঘিরে রয়েছে খিলানছাদ আবৃত কক্ষ। এই সমাধিসৌধটি মূলত পারস্য দেশীয় ঐতিহ্যে অনুপ্রাণিত বিখ্যাত মুগল সমাধিসৌধ, যেমন দিল্লির খান-ই-খানানের সমাধি অথবা আগ্রার তাজমহলের স্থাপত্য চটকের কতকটা অনুকরণ বলে প্রতীয়মান হয়। বর্গাকার

---

[1] 'Bengal Style of Muslim Architecture', *Islam Today*, Journal of the ISESCO, Rabat, 1985, p.232

Dhaka University Institutional Repository

গম্বুজবিশিষ্ট সমাধিসৌধের প্রতিনিধিত্বশীল নিদর্শন হিসেবে প্রায়শ ঢাকায় অবস্থিত দারা বেগমের সমাধিসৌধের (সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ) উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

টিকে থাকা সেক্যুলার ইমারতের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ঢাকা ও এর আশপাশে কয়েকটি দুর্গের অবশেষ, যেমন লালবাগ দুর্গ (১৬৭৮), ইদ্রাকপুর দুর্গ (১৬৬০), সোনাকান্দা দুর্গ (সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ), জিনজিরা দুর্গ (সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ) ইত্যাদি, এবং গৌড়-লখনৌতির ফিরুজপুরে তথাকথিত তাহখানা কমপ্লেক্স (সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ)। এদের মধ্যে লালবাগ দুর্গ নির্মিত হয়েছিলো সুবাহদারদের বসবাসের জন্য একটি প্রাসাদ-দুর্গ হিসেবে, তাহখানা নির্মিত হয় সুফী-দরবেশ নিয়ামতউল্লাহ ওয়ালীর আবাসস্থলরূপে এবং নদীতে নির্বিঘ্ন নৌচলাচলের জন্য নিরাপত্তা ফাঁড়ি হিসেবে নির্মিত হয়েছিলো অপরাপর জলদুর্গগুলি। এসকল দুর্গের সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রায় একই রকম। এগুলিতে ছিলো সুউচ্চ দুর্গ-প্রাকার, ঈওয়ান আকৃতির ফটক, উত্তর ভারতের মুগল দুর্গের অনুকরণে বহিঃপ্রাচীরে বন্দুকে গুলি চালাবার ফোকর ও ঘুলঘুলি (কুলুঙ্গিযুক্ত) জানালা এবং অভ্যন্তরভাগে নির্মিত প্রয়োজনীয় অপরাপর কাঠামো। এসকল দুর্গের অভ্যন্তরভাগের ইমারত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধ্বংস হয়ে গেছে; শুধু লালবাগ কেল্লার অভ্যন্তরে টিকে আছে 'দরবার হল' নামে পরিচিত ছোট আবাসিক প্রাসাদটি, বিবি পরীর সমাধিসৌধ ও জামে মসজিদ। গৌড়-লখনৌতির তাহখানা একটি অনাড়ম্বর সাদাসিদা ধরনের অরক্ষিত এক-কক্ষ ইমারত এবং একজন দরবেশের সরল জীবন যাপনের উপযোগী করে নির্মিত। এটিকে দুর্গ-প্রাসাদ না বলে বরং খানকাহ বললেই মানায় ভাল।[1]

দেশের বিভিন্ন অংশে বেশ কিছুসংখ্যক সেতু এখনও টিকে আছে। এদের মধ্যে ফতুল্লা, বিক্রমপুর ও সোনারগাঁয়ের সেতুগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সবগুলি সেতুই খিলানাকার স্তম্ভের উপর স্থাপিত এবং এগুলি সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি বা শেষভাগে নির্মিত বলে ধরে নেওয়া যায়।

দুর্গের সমতুল্য অপরাপর নির্মাণকাঠামো হলো স্থানীয়ভাবে 'কাটরা' নামে অভিহিত সরাইখানা। মালদহ, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে এদের কিছুসংখ্যক নিদর্শন রয়েছে। এখন এই কাটরাগুলির শুধু ফটকই পরিদৃষ্ট হয়। এগুলি একটি অখণ্ড পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত হয়েছিলো বলে মনে হয়। এর একদিকে একটি ফটক এবং মধ্যখানে উন্মুক্ত অঙ্গনের পাশ ঘিরে নির্মিত হয়েছিলো কক্ষগুলি। সবগুলি

---

[1] *Gaur-Lakhnauti*, Dhaka, 1997, p.33

Dhaka University Institutional Repository

সরাইখানারই অবস্থান নদীর তীরে। এর থেকে বোঝা যায় যে, মুগল আমলে নদীপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল।[1]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলায় মুগল আমলে নির্মিত সৌধগুলি ছিলো উত্তর ভারতের মুগল ইমারতের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ। কিন্তু ব্যবহৃত নির্মাণ উপকরণ ও অলঙ্করণ-শৈলীর দিক থেকে এগুলি ছিলো স্বতন্ত্র। সুলতানি আমলের সৌধের ন্যায় বাংলায় মুগল সৌধেও মূল উপকরণ হিসেবে ইটের ব্যবহার অব্যাহত ছিল। কিন্তু মুগল আমলের বাংলার ইমারতসমূহের সম্মুখভাগে সুলতানি আমলের পোড়ামাটির অলঙ্করণ এবং রাজকীয় মুগলরীতির মর্মর বসানো নকশা ও মূল্যবান প্রস্তরের কারুকার্যখচিত শ্বেতমর্মর ব্যবহার করা হয় নি। তৎপরিবর্তে এ আমলের দেয়ালগুলি আস্তর করা এবং ছোট কুলুঙ্গিতে আস্তরের প্যানেল ব্যতিরেকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাদামাটাভাবে তা করা হয়েছে। মধ্যবর্তী প্রবেশপথ এ সময় নিরবচ্ছিন্নভাবেই ছিলো পার্শ্ববর্তী প্রবেশপথ থেকে বৃহদাকার এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এগুলি সামনের দিকে কিছুটা প্রলম্বিত হয়ে একটি অর্ধগম্বুজাকৃতি ঈওয়ানের আকৃতি দিয়েছে। সুলতানি আমলের গম্বুজ থেকে আলাদা এ আমলের রুক্ষ ও কন্দাকৃতি গম্বুজগুলি কর্বেল-পেন্ডেন্টিভের পরিবর্তে গোলাকার পেন্ডেন্টিভের উপর বসানো ছিল। প্রবেশপথের সংখ্যা ছাদে গম্বুজের সংখ্যা ও অভ্যন্তরভাগে মিহরাবের সংখ্যার অনুরূপ। ছাদের বাঁকানো কার্নিসের প্রচলন তখন উঠে গেছে এবং এর পরিবর্তে কার্নিস সজ্জার জন্য প্রবর্তিত হয়েছে মেরলোন শোভিত প্যারাপেট। গম্বুজের গোড়ার চতুর্দিকে এই একই ধরনের মেরলোন নকশা পরিলক্ষিত হয় এবং এর চারপাশে বসানো থাকে রেলিং দ্বারা যুক্ত ছোট ছোট চূড়াসদৃশ ফিনিয়াল। এসময় দ্বিকেন্দ্রিক খিলানের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় চতুষ্কেন্দ্রিক খিলান এবং পূর্ববর্তী আমলের স্থূল প্রস্তরস্তম্ভের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় ইটনির্মিত স্তম্ভ। কোণের সরু বুরুজগুলি মাঝেমধ্যে অলংকৃত পাত্রসদৃশ ভিতের উপর স্থাপিত এবং এই বুরুজের শীর্ষভাগ ছাদের সীমা ছাড়িয়ে উর্ধ্বে সম্প্রসারিত। এই বুরুজগুলির শীর্ষভাগে প্রধান গম্বুজের আকৃতির অনুরূপ এবং ফিনিয়াল শোভিত ক্ষুদ্র গম্বুজ বসানো। কখনও কখনও সম্মুখভাগের ঈওয়ানের অর্ধ-গম্বুজের খিলানগর্ভ ও প্রধান মিহরাব আস্তর করা মুকার্নাস নকশা দ্বারা অলঙ্কৃত।[2]

সুলতানি আমলের টিকে থাকা সৌধের চেয়ে মুগল আমলের বিদ্যমান সৌধের সংখ্যা অনেক বেশি। নির্মাণকালের নৈকট্য, নির্মাণ সামগ্রীর স্বল্পমূল্য এবং নির্মাণের সহজ কলাকৌশলই এর কারণ। নির্মাণের সরল পদ্ধতি ও ব্যয়স্বল্পতার কারণে এই নির্মাণরীতি সারা বাংলায় ব্যাপক প্রসারলাভ করে

[1] *Gaur-Lakhnauti*, Dhaka, 1997, p.34

[2] *Sonargaon - Panam*, Dhaka, 1997, p.23

এবং রাজধানী থেকে দূরে কর্মরত মুগল কর্মকর্তারাই শুধু নন, জনকল্যাণে অবদান রাখতে আগ্রহী জমিদাররাও এই নির্মাণরীতি অনুসরণে এগিয়ে আসেন। গ্রামাঞ্চলের মসজিদের অধিকাংশই বর্গাকৃতি ও এক গম্বুজবিশিষ্ট এবং এই ঐতিহ্য অদ্যাবধি অনুসৃত হয়ে আসছে।[1]

মুগল আমলে মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে পুরানো নির্মাণরীতিকে সম্পূর্ণ পরিহার করা হয় নি, এ ক্ষেত্রে সমন্বয় ঘটেছে সুলতানি ও মুগল স্থাপত্যরীতির। এ আমলে নির্মিত মন্দিরগুলিকে এই অব্যাহত স্থাপত্যরীতির নিদর্শন বলে বিবেচনা করা যায়।

সুলতানি ও মুগল নির্মাণশৈলীর ফসল মধ্যযুগীয় বাংলার স্থাপত্যকে ব্যাপক পরিসরে ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও গুণগত মান ও বৈশিষ্ট্যে এই স্থাপত্য উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের স্থাপত্য থেকে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে। এই স্বাতন্ত্র্য বাংলার স্থাপত্যকে দিয়েছে এক নতুন ও কাঙ্ক্ষিত অবস্থান, আর এতে রূপলাভ করেছে একটি স্বতন্ত্র জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন শিল্পকলা।[2]

আধুনিক বাংলাদেশে মসজিদ একটি জাতীয় ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। এ দেশে এমন একটি গ্রামের কথা বলা যাবে না যেখানে মসজিদ নেই। ইউনিয়ন পর্যায়ে সুন্দর নকশার আধুনিক স্থাপত্যের মনোরম মসজিদ লক্ষ্য করা যায়। মসজিদকে অধিকতর সুরম্য, সুন্দর, টেকসই, পরিচ্ছন্ন এবং আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রচেষ্টা মসজিদসমূহকে জাতীয় গৌরব ও গর্বের স্থাপনায় পরিণত করেছে। বিশেষত দেশের প্রধান নগরী ঢাকা ইস্তাম্বুলের পরে দ্বিতীয় মসজিদের নগরীতে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশের চিরায়ত সামাজিক সমস্যাসমূহের অন্যতম নারী নির্যাতন প্রতিরোধে দেশের সর্বত্র বিদ্যমান সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং সম্মানিত এই প্রতিষ্ঠানটিকে কাজে লাগানো গেলে নিঃসন্দেহে নারী নির্যাতনের অসহনীয় জীবন থেকে মুক্তি পাবে।

---

[1] PERWEEN HASAN, *Sultanate Mosque Types in Bangladesh: Origins and Development*, Harvard University PhD Thesis, 1984, p.321

[2] M HAFIZULLAH KHAN, *Terracotta Ornamentation in the Muslim Architecture Of Bengal*, Dhaka, 1988, p.243

Dhaka University Institutional Repository

সমাজজীবনে মসজিদের ভূমিকা

ইসলামী জীবনদর্শন ও মুসলিম সমাজে মসজিদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয়-সামাজিক প্রতিষ্ঠান। ইসলামের বিভিন্ন অনুশাসন যথাযথভাবে জামাআতে সালাত আদায়ের জন্য মসজিদের বিকল্প নেই। কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা মসজিদে সম্মিলিতভাবে অর্থাৎ জামাআতে সালাত আদায়ের বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন,

وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ

"আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।[১] অনিবার্য কারণ ছাড়া মসজিদ ব্যতীত সালাত আদায় করা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ (স) জামায়াতে সালাত আদায়ের ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন। বলেছেন, "জামাআতে সালাত আদায় করলে একাকী পড়ার চেয়ে সাতাশ গুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যায়।[২]

মসজিদে কুরআন তিলাওয়াত, তাসবিহ তাহলিল ও ইসলামী জীবনদর্শন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা যায়। ইবাদতের নিয়মকানুন শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রেও মসজিদকে ব্যবহার করা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فِى بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ لا يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِ وَالأَصَالِ -

"যে সকল ঘর আল্লাহ মর্যাদায় উন্নীত করার এবং যেগুলোতে তাঁর নাম যিকর করার আদেশ দিয়েছেন সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।"[৩]

মসজিদ মুসলিম সমাজের কেন্দ্র ও ভিত্তি। মসজিদকে কেন্দ্র করেই মুসলিম সমাজ গড়ে ওঠে ও বিকশিত হয়। হাদীস থেকে জানা যায়, পৃথিবীর পত্তন এবং আদম (আ)-এর পৃথিবীর জীবনের সূচনাতেও ছিলো মসজিদ। মসজিদ ছাড়া মুসলিম সমাজের অস্তিত্ব, অবস্থিতি, বিস্তৃতি, বিকাশ ও টিকে থাকা অসম্ভব। পরিবারের পর মসজিদই মুসলিমদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয়-সামাজিক প্রতিষ্ঠান। ইবাদত, তালিম, দাওয়াত, প্রচার তথা আল্লাহর হক আদায় এবং বান্দার হক নির্ধারণে

---

[1] আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত: ৪৩

[2] মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খতীব, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৬

[3] আল-কুরআন, সূরা নূর, আয়াত: ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদ মুসলিম সমাজের প্রধান কেন্দ্র। এখান থেকে তাদের সামষ্টিক কর্মসূচি ঘোষিত হয়। তাদের কর্মপদ্ধতি ঠিক করার ক্ষেত্রেও এর ভূমিকাই মুখ্য। তাই মসজিদ মসুলিম সমাজের মূলভিত্তি এবং সকল কর্মতৎপরতার কেন্দ্র।

মসজিদ হিদায়াত লাভের প্রধান মাধ্যম। মসজিদে কুরআন মাজিদ শিক্ষা দেওয়া হয়। সুন্নাহর দারস দেওয়া হয়। ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত ও নির্ভুল জ্ঞানলাভ করা যায় মসজিদ থেকে। সে কারণে মসজিদ হলো মানুষের সঠিক পথের দিশা। এখান থেকে মানুষ হিদায়াতের পথ লাভ করতে পারে।[১]

মসজিদ মুসলিম সমাজের মন্ত্রণালয়। মহানবী (স)-এর সময় মসজিদ ছিলো সকল কর্মতৎপরতার কেন্দ্র। মদিনা কেন্দ্রিক ইসলামী রাষ্ট্রের সকল কর্মপরিকল্পনা মসজিদে বসেই নির্ধারণ করা হত। খুলাফায়ে রাশিদিনের সময়কালেও এ ধারা অব্যাহত থাকে। তাঁরা রাষ্ট্র শাসনের সকল পর্যায়ে মসজিদে সমবেত মুসল্লিদের কাছ থেকেই পরামর্শ গ্রহণ করতেন।[২] মসজিদে দায়িত্বশীল মুসলিমদের সমাবেশ ঘটে। তারা নিজেদের সমস্যা নিয়ে কথা বলতে পারেন এবং পারস্পরিক পরামর্শ আদান-প্রদান করতে পারেন। এভাবে সমাজে মসজিদ পরামর্শ পরিষদ বা মন্ত্রণাগৃহের ভূমিকা পালন করে।

মসজিদ মুসলিমদের মূল মিলনকেন্দ্র। মুসলিমদের পবিত্র মিলনকেন্দ্র হলো মসজিদ। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের জন্য পাঁচবার তারা এখানে উপস্থিত হয়। প্রতি শুক্রবার জামে মসজিদে জুমআর সালাত অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি ওয়াক্তের সালাতের চেয়ে জুমআর সালাতে বেশি মুসলিমের সমাবেশ ঘটে। হজ মওসুমে বিশ্বের সকল এলাকার মুসলিম মক্কা ও মদিনায় সমবেত হয়। একজন অপরজনকে পরম মমতায় বুকে টেনে নেয়। ফলে সামাজিক মিলনকেন্দ্র হিসেবে মসজিদ অবিসংবাদিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৩]

মসজিদ মানুষকে পবিত্রতার প্রেরণায় উজ্জীবিত করে। মসজিদ মুসলিমদের শরীর ও মন পবিত্র রাখার প্রেরণা দেয়। মসজিদে ইবাদত সম্পাদন করা হয় বলে মসজিদকে নোংরা ও অপবিত্র রাখা যায় না।

---

[১] মওলানা ইসমাঈল ফরিদী, *মসজিদ ও মুসলিম সমাজ*, ঢাকা ২০০২, পৃ.২৬

[২] মুহাম্মদ আবদুর রশিদ, *মসজিদের মূল্যবোধ ও দর্শন*, ঢাকা ১৯৯৮, পৃ.৭৭

[৩] মওলানা ইসমাঈল ফরিদী, পূর্বোক্ত, পৃ.৯৮

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদেও অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় প্রবেশ করা যায় না।[১] পবিত্র পোশাকে পরিচ্ছন্ন শরীরে এখানে প্রবেশ করতে হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"হে মানুষ, প্রতিটি সালাতের সময় তোমরা সুন্দর ও পবিত্র পোশাক পরিধান করবে, খাবে এবং পান করবে, তবে অপচয় করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালবাসেন না।"[২]

মসজিদ যে পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার প্রতি বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করে আল্লাহ তাআলাও তার স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন–

لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

"(হে রাসূল স) আপনি সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে তাদের নির্মিত ঐ মসজিদে কখনই দাঁড়াবেন না। বরং প্রথম থেকেই যে মসজিদের ভিত্তি তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত সে মসজিদই আপনার সালাত আদায়ের জন্য অধিকতর যোগ্য। সে মসজিদে এমন লোক আছে যারা পবিত্রতা অর্জন করতে ভালবাসে। আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন।"[৩]

মসজিদ সুমহান সাম্যের এক অনন্য প্রেরণা। মানুষের মধ্যে অন্যায় ভেদাভেদ ও অহেতুক শ্রেণীভেদ নির্মূলে মসজিদ কার্যকর ভূমিকা পালন করে। কেননা মসজিদে সকল মানুষের ইবাদতের অধিকার সমান।[৪] মসজিদে সকল শ্রেণীর মানুষকে একই কাতারে দাঁড়িয়ে আল্লাহর নিকট নিজেকে নিবেদন করতে হয়। এক্ষেত্রে রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন কোন ভেদাভেদ করা হয় না। মসজিদের এ পরিবেশ এবং শিক্ষা মানুষের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। সমাজজীবনে সে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ না করার রীতিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

মসজিদ ঐক্য ও সংহতির এক অন্তহীন প্রেরণা। মসজিদ মুসলিম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার প্রেরণা দেয়। মসজিদে তারা একসাথে সালাত আদায় করে। তারা

---

[১] মুহাম্মদ আবদুর রশিদ, পূর্বোক্ত, পৃ.৭৯

[২] আল–কুরআন, *সূরা আরাফ*, আয়াত: ৩১

[৩] আল–কুরআন, *সূরা তওবা*, আয়াত: ১০৮

[৪] অধ্যাপক লুৎফর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ.৩২

Dhaka University Institutional Repository

একই তাকবিরে তাহরিমায় হাত বাঁধে, একসাথে রুকু-সিজদা করে। তাদের মধ্যে মানসিক মিল সৃষ্টি হয়। তারা সামাজিক অন্য যে কোন ইস্যুতে এমনিভাবে একত্রে থাকার ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় করতে পারে।

মসজিদ সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির অনবদ্য প্রতিষ্ঠান। মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। তাদের মধ্যে ঈমানি ভ্রাতৃত্ব বিদ্যমান। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা ভাইদের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর এবং আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হতে পার।"[১]

মসজিদ মুমিনদের মধ্যে বিরাজমান এ ভ্রাতৃত্বকে অধিকতর সুদৃঢ় এবং সংহত করে। মসজিদের পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও ভাবগম্ভীর পরিবেশের ইবাদত এবং প্রতিদিন পাঁচবার দেখা সাক্ষাৎ তাদের ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিকে মজবুত করে।

মসজিদ সময়ানুবর্তিতার প্রশিক্ষণ প্রদান করে। মুসজিদ মুমিনদের মধ্যে সময়ের কাজ সময়ে করার এবং সময়ের অপচয় রোধের চেতনা সৃষ্টি করে। মসজিদে মানুষ সালাত আদায় করে। সালাত আদায়ের সময় সুনির্দিষ্ট। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

"এরপর যখন তোমরা সালাত শেষ করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে। আর যখন তোমরা কাফিরদের আক্রমণের আশংকা থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে, তখন যথাযথভাবে সালাত আদায় করবে। নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা মুমিনদের জন্য ফরয করা হয়েছে।"[২]

পূর্ব নির্ধারিত সময়ে প্রতিদিন পাঁচবার মসজিদে উপস্থিত হয়ে সালাত আদায়ে মাধ্যমে মুমিন ব্যক্তি সময়ানুবর্তিতার এক সুমহান প্রশিক্ষণ লাভ করে। ব্যক্তিগত জীবনেও সে সময় মেনে চলার অভ্যাস

---

[১] আল-কুরআন, *সূরা হুজুরাত*, আয়াত: ১০

[২] আল-কুরআন, *সূরা নিসা*, আয়াত: ১০৩

Dhaka University Institutional Repository

গড়ে তোলে। মসজিদ শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনের কার্যকর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।[১] ইসলাম তার অনুসারীদের সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে তোলার জন্য বিভিন্ন বিধান পেশ করেছে। মসজিদে মুসলিমরা এ শৃঙ্খলার বাস্তব প্রশিক্ষণ লাভ করে। মসজিদের প্রবেশ করা, বসা, দাঁড়ানো, চলাফেরা করা, সালাত আদায়- সকল ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করা হয়। প্রতিদিন পাঁচবার নির্ধারিত শৃঙ্খলায় সালাত আদায় ও মসজিদে গমন মুসলিমদের সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের অভ্যাস গড়ে দেয়। মসজিদ আনুগত্যের অনন্য সাধারণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ইসলামে আল্লাহ তাআলা, রাসূলুল্লাহ (স) ও ইসলামী নেতৃত্বের আনুগত্য করা ফরয। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা (আল্লাহর বিধান অনুসারে) আদেশ দেয়ার ক্ষমতা রাখেন তাদের আনুগত্য কর। এরপর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ তৈরি হয় তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের নিকট অর্পণ কর – যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি, রাসূল ও আখিরাতের প্রতি ঈমান এনে থাক। এটাই উত্তম এবং এর পরিণামই সুন্দরতম।"[২]

মসজিদে মুসলিমরা প্রতিদিন পাঁচবার এ ফরয আনুগত্যের প্রশিক্ষণ পায়। তারা বিনা প্রশ্নে ইমামের সাথে রুকু করে, সিজদা করে আর শেষ বৈঠক করে সালাত শেষ করে। এভাবে আনুগত্যের দীক্ষা নিয়ে সমাজের বৃহত্তর অঙ্গনে মুসলিমরা তাদের যোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

মানুষের মধ্যে সহানুভূতি ও মমত্ববোধ সৃষ্টিতে মসজিদ অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। মসজিদের পবিত্র পরিবেশে মুসলিমরা প্রতিদিন সমবেত হন। মানসিক দিক দিয়ে তাদেরকে এক অবিচ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে। ফলে তারা পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি ও মমত্ববোধের মহান সম্পর্কে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। কোন কারণে কেউ সালাতে অনুপস্থিত থাকলে তার খোঁজখবর নেয়। বিপদে পড়লে সম্মিলিতভাবে তা মোকাবেলার চেষ্টা করে।[৩]

---

[১] অধ্যাপক লুৎফর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৫

[২] আল–কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত: ৫৯

[৩] এ জেড এম শামসুল আলম, *ইসলামী প্রবন্ধমালা*, ঢাকা ২০০৪, পৃ.২৫৪

Dhaka University Institutional Repository

সমন্বিত জীবনযাত্রা, সামষ্টিক স্বার্থ প্রত্যক্ষণ এবং সামাজিক মানসিকতা সৃষ্টিতে মসজিদ অত্যন্ত তাৎপর্যবহ ভূমিকা পালন করে। মসজিদের সামষ্টিক ইবাদত ব্যক্তির মধ্যে সামষ্টিক ও সামাজিক চেতনা সৃষ্টি করে। প্রতিটি কাজে সে নিজের চেয়ে সমষ্টিকে প্রাধান্য দিতে শেখে। তার মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থের পরিবর্তে সামষ্টিক স্বার্থ ও কল্যাণ রক্ষার মানসিকতা তৈরি হয়।

মসজিদ আল্লাহর রহমত লাভের এক নির্ভরতাপূর্ণ আশ্রয়। মসজিদ তার সংশ্লিষ্ট লোকদের জন্য আল্লাহর রহমত নিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "সমাজের কিছু লোক যখন আল্লাহর ঘরসমূহের কোন একটি ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং তা নিয়ে পরস্পর আলোচনা করে তখন তাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল হয়। আল্লাহর রহমত তাদের পরিবেষ্টন করে আর ফেরশতাগণ তাদের ঘিরে রাখে। এমনকি আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের মধ্যে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেন।[১] বস্তুত পরকালীন সাফল্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও মসজিদ ভূমিকা রাখে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মসজিদ নির্মাণ করে, জান্নাতের মধ্যে তার জন্য আল্লাহ একটি ঘর নির্মাণ করবেন।[২]

ইসলামী সমাজব্যবস্থা মূলত মসজিদ কেন্দ্রিক এক আদর্শ সমাজব্যবস্থা। এ সমাজের সকল সামাজিক কর্মতৎপরতা, সামষ্টিক মিলন-উৎসব, বিচার-ফায়সালা, বিবাদ মীমাংসায় মসজিদ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। মসজিদ কেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় মসজিদই সকল সামাজিক ও ধর্মীয় কাজের নেপথ্য প্রেরণা। মসজিদকে কেন্দ্র করে আবর্তিত বা মসজিদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সমাজে ইসলামী সমাজব্যবস্থার সকল বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন থাকে। এ সমাজ তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত, ইনসাফ, ইহসান, ইবাদত ও আখলাকে হামিদাভিত্তিক হয়। মসজিদ কেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, ইনসাফ, ইহসান, ইবাদত ও আখলাকে হামিদাভিত্তিক হয়। মসজিদ কেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, সর্বময় ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার দ্বিধাহীন স্বীকৃতি থাকে। এ বিশ্বাসের ওপরই মসজিদ কেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার ভিত্তি। এ সমাজে পার্থিব জীবনকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। পারস্পরিক সহযোগিতায় এ ব্যবস্থায় মৌলিক মানবিক অধিকারসমূহ পূরণের নিশ্চয়তা থাকে। মানুষের ধর্মপালন ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকে। কারো স্বাধীন ধর্মপালন ও মত প্রকাশের

---

[১] মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খতীব, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, পূর্বোক্ত, পৃ.৭০

[২] মুহাম্মদ বিন ইসমা'ঈল, *আস-সহীহ*, পূর্বোক্ত, পৃ.২৯

Dhaka University Institutional Repository

অধিকার অপরের অধিকারকে আহত বা ক্ষুণ্ন করে না। মসজিদ কেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা হয় ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনায় উজ্জীবিত।[১]

এতে মানুষের জীবন, সম্ভ্রম ও সম্পদের পরিপূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করা হয়। যে জন্য এ সমাজব্যবস্থা হয় অপরাধমুক্ত। ইসলামী সমাজব্যবস্থার সকল বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে মসজিদ কেন্দ্রিক সমাজ গঠন করে। এ সমাজে মসজিদ পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজে ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারে এ পাঠাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মসজিদের নিয়মিত মুসল্লিদের নিয়ে কিংবা মসজিদের আওতাভুক্ত এলাকার লোকদের নিয়ে মসজিদ কল্যাণ তহবিল গড়ে তোলা হয়। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে এ তহবিলে অর্থ জমা করে সামাজিক অভাব মোচন ও বিপদ মোকাবেলায় কার্যকর ভূমিকা রাখা যায়। মসজিদ কমিটির তত্ত্বাবধানে মুসাফিরখানা প্রতিষ্ঠা করে দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্ত এবং নিঃস্ব পথচারীর দুর্দশা লাঘব করা হয়। মসজিদ কেন্দ্রিক সমাজে মসজিদেই দাতব্য চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকে। সুস্থ ও অমলীন সাংস্কৃতিক চর্চার কেন্দ্র হিসেবে মসজিদই মূল ভূমিকা পালন করে। এ সমাজব্যবস্থায় সকলের সাপ্তাহিক কর্মতৎপরতার পর্যালোচনা হয় জুমআর দিন। সমাজের কাজের নির্দেশনা দেওয়া হয় জুমআর খুতবার মাধ্যমে। এভাবে মসজিদ কেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা তার ইসলামী বৈশিষ্ট্য ও ধারা অক্ষুণ্ন রাখে।

ব্যক্তিগত, সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে তাই ব্যক্তির নিরক্ষরতামুক্ত হওয়া কর্তব্য। নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে সমাজকে মুক্ত রাখার জন্য ইসলাম বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিশেষভাবে ব্যবহার করতে বলেছে মসজিদের বিশাল অবকাঠামো। বস্তুত ইমাম সাহেব যদি উদ্যোগী হয়ে মসজিদকে নিরক্ষরতা দূর করার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করেন তাহলে সমাজ বাস্তবিকই নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারে।[২]

মসজিদ শিক্ষা বিস্তারে অনবদ্য ভূমিকা পালন করে মক্তব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক স্তর হলো মক্তব। এ স্তরে শিশুকে অক্ষর জ্ঞানদান, শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা, অনুশীলন ও পাঠাভ্যাস গঠন, কুরআন মাজীদ শিক্ষা, ধর্মের ব্যবহারিক শিক্ষা, আদব-কায়দা ও পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দেওয়া হয়। সাধারণত ফজর সালাতের পর মসজিদের পবিত্র পরিচ্ছন্ন ও আন্তরিক পরিবেশে মক্তব প্রতিষ্ঠা করা যায়।

---

[১] হাসান আহমদ সুদাসী, *আল–মাসাজিদুল জামিয়া*, বৈরুত, ১৪১২, পৃ.৩৪২

[২] ড. মাহমুদুল হাসান, *মসজিদের ইতিবৃত্ত*, নোবেল প্রকাশন, ঢাকা ১৯৯২, পৃ.২৩

Dhaka University Institutional Repository

এতে যেমন স্বতন্ত্র মক্তব ঘর তৈরি করতে হয় না, তেমনি প্রয়োজন হয় না আলাদা শিক্ষকের। মসজিদের ইমাম সাহেব এবং মুয়াজ্জিনই মক্তবে শিক্ষাদানের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারেন।

মসজিদে মক্তব প্রতিষ্ঠার ফলে সব ধরনের শিশুর পক্ষে যেমন শিক্ষাগ্রহণ সহজ হয় তেমনি সাক্ষরতার পাশাপাশি শিশুরা চরিত্রবান ইমাম-মুয়াজ্জিনের সংস্পর্শে চরিত্রবান হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে পবিত্র থাকার, ইবাদত করার এবং দীনি মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষার অদম্য আগ্রহ জন্ম লাভ করে।[১]

মসজিদে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র বা গণবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যায়। মসজিদের বিপুল, ভাবগম্ভীর-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র বা গণবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সমাজকে নিরক্ষরতার অভিশাপ মুক্ত করা যায়। এ শিক্ষাকেন্দ্রে প্রথম বয়সে শিক্ষার অধিকার ও সুযোগ বঞ্চিত কিংবা অবহেলায় শিক্ষা না নেওয়া সকল বয়সের মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ইমাম সাহেবও মুয়াজ্জিনের সাথে এ শিক্ষাকেন্দ্রে উৎসাহী শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে স্বেচ্ছাশ্রম দিতে পারেন। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এ জাতীয় বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও গণবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া যায় কিংবা একাধিক ইমাম-মুয়াজ্জিন নিয়োগ করে তাদেরকেই প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। এ পদ্ধতিতে মসজিদ নিরক্ষর বয়স্ক লোকদের কেবল সাক্ষর করাই নয় বরং শিক্ষিতও করে তুলতে পারে।[২]

মসজিদে গড়ে তোলা যায় নৈশবিদ্যালয়। সমাজে এমন অনেক শ্রমজীবী-কর্মজীবী-ব্যবসায়ী বা অন্য পেশার মানুষ আছেন যাদের পক্ষে ইতোপূর্বে শিক্ষাগ্রহণ সম্ভব হয়নি এবং বর্তমানেও দিনের বেলায় কর্মব্যস্ততার জন্যে শিক্ষাগ্রহণ অসম্ভব। এসব লোকদের জন্যে মাগরিব বা ইশার সালাতের পরে মসজিদের বিশাল অঙ্গনে নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যায়।[৩]

মসজিদ সাক্ষরতার জন্যে উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারে। মসজিদ আপামর জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষাগ্রহণ এবং সাক্ষর হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারে। ইমাম সাহেব মসজিদে সমবেত লোকদেরকে প্রতি ওয়াক্ত সালাতের পরে এবং বিশেষ করে জুমআর খুতবায় অক্ষর জ্ঞানলাভ ও শিক্ষালাভের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করতে পারেন। পাশাপাশি অশিক্ষিত নিরক্ষর লোকদের সাক্ষর করে তোলা যে শিক্ষিতদেরই দায়িত্ব সে বিষয়েও সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারেন।

---

[১] ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, ইসলামের সামাজিক ব্যবস্থা ও পরিবার কল্যাণ, ঢাকা ২০১১, পৃ.৬৫

[২] এ এন এম সিরাজুল ইসলাম, ইসলামে মসজিদের ভূমিকা, পূর্বোক্ত, পৃ.৬৫

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ.৭০

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদ নিরক্ষরতা সম্পর্কে ঘৃণা সৃষ্টি করায় ভূমিকা রাখে। অক্ষরজ্ঞানহীনতা যে একটি চরম লজ্জাজনক কাজ, অপমানজনক ব্যাপার সে সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে ইমাম সাহেব ঘৃণা সৃষ্টি করবেন। তিনি সালাতের বিভিন্ন খুতবায় এ সম্পর্কে বলবেন। সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সময়ও এ কাজ অব্যাহত রাখবেন।

শিক্ষার ধর্মীয় ও পার্থিব গুরুত্ব অবহিত করার ক্ষেত্রে মসজিদ অনবদ্য ভূমিকা রাখতে পারে। ইসলামে জ্ঞান অর্জন করা ফরয– এ বিষয়টি মানুষকে জানানো এবং জ্ঞান অর্জন করলে দুনিয়া ও আখিরাতে যে অসীম কল্যাণ লাভ সম্ভব তা অবহিত করে ইমাম সাহেব নিরক্ষরতা দূর করতে পারেন। তার অবিরাম জানানোর ফলে লোকেরা নিরক্ষরতা দূর করতে সচেষ্ট হবে।

মসজিদ স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষক তৈরি ও শিক্ষাদানে উৎসাহ প্রদান করতে পারে। নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে সমাজ মুক্ত করার আন্দোলনে ইমাম সাহেব সকল পর্যায়ের শিক্ষিত লোক এমনকি ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারেন। এ জন্য তিনি সকল পর্যায়ের শিক্ষিত লোকদের মধ্য থেকে স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষক তৈরি করবেন। যারা নিজ নিজ অধিকারের ন্যূনতম পাঁচজন বা ততোধিক নিরক্ষরকে সাক্ষরতা দান করবেন। তাহলেই সমাজ এ অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে।

নারী শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করে থাকে মসজিদ। ইমাম সাহেব নারী শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দেবেন। কেননা নারীরা নিরক্ষর থাকলে শিক্ষা ফলপ্রসূ এবং স্থায়ী হয় না বরং নারীরা নিরক্ষরতা মুক্ত হলে কোনো পরিবারেই আর নিরক্ষর সন্তান থাকবে না। কাজেই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তিনি নারীদের নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করবেন।[১]

রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদকে শিক্ষার আদর্শ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। শিক্ষাবিস্তারে মসজিদের ভূমিকা সবচেয়ে বড় প্রমাণ মহানবী (স)-এর নিজের কর্মতৎপরতা। তিনি দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্যে মসজিদে নববীকে সাধারণ শিক্ষালয় ও আবাসিক গণশিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার শুরু করেন। আহলে সুফ্ফা নামক একদল নিবেদিতপ্রাণ জ্ঞানসাধক সব সময় মসজিদেই অবস্থান করতো। এ ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের এই মসজিদে কিছু ভালো জিনিস শিখতে বা শিক্ষা দিতে আসে সে যেন আল্লাহর পথের মুজাহিদ।"[২]

---

[1] ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, ইসলামে সামাজিক ব্যবস্থা ও পরিবার কল্যাণ, পূর্বোক্ত, পৃ.৭২

[2] মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল–খতীব, মিশকাতুল মাসাবীহ, পূর্বোক্ত, পৃ.৯৮

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করে গণশিক্ষা কার্যক্রম যেমন বেগবান করা যায় তেমনি অশিক্ষা-কুসংস্কারের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা যায় সমাজকে। মসজিদে কুরআন-হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য নিয়ে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা যায়। মুসল্লিদের মধ্যে এসব বই পড়ার আগ্রহ জাগিয়ে এবং তাদেরকে পাঠাগার ব্যবহারের সুযোগ দিয়েও নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করা যায়। গণশিক্ষা কার্যক্রম ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে মসজিদ অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করতে পারে। কেবল গণশিক্ষা বা নিরক্ষরতা দূর নয় বরং মসজিদে লাইব্রেরি ও গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করে উচ্চশিক্ষা বিস্তারেও মসজিদকে সফলভাবে ব্যবহার করা যায়।[১]

মসজিদ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সামষ্টিক প্রতিষ্ঠান। আনুষ্ঠানিক ইবাদতের ভিত্তিতে পরিচালিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। এর সংশ্লিষ্টতা সমাজের মানুষের সাথে। এর সম্পর্ক সামাজিক মানবিক তৎপরতার সাথে। ধর্মভীরু মানুষের জীবনধারার সাথে মসজিদ অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাধা। এ সকল কারণে সামাজিক সমস্যা সমাধানে মসজিদ অত্যন্ত তাৎপর্যবহ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজের মূল সমস্যা ঐক্য ও পারস্পরিক ভালবাসার অভাব। সামাজিক অনৈক্য মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। অন্যের অভাব-অভিযোগ, সুখ-দুঃখে কেউ দৃষ্টিপাত করে না। ফলে সে নিজে যখন বিপদগ্রস্ত হয় তার সাহায্যেও কেউ এগিয়ে আসে না। ভালোবাসার অভাব মানুষকে অমানবিক কাজে উদ্বুদ্ধ করে। হত্যা, রাহাজানি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, প্রতারণা, আত্মসাৎ কোন কিছুকেই সে খারাপ মনে করে না। ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। নিরাপত্তাহীনতা মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে। অশান্তির বিষবাস্পে তার সাজানো জীবন ধ্বংস হয়ে যেতে থাকে। সুস্থ-সুন্দর ও মানবিক জীবনযাপন অসম্ভব হয়ে পড়ে। মসজিদ এ সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের জন্য মানুষ মসজিদে সমবেত হয়। তারা এক রকম মানসিকতা নিয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সামনে দাঁড়ায়। হিংসা, ক্রোধ, ঘৃণা আর শত্রুতার পরিবর্তে তাদের মধ্যে থাকে মমতা আর সুগভীর ভালোবাসা। সাদা-কালো, ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা নির্বিশেষে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রুকু-সিজদায় অবনত হয় মহান আল্লাহ তাআলার নিকট। একজন ইমামের নেতৃত্বে শৃঙ্খলা ও আনুগত্যের সুমহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তারা সালাত আদায় করে। তাদের মধ্যে ঐক্য, সংহতি ও আনুগত্যের ভিত্তি গড়ে ওঠে। প্রতিদিনের আন্তরিক ও পবিত্র পরিবেশের দেখা-সাক্ষাত, খোঁজ-খবর নেওয়া তাদের মধ্যে প্রগাঢ় ভালোবাসা সৃষ্টি করে। কেউ অসুস্থ হলে বা বিপদে পড়লে অন্যরা ঈমানি

---

[১] ড. ইফতেখার আহমেদ, *মসজিদ ও আমাদের সমাজব্যবস্থা*, আইআরসি, ঢাকা ২০০০, পৃ.২৩১

Dhaka University Institutional Repository

ভালোবাসার অনিবার্য দাবিতে তার সাহায্যে এগিয়ে যায়। কেউ সুখী হলে সবাই মিলে সে সুখের আনন্দ ভাগ করে নেয়। ফলে সমাজ শান্তি ও ভালোবাসায় ভরপুর এক আদর্শ সমাজে পরিণত হয়।[১]

নিরক্ষরতা এক ভয়ানক সামাজিক সমস্যা। সমাজের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য এ সমস্যা থেকে সমাজকে মুক্ত করা জরুরি। মসজিদ নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে সমাজকে মুক্ত করতে পারে। মক্তব প্রতিষ্ঠা করে, মসজিদে বয়স্ক ও গণশিক্ষার ব্যবস্থা রেখে এবং সকলের জন্য উন্মুক্ত পাঠাগার স্থাপনের মাধ্যমে মসজিদ সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তার নিশ্চিত করতে পারে। বিভিন্ন রকমের সামাজিক অনাচার মানুষের সমাজজীবনকে বিষিয়ে রাখে। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, মদ্যপান, ধূমপান, সুদ, ঘুষ, জুয়া, প্রতারণা প্রভৃতির কারণে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। মসজিদের পবিত্র ব্যবস্থা এ সবের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। মসজিদে অপরাধীদের নৈতিক পরিশোধনের ব্যবস্থা করে সমাজকে ভয়ানক এ সমস্যার হাত থেকে রক্ষা করা যায়।[২]

মসজিদ মুসলিম সমাজের সকল কর্মতৎপরতার কেন্দ্র। ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে এর ভূমিকা ব্যাপক। ইসলামী সমাজব্যবস্থায় সমাজের নেতা মসজিদেরও নেতা হন। তাঁকে 'ইমাম' বলা হয়। ইমামের নেতৃত্বে মুসলিম সমাজ ও মসজিদ পরিচালিত হয়। সেজন্য ইমাম নির্বাচন বা নিয়োগের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এক্ষেত্রে নির্বাচন ভুল হলে মুসলিম সমাজ দারুণ বিপর্যয়ের শিকার হবে। মসজিদ তার কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে পারবে না। তাছাড়া আল্লাহ তাআলা সকল ইমামের আনুগত্য ফরয করেন নি। যেমন তিনি ঘোষণা করেছেন,

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

"আপনি ধৈর্যসহ নিজেকে তাদের সাথে রাখুন যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের আশায় তাঁর ইবাদাত করে। যারা দুনিয়ার জীবনের বিলাসিতা কামনা করে আপনি তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না। আপনি তার অনুসরণ করবেন না, যার হৃদয়কে আমি আমার স্মরণে

[১] প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৫

[২] এ এন এম সিরাজুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ.৭৪

Dhaka University Institutional Repository

অমনোযোগী করে দিয়েছি, যে নিজের ইচ্ছা ও খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে ও যার কাজ সীমা অতিক্রম করে।"[১]

সে কারণে ইমাম নির্বাচন ও নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্য ইমাম নিয়োগ করতে হয়। আল্লাহর এ ঘোষণায় যোগ্য ইমামের তিনটি গুণের কথা বলা হয়েছে। এগুলো হলো আল্লাহর যিকর করা, নিজের খেয়াল খুশি ও প্রবৃত্তির অনুসরণ না করা এবং কখনোই সীমালঙ্ঘন না করা। আল্লাহ তাআলা যে স্বাধীনতা ও অধিকার দিয়েছেন কোনভাবেই তা তাঁর বিরুদ্ধে কাজে না লাগানো। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "তোমরা তোমাদের মধ্যকার উত্তম লোকদের তোমাদের ইমাম বানাও। কেননা তারা তোমাদের ও তোমাদের রবের মধ্যে তোমাদের প্রতিনিধি।[২]

কাজেই মুসলিমগন মসজিদে যোগ্যতাসম্পন্ন লোককে ইমাম বানাবেন। আর ইমামের প্রথম যোগ্যতা হবে তিনি তাকওয়াবান হবেন। কুরআন-হাদীস সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান রাখবেন। ইসলামের বিধানাবলি বিশেষত সালাত আদায়ের নিয়ম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় মাসআলায় পারদর্শী হবেন। তাঁর চরিত্র হবে সুন্দর ও শোভন। তিনি নিয়মিত ও বিশুদ্ধভাবে কুরআন মজিদ তিলাওয়াতকারী হবেন।

ইমাম যিনি হবেন তিনি নেতৃত্বের গুণাবলিসম্পন্ন হবেন। সামাজিক সমস্যা সমাধানে তার দক্ষতা থাকতে হবে। মোট কথা ইমাম শ্রেষ্ঠ মানুষ হবেন। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও যোগ্যতার কারণেই মুমিনগণ তাঁকে ইমাম নির্বাচন করবেন।

মসজিদ ও মুসলিম সমাজের প্রকৃত ভাবমূর্তি এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা এবং ইসলামী বিধানাবলি বাস্তবায়নের জন্য মুসলিমদের যোগ্য ইমাম নির্বাচন করা অবশ্য কর্তব্য।[৩]

যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন ইমাম নির্বাচন ও নিয়োগ করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমিন মুসলিমদের দায়িত্ব যোগ্য ইমামকে যথাযথ সম্মানী দেওয়া। ইসলামী সমাজব্যবস্থায় সমাজের নেতা মসজিদের সালাতের নেতৃত্ব দেন। এ দায়িত্ব তার রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের অন্তর্গত। এজন্য তিনি বায়তুলমাল থেকে আলাদা কোন ভাতা নেন না। রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের জন্যই ভাতা গ্রহণ করেন। বর্তমানে মসজিদের জন্য স্বতন্ত্রভাবে ইমাম নিয়োগ করা হয় বলে- তার জন্য আলাদা ভাতা নির্ধারণ জরুরি।

[১] আল-কুরআন, সূরা কাহাফ, আয়াতঃ ২৮

[২] আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আদ-দারেমী, *সুনানে দারেমী*, দারুল মা'আরিফ, বৈরুত, ১৪১২ হিজরি, পৃ.৭৭

[3] ড. ইফতেখার আহমেদ, *মসজিদ ও আমাদের সমাজব্যবস্থা*, পূর্বোক্ত, পৃ.২৩১

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম সাহেব সমাজের সম্মানিত মানুষ। তাঁর জীবনযাপন সচ্ছল ও স্বাভাবিকভাবে পরিচালনার জন্য তাঁকে সম্মানজনক ভাতা দেওয়া উচিত। ইমাম সাহেবের দক্ষতা ও সামাজিক মর্যাদা বিবেচনায় তার ভাতা নির্ধারিত হবে। তবে লক্ষ রাখতে হবে জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে ইমাম সাহেবকে যেন অন্যকোনো চাকরি করতে না হয়। কেননা তাহলে মসজিদ কেন্দ্রিক সমাজে ইমাম সাহেব তাঁর প্রকৃত ভূমিকা পালন করতে পারবেন না। তাই সমাজে ইমামের যথাযথ ভূমিকা পালন নিশ্চিত করার জন্যই তাঁর প্রয়োজনীয় ও সম্মানজনক ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ইসলামী জীবন দর্শনে ইমাম হলেন নির্বাচিত নেতা।[১] মুসলিম সমাজে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কাজে নেতৃত্ব দেওয়া তাঁর দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ (স) ইমাম ছিলেন। তিনি মুসলিম সমাজের সকল ক্ষেত্রের অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন। খুলাফায়ে রাশিদার সোনালি যুগে হযরত আবুবকর (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলী (রা) একই সাথে রাষ্ট্র, সমাজ ও মসজিদের নেতা ছিলেন। এ সময় স্থানীয় প্রশাসকগণ নিজ নিজ স্থানের ধর্মীয় নেতা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরা নির্বাচিত ছিলেন কিংবা খলিফা কর্তৃক মনোনীত ছিলেন। উল্লিখিত সকলের সাধারণ উপাধি ছিলো ইমাম। তাঁদের কাজের পরিধি ছিলো বিপুল। তাঁদের দায়িত্ব-কর্তব্যেরও সীমা-পরিসীমা ছিলো না। উমাইয়া খিলাফতের গোড়ার দিকে 'ইমাম' নির্বাচন, নিয়োগ ও এ সংক্রান্ত ধারণায় ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়।[২] এ সময়ে কেবল ধর্মীয় নেতৃত্বের জন্য মসজিদভিত্তিক ইমাম নিয়োগের বিধান রাখা হয়। তাদের সকল কর্মতৎপরতা মসজিদের নেতৃত্ব দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। নির্ধারিত সম্মানী-ভাতায় ইমামগণ নিষ্ঠার সাথে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন।

রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নেতৃত্ব থেকে যদিও ইমামগণ নির্বাসিত হয়ে আছেন তা সত্ত্বেও সামাজিক ও সামষ্টিক কাজে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। ধর্মনেতা হিসেবে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের নিকট তারা বিশেষ সম্মানের পাত্র। সর্বসাধারণের ওপর তাদের প্রভাবও কম নয়। তাছাড়া ধর্মীয়-সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মসজিদেরও বিপুল গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। ইমামগণ তাদের ব্যক্তি ইমেজ ও মসুজিদের গ্রহণযোগ্যতা ব্যবহার করে বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করবেন। প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করা ইমামগণের অবশ্য কর্তব্য। গণশিক্ষা বিস্তারের জন্য নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনায় নেতৃত্ব দান, সামাজিক সমস্যা সমাধানে সহায়তা প্রদান

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৬

[২] আন্দালিব রাশদি, *আল-খিলাফাত*, দারুল মাআরিফ, কায়রো, ১৩৯৮ হিজরি, পৃ.২৬৫

Dhaka University Institutional Repository

করা, পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা, আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে দিক নির্দেশনা দেওয়া ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা, সমসাময়িক প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সম্পর্কে মুসল্লিদের অবহিত করা এবং বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা ইমামগণের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহের অন্যতম। মসজিদের আনুষ্ঠানিক ইবাদতে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি এসব ক্ষেত্রেও তারা ইমাম বা নেতার ভূমিকা পালন করবেন।[1]

গণশিক্ষা বিস্তার ও নৈশবিদ্যালয় পরিচালনায় ইমাম সাহেব নেতৃত্ব দেবেন। শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি মসজিদে মক্তব প্রতিষ্ঠা করবেন। তিনি এবং মুয়াযযিন সাহেব শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব পালন করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে যুক্তিসঙ্গত সম্মানী গ্রহণ করবেন। তবে সম্মানীর ব্যাপারটা এমন বাধ্যতামূলক করবেন না যাতে গরিব ও নিঃস্ব শিক্ষার্থীদের শিক্ষা নেওয়া ব্যাহত হয়।

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের পর মসজিদে আনুষ্ঠানিক কোন ইবাদত থাকে না। ইমাম সাহেব নিজে উদ্যোগী হয়ে অবশিষ্ট সময়ে মসজিদের পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও পবিত্র ব্যবস্থাপনা বয়স্ক শিক্ষার কাজে ব্যবহার করতে পারেন। এ শিক্ষা কেন্দ্রে প্রথম বয়সে শিক্ষার অধিকার ও সুযোগ বঞ্চিত কিংবা অবহেলায় শিক্ষা না নেওয়া সকল বয়স ও পর্যায়ের মানুষের শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যবস্থা থাকবে। এ ক্ষেত্রে ধনী-গরিব, অঞ্চল বা বর্ণের কোন পার্থক্য করা হবে না। ইমাম সাহেব নিজে এ শিক্ষালয় পরিচালনা করবেন। তিনি উৎসাহী শিক্ষিত লোকদের এ বিদ্যালয়ে স্বেচ্ছাশ্রমে শিক্ষা দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন। প্রয়োজনে সমাজ নেতা ও রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ নেবেন। তা সম্ভব না হলে ইমাম সাহেব তার বয়স্ক শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে যুক্তিসঙ্গত সম্মানী নিয়ে বয়স্ক বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রদানের ধারা অব্যাহত রাখবেন।[2]

ইমাম সাহেব মসজিদে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনায় নেতৃত্ব দেবেন। দিনে কর্মব্যস্ততার জন্য যেসব মানুষ ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও নিজেকে নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত করতে পারেন না-তারা এ নৈশ বিদ্যালয়ে পড়বে। মাগরীব থেকে ইশার মধ্যবর্তী সময়ে কিংবা ইশার পরে প্রয়োজনীয় কিছু সময়ে নৈশ বিদ্যালয়ের কাজ চালানো হবে। এছাড়াও প্রতি ওয়াক্ত সালাতের আগে ও পরে এবং জুমআর সালাতের খুতবায় ইমাম সাহেব শিক্ষার ওপর ইসলামে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মুসল্লিদের তা বুঝাবেন। ওয়ায-নসীহত ও সামাজিক গণসংযোগের মাধ্যমে সবাইকে শিক্ষান জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন।

---

[1] ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *ইসলামের সামাজিক ব্যবস্থা ও পরিবার কল্যাণ*, পূর্বোক্ত, পৃ.৭৭

[2] খুরশিদ আহমদ, *ইসলামের আহবান*, ঢাকা ১৯৮৭, পৃ.৫৪

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষত কোন মুসলিম যেন কুরআন মজীদের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত না থাকে সে দিকে তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।[১]

জুয়া, সুদ, ঘুষ, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ফিৎনা-ফাসাদ, সন্ত্রাস, হত্যা, ব্যভিচার, অধিকারহরণ, যৌতুক, নারী নির্যাতন প্রভৃতি ভয়ঙ্কর সামাজিক সমস্যা। মানুষের সুস্থ, সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে এ সমস্যাগুলো সর্বাধিক বাধা সৃষ্টি করে। এর ফলে শান্তি নষ্ট হয় এবং মানুষের জীবন, সম্ভ্রম ও সম্পদের নিরাপত্তা থাকে না। নৈতিক স্খলন হয় এবং সময়, শক্তি ও অর্থের বিপুল অপচয় ঘটে। ইমাম সাহেব সালাতের খুতবায় এ সকল সমস্যার কুফল সম্পর্কে আলোচনা করবেন।[২] ইসলামে এগুলোকে যে হারাম করা হয়েছে তা উল্লেখ করে পৃথিবী ও পরকালে এসবের ভয়ংকর পরিণতি সম্পর্কে কুরআন হাদীসের উদ্ধৃতি দেবেন। মর্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় মুসল্লিদেরকে এসব সামাজিক সমস্যা থেকে দূরে থাকার গুরুত্ব বুঝাবেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনযাপন পদ্ধতি ও চরিত্র দিয়ে সমাজের সকলের ওপর ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করবেন। মুসল্লীদের নিয়ে বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাস বিরোধী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করবেন। যৌতুক ও মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে তীব্র গণসচেতনতা সৃষ্টিতে ইমামগণ প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করবেন। তারা কুসংস্কার ও অধর্ম থেকে লোকদের মুক্ত করবেন। সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য ইমাম সাহেব মসজিদে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে নিয়মিত চিকিৎসা সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন।

ইসলামে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র থাকার বিষয়টিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা পবিত্রতম সত্তা। তিনি পবিত্র পরিচ্ছন্ন মানুষ ভালবাসেন। ইরশাদ হয়েছে,

لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

"(হে রাসূল স) আপনি সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে তাদের নির্মিত ঐ মসজিদে কখনই দাঁড়াবেন না। বরং প্রথম থেকেই যে মসজিদের ভিত্তি তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত সে মসজিদই আপনার সালাত

---

[1] ড. ইফতেখার আহমেদ, *মসজিদ ও আমাদের সমাজব্যবস্থা*, পূর্বোক্ত, পৃ.২৩৮

[2] প্রাগুক্ত, পৃ.২৪০

Dhaka University Institutional Repository

আদায়ের জন্য অধিকতর যোগ্য। সে মসজিদে এমন লোক আছে যারা পবিত্রতা অর্জন করতে ভালবাসে। আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন।"[১]

রাসূলুল্লাহ (স) এ সকল কারণেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধেক অভিহিত করেছেন।[২] পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতার এ বিশেষ গুরুত্বের কারণে ইমাম সাহেব পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করবেন। তিনি মুসল্লীদের এবং সমাজের অন্যান্য লোকদের পরিচ্ছন্ন-পবিত্র থাকার গুরুত্ব বুঝাবেন। তাদের নিয়মিত গোসল করা, হাত-পায়ের নখ কাটা, দাঁত ব্রাশ করা এবং শরীরে ময়লা জমতে না দেয়ার উপকারিতা অবহিত করবেন। দামি বা কম দামি নয় বরং পরিচ্ছন্ন পোশাক পরতে বলবেন। আর তাদের সবাইকে নিয়ে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্যোগ নেবেন। যেখানে সেখানে ময়লা ফেলা, ভারি ও পলিথিন জাতীয় বস্তু দিয়ে পয়ঃপ্রণালি বন্ধ করে দেয়া, খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করা, নির্বিচারে গাছ কাটা, কালো ধোঁয়া ঝড়ায় এমন যানবাহন ও কারখানা চালু করা প্রভৃতি কারণে পরিবেশ নোংরা, অপরিচ্ছন্ন হয় এবং সুস্থ জীবনযাপন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। ইমাম সাহেব সম্মিলিত উদ্যোগে এসব প্রতিরোধের ব্যবস্থা করবেন। খুতবার আলোচনায় তিনি পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করবেন। এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালনের জন্য মুসল্লিদের নিয়ে তিনি পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ ঘোষণা দিয়ে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখার উদ্যোগ নেবেন।[৩]

ইমাম সাহেব এলাকার লোকদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে দিক নির্দেশনা দেবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। তিনি মসজিদ তহবিল গঠন করবেন। এলাকার সাধারণ জনগণকে এর সাথে সম্পৃক্ত করবেন। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে যাকাতসহ সকল রকমের বাধ্যতামূলক ও ঐচ্ছিক দান মসজিদ তহবিলে জমা নেবেন। তারপর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এলাকার দুঃস্থ ও নিঃস্ব লোকদের মধ্যে তহবিলের টাকা ব্যয় করবেন। কুটির শিল্প, ছোট ছোট দোকান, হাস, মুরগি বা মাছের খামার, ছোট্ট ডেইরি ফার্ম প্রভৃতি স্থাপনের মাধ্যমে তিনি দুঃখী গরিবদের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করবেন। সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য ইমাম সাহেব নিজে প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ নেবেন। পাশাপাশি উৎসাহী তরুণ-তরুণীদেরও এ ব্যাপারে উৎসাহ

---

[১] আল-কুরআন, সূরা তওবা, আয়াত: ১০৮

[২] মহানবী (স) বলেছেন, পবিত্রতা ঈমানের অংশ। (ইমাম বুখারী, সহীহ, পূর্বোক্ত, পৃ.৬৫)

[৩] খুরশিদ আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৭

Dhaka University Institutional Repository

দেবেন। তিনি কৃষকদের আধুনিক চাষাবাদের উপকারিতা ও পদ্ধতি শিক্ষা দেবেন। ফসল ও গবাদি পশু রক্ষার নিয়ম কানুন অবহিত করবেন।[১]

উন্নত চাষাবাদ, খামার প্রতিষ্ঠা, সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ প্রভৃতি কাজে তিনি সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করবেন। তিনি খাবার পানি হিসেবে বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারের কথা বলবেন। পানির অপচয় রোধ ও খাবার পানি নষ্ট করার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবেন। তিনি মসজিদের খালি জায়গা, পুকুর ও অন্যান্য সম্পদ কাজে লাগিয়ে মসজিদ ভিত্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি করবেন। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, পরিকল্পিত পরিবার গড়া, বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে শিশুকে টিকা দান প্রভৃতি সম্পর্কে ইমাম সাহেব বাস্তব ভূমিকা গ্রহণ করবেন।

ইমাম সাহেব ধর্মীয় নেতা। তিনি শিক্ষিত সজ্জন। নির্ধারিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারলে তিনি সমাজের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত হবেন। সে কারণে তার দায়িত্ব হবে সমসাময়িক বিষয় সম্পর্কে মুসল্লিদের জানানো। নিজ দেশে কী ঘটনা ঘটছে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মুসল্লিদের কী করণীয় সে সম্পর্কে ইমাম সাহেব নির্দেশনা দেবেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারিতে তিনি সবাইকে নিয়ে পরস্থিতি মোকাবেলা করবেন।[২]

বস্তুত ইসলামী সামজব্যবস্থায় এবং মুসলিম সমাজে ইমাম সাহেব মুসল্লিগণের এবং সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অভিভাবক, সামাজিক ও রাজনৈতিক রাজনৈতিক নেতা এবং অর্থনৈতিক উপদেষ্টা–নির্দেশক । অভিভবকত্বের হক আদায় করে তিনি তার দায়িত্ব পালন করলে সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি আসা সম্ভব। ইমাম সাহেবদের এ দায়িত্ব পালনের প্রায় পুরোটুকু একান্তভাবে মসজিদের উপর নির্ভর করে। তাই ইমামগণের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি প্রতিটি ভূমিকাকে মসজিদের ভূমিকা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।[৩]

---

[১] মোঃ নজরুল ইসলাম, *ইসলামী অর্থনীতি : প্রয়োগ ও ক্ষেত্র*, ঢাকা ১৯৯২, পৃ.৬৭

[২] খুরশিদ আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ.৬০

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ.৭৪

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়: নারীর মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে বিশ্বসভ্যতা, বিভিন্ন ধর্ম ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ

বিশ্বসভ্যতায় নারী

পৃথিবীতে মানুষের ইতিহাস যত প্রাচীন, আলাদাভাবে নারী পুরুষের ইতিহাস ঠিক ততটাই প্রাচীন।[১] মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পুরুষ সৃষ্টি করেছেন। এরপর সৃষ্টি করেছেন নারী। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে নারী-পুরুষের সম্মিলনে অস্তিত্বশীল ও গতিশীল করেছেন মানবজাতিকে। কুরআন মজীদে এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন, যিনি সৃষ্টি করেছেন সে ব্যক্তি থেকে তার জোড়া, আর তাদের দুজন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন অসংখ্য পুরুষ ও নারী। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অন্যের নিকট কিছু চাও। আর তোমরা আত্মীয়দের (হক আদায় ও সম্পর্ক অটুট রাখার) ব্যাপারে সতর্ক হও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।"[২]

মহান আল্লাহ অন্যত্র আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের

---

[১] কাজী আবদুর রউফ, *মানুষ ও সংস্কৃতি*, ঢাকা ১৯৭৬, পৃ.২

[২] আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত: ১

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তিই সবচেয়ে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে সবেচেয় বেশি তাকওয়াবান। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন।"[১]

মহান আল্লাহ তাঁর অসীম অনুগ্রহে মানবজাতির অগ্রযাত্রায় নারী-পুরুষের সমভূমিকা নির্ধারণ করে দিলেও যুগে যুগে বিভিন্ন সভ্যতা ও ধর্মে নারী নানাভাবে বঞ্চিত হয়েছে, লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত হয়েছে। গবেষকদের গবেষণা এবং ঐতিহাসিকগণের বর্ণনার ভিত্তিতে এ পর্যায়ে বিশ্বসভ্যতা ও ধর্মে নারীর মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে বিবরণ তুলে ধরা হল।

গ্রীক সভ্যতায় নারী

গ্রীক সভ্যতায় নারী কি মর্যাদার অধিকারী ছিলো তা সক্রেটিসের ভাষায় বেশ সুন্দররূপে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তিনি বলেছেন, Woman is the greatest source of chaose and disruption in the world. She is like the Dafali Tree which outwardly looks very beautiful, but if sparrows eat it they die without tail.[2]

(নারী জগতে বিশৃঙ্খলা ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস। সে দাফালি বৃক্ষের ন্যায়, যা বাহ্যত খুব সুন্দর দেখায়, কিন্তু চড়ুই পাখি তা খেলে তাদের মৃত্যু অনিবার্য।)

গ্রীক সভ্যতায় নারী সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে যেয়ে এন্ডারসকি (Anderosky) বলেন, "Cure is possible for fireburns and Snake-bite; but it is impossible to arrest woman's charms.[৩]

(আগুনে পোড়া রোগী বা সাপে কাটা ব্যক্তির আরোগ্য লাভ সম্ভব কিন্তু নারীর যাদু রোধ সম্ভব নয়।)

প্রাচীন গ্রীসে বিবাহে নারীর সম্মতি আবশ্যক বলে মনে করা হত না। মাতাপিতার ইচ্ছানুসারে তাকে বিবাহে বাধ্য হতে হত। বর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকলেও মাতাপিতার নির্দেশে নারী তাকে স্বামী ও

---

[১] আল-কুরআন, সূরা হুজুরাত, আয়াত: ১৩

[2] Dr. Srinidhi Chowhan, *Women's History*, MacMillan & Co, London 1986, p.125

[3] Mazhar Afza and khurshid Ahmad, *The position of woman in Islam,* Islamic Book Publishers, Kuwait 1982, (PP. 9-10)

Dhaka University Institutional Repository

প্রভূরূপে বরণ না করে পারতো না। নারীদেরকে নিতান্ত তুচ্ছ বলে গণ্য করা হত এবং সর্বদা তাদেরকে তাদের পুরুষ আত্মীয়-স্বজন, পিতা, ভ্রাতা, এবং চাচা, মামা, ও খালুকে মেনে চলতে হত।

প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে নারীর কোনো ভূমিকা ছিলো না এবং নারী ছিলো সম্পূর্ণরূপে সমাজ বিচ্ছিন্ন। নারীকে একান্ত অর্থহীন দ্রব্যের মতো ঘরের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দী করে রাখা হতো। এমনকি বড় বড় গ্রীক দার্শনিক ও চিন্তাবিদরাও মনে করতেন যে, নারীর অস্তিত্বের মতো নারী নামটাকেও যেন বদ্ধঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়।[1] তারা নারীকে নিছক সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র বলে মনে করতো। তাদের মতে, সন্তান উৎপাদন ছাড়া নারীর কাজ ছিলো স্বামী ও অন্যান্য পুরুষদের সেবা করা। "স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসা" কথাটি ছিলো গ্রীকদের জন্যে একান্ত দুর্বোধ্য। অবশ্য প্রেম ভালবাসার জন্যে তাদের আলাদা ব্যবস্থা ছিল। এ ব্যাপারে চমৎকার চিত্রাংকন করেছেন প্রখ্যাত গ্রীক চিন্তাবিদ ডেমোস্তিন। তিনি বলেছেন, "আমরা যৌনতৃপ্তি অর্জনের জন্য বেশ্যালয়ে যাই এবং আমাদের দৈনন্দিন কর্মসূচী তৈরী করে থাকে বালিকা বন্ধুরা। আমরা কেবল আইনগতভাবে সন্তান উৎপাদনের জন্যই স্ত্রী গ্রহণ করি।"[2]

এথেন্সীয় নারী সবসময় কিছু পুরুষের পদানত থাকত। বিয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত তাদের অনুমতির গুরুত্ব দেওয়া হত না।[3] এ জন্য বিয়ের পর মেয়েরা পিতৃগৃহ ছেড়ে স্বামীর ঘরে চলে আসত। স্বামীর ঘরে তারা কিন্তু গৃহকর্তী হত না। বরং স্বামীর ঘরে নারী সন্তান জন্ম দেওয়া ও লালন–পালন করা এবং পরিবারের সকলের সেবিকা হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য আসত।

গ্রীক সভ্যতার গৌরবোজ্জল যুগে সাধ্বী নারী মহামূল্য সম্পদরূপে পরিগণিত ছিল। সেকালে তারা পর্দা প্রথা মেনে চলত। পরবর্তী যুগে বারবনিতালয় গ্রীসের সর্বস্তরের লোকদেরকে আকর্ষণ করে এবং তখন জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণে ও পতিতাদের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। পতিতালয়ে সকল শ্রেণীর লোকদের যাতায়াত এতটা সার্বজনীন এবং সর্বজনগ্রহণীয় ছিলো যে, একে এক ধরনের উপাসনালয় হিসেবে গণ্য করা হত। পতিতাকে তারা প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী আফ্রোদিতির প্রতিনিধি মনে

---

[1] ড. মফিজুল ইসলাম, *গ্রীক ইতিহাস*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৮০, পৃ. ১১৪-১১৭

[2] আলবাহি আল খাওলী, অনুবাদক, মোহাম্মদ নুরুল হুদা, *নারী ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে*, ২য় সংস্করণ, সিন্দাবাদ প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯০, পৃ. ৫

[3] *The Encyclopaedia Britannica,* 11th edition, Vol-28, p-782

Dhaka University Institutional Repository

করতো। গ্রীকদের বিশ্বাস অনুসারে দেবী আফ্রোদিতি তার নিজের স্বামীকে পরিত্যাগ করে অপর তিন দেবতার সাথে অবৈধ প্রেমের সম্পর্কে নিমজ্জিত হয়েছিল।[১]

রোম সভ্যতায় নারী

রোম সভ্যতাকে পাশ্চাত্যে প্রচলিত আধুনিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সুতিকাগার বলা হয়। এ সভ্যতায় পরিবারের প্রাচীন পুরুষ ছিলেন সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরু। পরিবারের সকল অর্থ–সম্পদ, ক্ষমতা এবং সব ধরনের অধিকারের একচ্ছত্র মালিক ছিলেন তিনি। পারিবারিক সব রকমের বেচা-কেনা, মামলা, চুক্তি ইত্যাদি তারই এখতিয়ারাধীন ছিল। রোমান সমাজেও নারী ছিলো অবহেলিত, লাঞ্ছিত ও অধিকার হারা। এ সমাজে নারীর কোনো গুরুত্ব, অধিকার বা মর্যাদা স্বীকৃত ছিলো না। সকল রকমের আইনগত অধিকার থেকে নারী বঞ্চিত ছিল। অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু আর পাগলের মতো নারীকে ও মনে করা হতো অযোগ্য ও অক্ষম। নারী হয়ে জন্ম নেওয়াই ছিলো তার অযোগ্যতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এমন কি বাবার কাছ থেকে বিয়ের যৌতুক কিংবা বিয়েতে উপহার হিসেবে পাওয়া সম্পত্তিতেও নারীর কোনো অধিকার ছিলো না। স্বামীর ঘর করার সাথে সাথে স্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পদও স্বামীর মালিকানায় চলে যেতো। রোমান নারী আদালতে বিচার প্রার্থনার অধিকার থেকেও বঞ্চিত ছিল, এমন কি তার সাক্ষ্য দেওয়ার অধিকারও ছিলো না। রোমান সভ্যতায় কোনো নারী সরকারী বা বেসরকারী পদ গ্রহণ করতে পারতো না... হতে পারতো না জামিন, শিক্ষক অথবা অভিভাবক.... উইল বা চুক্তিবদ্ধ হওয়ার অধিকারও তার ছিলো না।[২]

রোমান সমাজে প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতির পাশাপাশি নারীর জন্য চরম অপমানকর একটি বিশেষ ধরনের বিয়ের প্রচলন ছিল। এই বিয়েকে সর্দারী বিয়ে বলা হতো। এর মাধ্যমে যে কোনো নারী সর্দারের স্ত্রী বলে গণ্য হতো। একবার কেউ সর্দারী বিয়ের কবলে পড়লে তাকে তার সাবেক পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যেতে হতো। সর্দারী বিয়ের স্ত্রীর উপর কখনো কোনো অপরাধের অভিযোগ আনা হলে তাকে সর্দারের সামনে পেশ করা হতো। সর্দার নিজ হাতে এ ধরনের অভিযুক্ত স্ত্রীকে শাস্তি দিত। এক্ষেত্রে অভিযোগ প্রমাণ বা আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ ছিলো না। সর্দার

---

[1] Sail Abdullah Seif Al-Hatimy, *Woman in Islam,* Islamic Publication Ltd. Lahore, Pakistan, 1976, pp.2-3.

[2] *The Encyclopaedia Britannica,* 11th edition, Vol-28, p-783

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বাসঘাতকতার মত অভিযোগে সর্দারী বিয়ের স্ত্রীদের মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতো এবং নিজেই তা কার্যকর করার দায়িত্ব নিত।[১]

রোমান সভ্যতায় কোনো মহিলার স্বামী মারা গেলে তার বিধবা স্ত্রী ছেলেদের উত্তরাধিকারে পরিণত হতো। স্বামীর মত সন্তানও তাকে ভোগ করার অধিকার লাভ করত। যদি পুত্র সন্তান না থাকতো তাহলে বিধবা নারীটি স্বামীর ছোটভাই বা চাচার অধিকারে চলে যেতো।[২]

চীন সভ্যতায় নারী

দুনিয়াতে চীন দেশেই নারীদের মর্যাদা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল। চীনের ধর্ম গ্রন্থে নারীকে দুঃখের এমন প্রস্রবণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যা সকল সৌভাগ্য ভাসিয়ে নিয়ে যায়। চৈনিক সভ্যতায় নারী কখনো কোনো অর্থ–সম্পত্তির অধিকারী হতে পারতো না। এমন কি সন্তানের উপরও তার কোনো অধিকার থাকত না। স্বামী যখন ইচ্ছা, তখনই তালাক দিতে পারতো এবং অপরের উপপত্নীরূপে তাকে বিক্রয়ও করতে পারত। বিধবা হলে তাকে স্বামীর পরিবারের সম্পত্তিরূপে জীবন যাপন করতে হত এবং পুনর্বিবাহ তার জন্য প্রায় অসম্ভব ছিল।[৩]

চীনদেশের নারীদের অবস্থা বর্ণনা করতে যেয়ে এক সম্ভ্রান্ত চীনা মহিলা লিখেছেন, "মানব সমাজে নারীদের স্থানই সর্বনিম্নে। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! নারী সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য প্রাণী। জগতে নারী হতে নিকৃষ্ট আর কিছুই নাই। এজন্যেই আমাদের অংশে এসেছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কর্ম।"[৪]

চীনা নারীদের অবস্থা তুলে ধরে আরেকজন সম্ভ্রান্ত নারী লিখেছেন, "নারী কতো হতভাগিনী! পৃথিবীতে তার মতো মূল্যহীন দ্রব্য আর কিছুই নেই। ছেলেরা দোরমুখে এমন ভাবে দাঁড়ায় যেন তারা আকাশ থেকে আগত কোনো দেবতা। কিন্তু মেয়েদের জন্য মূহর্তেও আনন্দের শানাই বাজে না। যখন তারা বড় হয়ে উঠে তখন তাদের বন্ধ ঘরে লুকিয়ে রাখা হয় যেন কোনো মানুষ তাদেরকে দেখতে না

---

[১] আলবাহি আল খাওলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা.৬

[2] Dr. Srinidhi Chowhan, p.76

[3] Professor G. K. Strong, *China Soceity,* London 1983, pp. 7-8

[4] V. V. Kant, অনুবাদক Mohammad Badran, *কিস্সাতুল হামারা*, বৈরুত, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-২৮৩

Dhaka University Institutional Repository

পায়। আর যখন সে নিজ গৃহে থেকে মৃত্যুবরণ করে তখন তার জন্যে দুফোঁটা অশ্রু ফেলার মতো কেউ থাকে না।"[১]

চীনদেশে ব্যভিচারের ন্যায় অপরাধে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারত। তার মাতাপিতা তাকে গ্রহণ করতে সম্মত হলে সে তাদের নিকট চলে যেত। অন্যথায় তাকে রাস্তায় বের করে দেওয়া হত।[২]

অবিবাহিতা নারী পিতার পরিবারের সদস্য থাকত। বিয়ের পর সে স্বামীর পরিবারে চলে যেত এবং স্বামীর মাতাপিতা ও মুরুব্বীদের কর্তৃত্বাধীন থাকত। অলংকারদি ও নিজস্ব ব্যবহারের জিনিসপত্র ব্যতীত বধূ যে সম্পত্তিই সঙ্গে আনত, এর সকলি স্বামীর পরিবারের সম্পত্তিতে পরিগণিত হত। বধূর অবস্থা নিতান্ত অসহায় ছিলো এবং কেবল পিতার বংশের বলেই সে স্বামীর পরিবারে টিকে থাকতে পারত। পুত্রসন্তান প্রসব এবং স্বামীর ও মুরুব্বীদের মৃত্যুতে শোক পালনে স্ত্রীর অবস্থা কিছুটা সবল হয়ে উঠত।[৩]

ভারতীয় সভ্যতায় নারী

ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশেও নারী জাতির অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। নারী পাপ এবং নৈতিক চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতা ধ্বংসের মূল উৎস বলে বিবেচিত হত। সুতরাং তাকে সর্বদা শাসনাধীনে রাখাই ছিলো আসলরীতি। মনু সংহিতার ভাষ্য অনুসারে, নারীকে দিবা-রাত্র অবশ্যই পুরুষের কড়া শাসনে রাখা আবশ্যক। কারণ, নারী জন্মগতভাবে দুশ্চরিত্রা ও লম্পট। অতএব তাকে কঠোর শাসনে না রাখলে সে অবশ্যই বিপথগামী হবে।[৪]

নারী সম্পর্কে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে মনুস্মৃতি অধ্যয়নে জানা যায় যে, মনু যখন নারী সৃষ্টি করেন তখন তিনি নারীকে পুরুষের প্রতি প্রেম, রূপচর্চা, ব্যাভিচারে লিপ্ত থাকা ও ক্রোধের প্রবণতা দান করেন এবং মানবিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে নারীকে নিকৃষ্টতম ব্যবহারের উপযুক্ত বলে ঘোষণা

---

[1] V.V.Kant, ibid, p.283

[2] Said Abdullah Seif Ali-Hatimy: Ibid, p.7

[৩] *Encyclopaedia of Britanica,* Vol-4, p-409

[4] Ramesh Chandra Mazumdor, *Position of Indian Women in Domestic life, (Great Women of India)* Swamei and Mazumdar. Delhi 1996, p-19.

Dhaka University Institutional Repository

করেন। সুতরাং হিন্দু সমাজে এই রীতি প্রবর্তিত হয়, "নারী হচ্ছে নোংরামীর জড় এবং তার অস্তিত্ব হচ্ছে আগাগোড়া নরক।[1] মনু শাস্ত্রে এও বলা হয়েছে যে, "অনুগত স্ত্রী হলো সে, যে তার স্বামীর সেবা এই ভাবে করে যেন সে তার প্রভু। তার ব্যাপারে এমন কোনো কথা না বলে যা তার জন্যে দুঃখজনক হয়। যদিও তার স্বামী বড় লম্পট বা বদমাইশ হয়। কেননা, কেবল ঐ জন্যেই নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে আর যখন সে তার স্বামীকে ডাকবে তখন অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে 'হে আমার উপাস্য' বলে ডাকবে। কিছু দুরত্ব বজায় রেখে তার পিছু পিছু চলবে এবং স্বামী তার সাথে বেশি থেকে বেশি একটি মাত্র কথা বলবে। নারী স্বামীর সাথে খাবার গ্রহণ করবে না বরং স্বামীর উচ্ছিষ্ট সে খাবে।"[2]

নারী সম্পর্কে উপর্যুক্ত ধারণাই সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু উচ্চ শ্রেণী ও রাজবংশের মহিলাদেরকে অধিকতর সাবধানতার সাথে ভিন্ন পুরুষের নিকট হতে দূরে রাখা হত। রাজবংশের মহিলাগণের আবাসস্থল কড়া প্রহরাধীনে রাখা হত। কোনো কারণেই তাদের গৃহের বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিলো না। আকস্মিক বিপর্যয় বা অপরিহার্য কারণে উচ্চ বংশের কোনো মহিলা জীবিকা অর্জনে বাধ্য হলে এ কার্যে যাতে তার সতীত্ব নষ্ট না হয়, সেজন্য অতি কঠোর সাবধানতা অবলম্বন করা হত। বস্ত্রশিল্প কারখানায় নারীকে যেতে হলে অতি প্রত্যূষে অন্ধকার থাকতে তাকে যেতে হত। যেন সহজে সে কোনো লোকের চোখে পতিত না হয়। তার বয়নকৃত বস্ত্র যে কর্মচারী গ্রহণ করতো, তাকে অন্ধকারেই বাতির সাহায্যে তা পরীক্ষা করে নিতে হত। সে যদি মহিলার মুখমণ্ডলের দিকে তাকাত অথবা তার সংশিষ্ট কাজ ব্যতীত অন্য কোনো কথা তার সাথে বলতো, তবে তাকে জরিমানা দিতে হত।[3]

উল্লিখিত বর্ণনা হতে প্রমাণিত হয়, প্রাচীন ভারতে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু সমাজে কিছুটা পর্দা প্রথা প্রচলিত ছিল; যদিও পূর্ণ পর্দা প্রথা ইসলামের আবির্ভাবের পরই প্রবর্তিত হয়।

সতীদাহ প্রথা প্রাচীন ভারতে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। এ প্রথা অনুযায়ী স্ত্রীকে তার স্বামীর প্রজ্বলিত চিতায় আত্মবিসর্জন দিতে হত। এখনও এ বর্বর প্রথা ভারতের কোনো কোনো স্থানে প্রচলিত আছে। মাত্র কিছুদিন পূর্বেও ভারতে এ প্রথা রহিত করে আইন প্রণয়ন করতে হয়েছে।[4]

---

[1] Ramesh Chandra Mazumdor, ibid, p.45

[2] রমেশ কান্তি দাশ, *পৌরাণিক ভারতীয় নারী*, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ.৫৪

[3] A.L. Bashau, *The Wandar That was India*, Fontana, 1971, p.191

[4] রমেশ কান্তি দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৬

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু সমাজে নারী অতীব অশুভ প্রাণী বিশেষ। এজন্যই সতীদাহ প্রথানুসারে বিধবা নারী স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন করাকেই অপমান ও লাঞ্ছনার জীবন যাপন অপেক্ষা শ্রেয় মনে করতো। হিন্দু শাস্ত্রগুলোতে নারীর অসম্মানের জীবন প্রতিষ্ঠিত করে। মনু সংহিতার একটি ইংরেজি ভাষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, "নারীর ন্যায় এত পাপ-পঙ্কিলতাময় প্রাণী আর নাই। নারী প্রজ্বলিত অগ্নিস্বরূপ সে ক্ষুরের ধারালো দিক। এসমস্তই তার দেহে সন্নিবিষ্ট।"[১] তাই পুরুষদের জন্য নারীকে ভালবাসা একেবারেই অনুচিত।[২]

পুত্র সন্তান জন্মালে পরিবারে আনন্দ ধরত না। কিন্তু কন্যা সন্তান জন্মিলে বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে আসত। এ জন্য আপামর ভারতীয়দের প্রার্থনা ছিল, "হে দেবতা! নারী সন্তান অন্যত্র দান কর। আমাদের দাও পুত্র সন্তান।"[৩]

হিন্দু সমাজের অন্তরের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি নারীর প্রতি তাদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করে তোলে। এসব প্রমাণ ও তথ্য প্রচীন ভারতে নারীর করুণতম অবস্থা প্রমাণ করে। বৈদিক সাহিত্য ও অন্যান্য প্রচীন সাহিত্যে এর যথেচ্ছ দৃষ্টান্ত রয়েছে। সাধারণভাবে ভারতীয় সমাজে কন্যা অভিশাপ[৪]; 'নারী মিথ্যাচারিনী, দুর্ভাগ্য স্বরূপিণী, শূরা বা দ্যূতক্রীড়ার মত একটি বাসনা মাত্র।[৫] প্রাচীন ভারতে নারীর সার্বিক অবস্থান ও অবস্থান বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায়, এ সময়ে নারীগণ সকল অধিকারবঞ্চিত অবস্থায় পুরুষদের দ্বারা অব্যাহত নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।[৬]

---

[1] "There is no creature more sinful than woman. Woman is burning fire. She is the sharp edge of the razor. She is verily all these in a body." - Professor Indra, *Statues of Woman in Mohabharat,* Chennai, 1999 p.16

[২] "Men should not love them" Ibid, p.17

[৩] "The birth of a girl grants if else-where, here grant a boy." - Ibid, p.21.

[4] ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৬/৩/৭/১৩

[5] মৈত্রায়ণী সংঘ ১/১০/১১

[6] সুকুমার ভট্টাচার্য, *প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য*, আনন্দ প্রাঃ লিঃ কলকাতা, পৃ.৩৮

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন ধর্মে নারী

পারসিক ধর্মে নারী

প্রাচীন পারস্যে অগ্নি পূজকদের ধর্মীয় নেতা ছিলেন যরথুস্ত্র।[১] তার ধর্মেও নারী জাতি সম্পর্কে অপমানকর বিধান দেখতে পাওয়া যায়। যরথুস্ত্র বলতেন, "সন্তানবিহীন নারী পুলসিরাত পার হতে বা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। কাজেই বেহেশতের অভিলাষিনী নারী যেনো অন্ততপক্ষে অপর কারো সন্তান পালন করে হলেও মাতৃপদ লাভ করে।"[২] এই ধর্মে ঋতুমতী নারীর প্রতি যুলুমের শেষ ছিলো না। যরথুস্ত্রের হুকুম ছিল, "কোন ঋতুমতী নারী যেনো সূর্য না দেখে, কোনো পুরুষের সঙ্গে কথা না বলে। আগুনের দিকে দৃষ্টি না দেয়, পানিতে অবতরণ না করে, অন্য কোনো ঋতুবর্তী নারীর সঙ্গে একত্রে শয়ন না করে, খাদ্য স্পর্শ না করে, কোনো পাত্র ধরতে হলে হাত যেন কাপড় দিয়ে জড়িয়ে নেয়। কোনো ঋতুমতী নারী এর বিপরীত করলে তার জন্য বেহেশত হারাম।"[৩]

প্রসূতি ঘরের নিয়মও অনুরূপ কঠোর ছিল। সন্তান প্রসবের পর নারীকে অনেক কঠোর ও অমানবিক নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য করা হত। প্রসবের পর চল্লিশ দিনের মধ্যে প্রসূতি নারী মাটি বা কাঠের পাত্র স্পর্শ করার অনুমতিও পেতো না। ঐ সময়ের মধ্যে প্রসূতি নারী ঘরের বারান্দায় পা দিতে পারতো না। ঋতুকাল একটি পাপকাল বলে বিবেচিত হতো। এ সময়ের পাপ থেকে তওবা করার জন্য বছরে একটি মাস নির্ধারিত ছিল। সেখানকার দুর্ভাগা নারীজাতি নিজের জীবনকে বোঝা বলে মনে করতো। নারী ছিলো স্বামীর দাসী স্বরূপ, আল্লাহর ইবাদত থেকে তাদেরকে মুক্তি দিয়ে স্বামীর দাসত্বে নিয়োজিত করা হতো।[৪]

যরথুস্ত্রের ধর্ম প্রাচীন ধর্ম। হযরত ঈসা (আ)এর জন্মের পঁচিশ বছর আগের যুগটি যরথুস্ত্রের যুগ। তবে এই ধর্মে বিভিন্ন রকমের যৌন উন্মাদনার সুযোগ ছিলো বলে সম্রাটদের অনেকে এ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং এ ধর্মের প্রভাব ও প্রচারণায় অবদান রাখেন। গোড়ার দিকে ধর্মটি মজুসিয়াত বা মাজুসি নামে পরিচিত ছিল। সম্রাট পারভেজ ছিলেন একজন মজুসী। একই সময় সে বার হাজার স্ত্রীর

---

[১] ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্ম*, মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ঢাকা ২০১২, পৃ.১৬৩

[2] Ahmad Gassani, *Zendabesta*, Tehran, 1983, p.89

[3] ibid, p.91

[৪] মর্তুজা খালেদ, *জরথুস্ত্রবাদ ও প্রাচীন পারসিক ধর্ম : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, খণ্ড ১৩, সংখ্যা ১ ও ২, জুন-ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ. ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

স্বামী ছিলো। এই বার হাজার স্ত্রীর মধ্যে একশরও অধিক ছিলো তার মা, খালা, ফুফু, বোন ইত্যাদির নিকট আত্মীয় স্বজন। পারভেজ এই বার হাজার স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট ছিলো না। যখন তার ইচ্ছা হতো বিশ পঞ্চাশ জনকে তালাক দিতো অথবা হত্যা করতো, আবার পছন্দমতো স্ত্রী সংগ্রহ করে নিতো, এমন কি সে তার বিবিদেরকে বিক্রি করতেও দ্বিধা করত না। এ সময় সতিন পুত্রের সাথে সৎ মায়ের সংগম করাও চলতো। এতে কোনো লাজ-লজ্জার বালাই ছিলো না। এভাবে মা-বোন বা মেয়ের পার্থক্য উঠিয়ে দেওয়ার ফলে মজুসী ধর্ম বহু দূর দেশেও পরিচিতি লাভ করেছিলো। এই ধর্মের সংস্কারক হিসাবে দার্শনিক মযুক এসে আরো বহু বিধি বিধানের পরিবর্তন ঘটিয়ে একটি নতুন ধর্মের সৃষ্টি করেন যার অনুসারী ছিলেন শাহ কাবাদ এর মতো প্রতাপশালী রাজাও। মযুকের মতে, ধন ও নারী সকল অন্যায়ের মূল। তাই সে ধন ও নারীকে স্বাধীন করে দিলো অর্থাৎ ধন ও নারী কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি না হয়ে সর্বসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হলো। মযুকের এই নীতি শাহ কাবাদের প্রচারণায় রাজ্যের সর্বত্র প্রতিপালিত হতে শুরু করলো। এভাবে এক ব্যক্তির ধন সমস্ত দেশবাসীর ধনে এবং এক ব্যক্তির স্ত্রী সমস্ত দেশবাসীর স্ত্রীতে পরিণত হলো।[১]

পারসিক সভ্যতার এই বিশৃঙ্খলার যুগে নিজের ধন বা নিজের স্ত্রীকে অপরের উপভোগ থেকে নিষেধ করার মতো সাহস কারো ছিলো না। প্রত্যেক মানুষের যে কোনো নারী বা কারো স্ত্রীর সাথেই মেলামেশা করার অধিকার ছিলো, এমন কি শাহ কাবাদ এই মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে তার শাহী মহলের পাহারা ও বিধি-নিষেধ উঠিয়ে দিয়েছিলো। শহরের জনসাধারণ নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে বেগম মহলে প্রবেশ করে শাহযাদী ও বেগমদেরকে ভোগ করে মযুসী মতবাদকে কার্যতরূপ প্রদান করতো। সকল মানুষই একে অপরের ঘরে প্রবেশ করে নারী সম্ভোগে সমবায় মূলনীতি বাস্তবায়ন করে।[২]

হিন্দু ধর্মে নারীর অধিকার ও মর্যাদা

হিন্দু ধর্মমতে বেদ গ্রন্থ স্পর্শ ও পাঠ নারীর জন্য নিষিদ্ধ। ভারতে নারীকে যে স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে স্বীকার করা হত না, সতীদাহ প্রথাই[৩] তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। হিন্দুদের মধ্যে বহু বিবাহ উভয়দিক

---

[১] মর্তুজা খালেদ, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৯

[২] ইসহাক ওবায়দী, *যুগে যুগে নারী*, ঢাকা ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-২৫

[৩] সতীদাহ প্রথা: হিন্দুধর্ম মতে মৃত স্বামীর চিতায় সস্ত্রীক পুড়ে মৃত্যুবরণ।

Dhaka University Institutional Repository

থেকে অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। প্রাচীন মিসরীয়, ব্যাবিলনীয়, অ্যাসিরীয় ও পারসিকদের মধ্যেও আপাতদৃষ্টিতে একজন পুরুষ কয়জন নারীকে বিবাহ করতে পারবে সে বিষয়ে কোনো বাধা ছিলো না। এমনকি আধুনিক যুগেও একজন উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ যে কয়টি স্ত্রী গ্রহণ করতে চায়, সে অধিকার তার রয়েছে।[১]

হিন্দু শাস্ত্রমতে, আট প্রকার বিবাহের মধ্যে গান্ধাব,[২] রাক্ষস,[৩] পৈশাচ বিবাহের তাৎপর্য লক্ষ্য করলেই তখনকার নারী জাতির দুরবস্থার কথা সম্যক অবগত হওয়া যায়।[৪] হিন্দু ধর্মানুসারে মানবের আদি পিতা ভগবান মনু; এবং মনু হতেই সমগ্র মানব জাতি জন্মলাভ করেছে-এটাই শাস্ত্রকারদের মত। ভগবান মনু স্বয়ং নারী জাতির প্রতি ব্যবস্থা নিয়েছেন তার কিয়দাংশ আমরা এখনে উদ্ধৃত করছিঃ

" নারীরা সৌন্দর্য অন্বেষণ করে না, যুবা বা বৃদ্ধ তাও দেখে না, সুরূপ বা কুরূপ হোক, তারা পুরুষ পেলেই তার সাথে সম্ভোগ করে। কোনো পুরুষকে দর্শন করামাত্রই তার সাথে 'ক্রীড়া'য় রত হওয়ারইচ্ছা স্ত্রীলোকদের জন্মে থেকে। এজন্য এবং চিত্তের স্থিরতার অভাবে স্ববাবহ তারা স্নেহশূন্যতা প্রযুক্ত। স্বামী কর্তৃক রক্ষিত হলেও স্ত্রীলোক স্বামীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারাদি কুক্রিয়ায় লিপ্ত হয়ে থাকে। স্ত্রীলোকদের এইরূপ স্বভাব স্বয়ং বিধাতা কর্তৃক হইয়াছে।"[৫]

"মন্ত্রদ্বারা স্ত্রীলোকদের জাত কোনদিন সংস্কার হয় না। এজন্য তাদের অন্তঃকরণ নির্মল হতে পারে না। যেহেতু বেদ স্মৃতিতে তাদের কোনো অধিকার নেই, এজন্য তারা ধর্মজ্ঞ হতে পারে না এবং পাপ করে কোনো মন্ত্রের আবৃত্তির দ্বারা পাপস্খলন করে নেবে, সে সুযোগও তাদের নেই। কারণ কোনো প্রকার মন্ত্রে তাদের অধিকার নেই।"[৬]

নারী পাপ, নৈতিক চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতা ধ্বংসের মূল উৎস বলে বিবেচিত হত। সুতরাং তাকে সর্বদা শাসনাধীনে রেখে দেয়াই ছিলো আসল রীতি। মনু'র মতে তাকে দিবারাত্র অবশ্যই পুরুষের কড়া

---

[১] Ameer Ali, *The Spirit of Islam,* Delhi, 1965, p.305

[২] গান্ধব প্রথারয় পরস্পর প্রেমাসক্ত পাত্র পাত্রীর ইচ্ছানুযায়ী হিন্দুমতে সম্পাদিত বিবাহ বিশেষ। সুবল চন্দ্র মিত্র, *সরল বাংলা অভিধান*, কলিকাতা,-১৯৮৫, পৃ. ১৬২

[৩] কন্যাকে বলপূর্বক ধরে এনে বিবাহ। সুবল চন্দ্র মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯২

[৪] এফ এম আবদুল জলীল, *মুসলিম সভ্যতায় নারী*, ইফাবা, খুলনা, ১৯৮০ খ্রি. পৃ.৩

[৫] প্রাগুক্ত, পৃ.৮

[৬] প্রাগুক্ত, পৃ.১০

Dhaka University Institutional Repository

শাসনে রাখা আবশ্যক। কারণ নারী জন্মগতভাবেই দুশ্চরিত্রা ও লম্পট। অতএব, তাকে কঠোর শাসনে না রাখলে সে অবশ্যই বিপথগামী হবে।[১]

নারী সম্পর্কে উপর্যুক্ত ধারণাই সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু উচ্চ শ্রেণী ও রাজবংশের মহিলাদেরকে অধিকতর সাবধানের সাথে ভিন্ন পুরুষের নিকট হতে দূরে রাখা হত। রাজবংশের মহিলাদের আবাসস্থল কড়া প্রহরাধীনে রাখা হত। কোনো কারণেই তাদের গৃহের বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিলো না। অনাকাঙ্খিত বিপর্যয় বা অপরিহার্য কারণে উচ্চবংশের কোনো মহিলা জীবিকা অর্জনে বাধ্য হলে এই কাজে যাতে তার সতীত্ব নষ্ট না হয়, তজ্জন্য অতি কঠোর সাবধানতা অবলম্বন করা হত। বস্ত্রশিল্প কারখানায় যেতে হলে অতি প্রত্যূষে অন্ধকার থাকতে তাকে যেতে হত, যেন সহজে কোনো লোকের চোখে পতিত না হয়। তার বুননকৃত বস্ত্র যে কর্মচারি গ্রহণ করতো, তাকে অন্ধকারেই বাতির সাহয্যে তা পরীক্ষা করে নিতে হত। সে যদি মহিলার মুখমণ্ডলের দিকে তাকাত বা তার সংশ্লিষ্ট কাজ ব্যতীত অন্য কোনো কথা তার সাথে বলতো, তবে তাকে জরিমানা দিতে হত।[২]

উপর্যুক্ত বর্ণনা হতে প্রমাণিত হয়, প্রাচীন ভারতে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু সমাজে কিছুটা পর্দা প্রথা প্রচলিত ছিল; যদিও পূর্ণ পর্দা-প্রথা ইসলামের আবির্ভাবের পরই প্রবর্তিত হয়। সতীদাহ প্রথা প্রাচীন ভারতে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। এই প্রথা অনুযায়ী স্ত্রীকে তার স্বামীর প্রজ্বলিত চিতায় আত্মবিসর্জন দিতে হত। এখন এই বর্বর প্রথা রহিত করে ভারতকে আইন প্রণয়ন করতে হয়েছে।[৩]

হিন্দু সমাজে নারী অতীব অশুভ প্রাণীবিশেষ। এ জন্যই সতীদাহ প্রথা অনুসারে বিধবা নারী স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন করাকেই অপমান ও লাঞ্ছনার জীবন যাপন অপেক্ষা শ্রেয় মনে করত।

There is no creature more sinful woman. Woman is burning fire, She is the sharp dege of the razor. She is verty all these in a body.

"নারীর ন্যায় এত পাপ পঙ্কিলতাময় প্রাণী আর নাই। নারী প্রজ্জলিত অগ্নিস্বরূপ। সে ক্ষুরের ধারালো দিক। এই সমস্তই তার দেহে সন্নিবিষ্ট।"[৪]

---

[1] Amer ali, *The spirit of Islam*, p: 30

[2] A. L. Bashau, ibid, P. 181.

[৩] আবদুল খালেক, *নারী*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি, পৃ. ৪

[4] Ibid, p.17

Dhaka University Institutional Repository

Men should not love them."নারীদেরকে ভালবাসা পুরুষদের উচিত নয়।"[১] পুত্রসন্তান জন্মালে পরিবারে আনন্দ ধরত না কিন্তু কন্যা সন্তান জন্মালে বিষাদের ছায়া নেমে আসত।

The birth of a girl if else, where gere grant a boy.

"হে দেবতা! নারী সন্তান অন্যত্র দান কর। আমাদের পুত্র সন্তান দাও"[২]

এখানে এভাবে হিন্দু সমাজের অন্তরের আশা-আকাঙ্খারই অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত অসুর বিবাহ পিতা কর্তৃক কন্যা বিক্রয় স্বরূপই ছিল। হিন্দু নারী কোনো সম্পত্তি অধিকারী হতে পারতো না। সে যুগে বালিকাদেরকে দেবতার নামে উৎসর্গ করে দেওয়া হত। দেবতাগণ তাদেরকে বিবাহিতা স্ত্রীর মত ব্যবহার করতে পারত। এই বালিকাগণ অবশেষে মন্দিরের

পুরোহিত ও ধর্মকর্তাদের অধীনে চলে যেত এবং পুরোহিত ও মন্দিরের কর্মচারিদের উপরি পাওনারূপে পরিগণিত হত।[৩] বৈদিক যুগে নারী যুদ্ধে লব্ধ লুটের মালের মত ছিল। যুদ্ধ বিজয়ের পর বিজয়ী পক্ষ জোরপূর্বক নারীদেরকে অপহরণ করত এবং লুণ্ঠিত সামগ্রীর ন্যায় তাদেরকে নিজেদের মধ্যে বিতরণ করে নিত। স্বামী স্ত্রীকে সেবাদানকারীরূপে ব্যবহার করত। কন্যা সন্তান প্রসবকারিণী স্ত্রী সর্বক্ষেত্রে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হত। ব্যভিচার, পতিতাবৃত্তি এবং কোনো অপরাধের কারণে, এমনি স্বামীর মৃত্যুতেও বিবাহ ভঙ্গ করা যেত না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমিল, রেষারেষি, শত্রুতা ও ঘৃণা বিরাজ করলেও বিবহ বিচ্ছেদ ঘটানো যেত না।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে দুনিয়ার কোনো দেশেই নারী স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিলো না। কোথাও নারী সম্পত্তির মালিক ও উত্তরাধিকারী হতে পারতো না।[৪] শুধু চৌদ্দশত বছরের আগের কথাই বা বলি কেন? আজ কি হিন্দু সমাজের মেয়েদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়েছে? না, আজো হয়নি। আজো পঙ্কিল পণ প্রথা হিন্দু মেয়েদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলছে। একটা মেয়েকে বিয়ে দিতে যেয়ে তার অভিভাবককে হিমশিম খেতে হচ্ছে পণের টাকা যোগাড় করতে। যৌতুকের বোঝা মাথায়

---

[1] Ibid, p.17

[2] Ibid, p.21

[3] আবদুল খালেক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫

[8] Dida Hussain Malik; *Wives of the prophet (SM),* (Pakistan: Lahore Asharaf Publications, 1983, B.C) p: 12-15.

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে মেয়ে যায় শ্বশুরবাড়ি। যৌতুক যদি একটু এদিক ওদিক হয়, তাহলে শাশুড়ী ননদ মিলে শুরু করে অত্যাচারের কঠিন কষ্ট। উঠতে বসতে কথায় কথায় খোঁটা। তাছাড়াও থাকে খাওয়ার কষ্ট। অর্থাৎ যে যেভাবে কষ্ট দেওয়া সম্ভব, সে সেভাবেই কষ্ট দিয়ে থাকে। তারা ভুলে যায় তার মেয়েকেও পরের বাড়ি পাঠাতে হবে। তারপর কষ্ট সয়ে সয়ে ঐ নতুন বউই হয়ে যায় একদিন শাশুড়ী এবং খেলে যায় নতুন দাবার ছকে পুরানো একই খেলা।

খ্রিস্টান ধর্মে নারীর স্থান ও অধিকার

খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মের নামে নারী জাতির উপর অতীব নিষ্ঠুর নিদারুন নৃশংস আচরণ করা হয়েছে। পোপ শাসিত 'পবিত্র' রোম সাম্রাজ্যে তাদের দেহে গরম তেল ঢেলে দেয় হয়েছে; দ্রুতগামী অশ্বের লেজের সাথে তাদেরকে বেঁধে হেঁচড়ানো হয়েছে এবং মযবুত স্তম্ভে বেঁধে তাদেরকে অগ্নিতে দগ্ধ করা হয়েছে। এতেও নারী জাতির নির্যাতনের পরিসমাপ্তি ঘটেনি। সপ্তদশ শতাব্দীতে কাউন্সিল অব দ্যা ওয়াইজ-এর এক অধিবেশন রোম নগরীতে অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, Woman has no soul- "নারীর কোনো আত্মা নেই।"

খ্রিস্টান ধর্মমতে একমাত্র নারীই মানবীয় পাপের জন্য দায়ী।[১] এস. ক্রাইমস্টম (S. Crimstom) বলেন: "নারী একটি অনিবার্য পাপ, একটি জন্মগত দুষ্ট প্ররোচনা। সমস্ত বর্বর পশুর মধ্যে নারীর মত ক্ষতিকর আর কিছুই নেই।"[২]

ড. অ্যাসপ্রিঙ্গ (Dr. Aspring) তাঁর গ্রন্থে মধ্যযুগে নারীজাতির উপর জঘন্য নির্যাতনের বিশদ বর্ণনা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন: "১৫০০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে নারী জাতির বিচারের জন্য একটি পরিষদ গঠিত হয়। ইহা নারীদের উপর নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতন চালানোর নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করে। এই আইনের বলে খ্রিস্টানগণ নব্বই লক্ষ জীবন্ত নারীকে অগ্নিতে দগ্ধ করে হত্যা করে। খ্রিস্টান সাম্রাজ্যে নারীদের প্রতি নিষ্ঠুর ও অবিচার বর্ণনাতীত।"[৩]

---

[১] সাইয়েদ আবুল'আলা মওদূদী, *পর্দা ও ইসলাম*, অনুবাদ, আব্বাস আলী খান। ঢাকা, ১৯৮০ খ্রি. পৃ. ১৭৬

[২] অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শামসুল হুদা, *নারীর অধিকার ও মর্যাদা*, ঢাকা, ১৯৯৫ খ্রি. পৃ.১৬।

[৩] Bible: *Genesis 3:* 16 (New York 1973), P.3

Dhaka University Institutional Repository

নারী জাতিকে অতীব হীন ও তুচ্ছ প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে য়াহূদী ও খ্রিস্টধর্মের প্রবল ভূমিকা রয়েছে। উভয় ধর্মই নারীকে পাপের আদি কারণরূপে আখ্যায়িত করেছে। বাইবেলে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত আছে, "নারীর পাপের দরুনই পুরুষকে তার উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার দেওয়া হয়েছে।"[১]

"I will greatly multiply your pain in child-bearing in pain you shall bear children; yet your desire shall be for your husband and he shall rule over you."

"গর্ভধারণে তোমাদের ব্যথা আমি অত্যন্ত বৃদ্ধি করে দেব। এই ব্যথায়ই তোমরা সন্তান প্রসব করবে। তথাপি তোমরা তোমাদের স্বামীর সংসর্গ কামনা করবে এবং সে তোমাদের উপর শাসন করবে।"[২]

য়াহূদী ও খ্রিস্টান ধর্মমতে নারীই গোটা মানবতার দুর্দশার কারণ। অতীতের বহু বিখ্যাত পাদ্রী প্রকাশ্যে নারীজাতির উপর দোষারোপ করেছেন এবং নারীকে দরকারী (Necessary evil) আপদ বলে অভিহিত করেছেন। আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিমেন্ট বলেছেন: "নারী বলেই তার লজ্জায় অবনত হয়ে থাকা উচিত।"[৩]

টারটুলিন তার লিখিত একখানি গ্রন্থে জনসাধারণের অনুভূতিকে রূপ দিয়েছেন যেখানে তিনি নারী জাতিকে "শয়তানের দ্বার, নিষিদ্ধ বৃক্ষের মোহর উন্মুক্তকারী, ঐশী আইনের প্রত্যাখ্যানকারী, খোদার প্রতিবিম্ব, মানুষের ধ্বংসকারী হিসেবে বর্ণনা করেছেন।"[৪] এইরূপে শতাব্দীর পর শতব্দী খ্রিস্টান জগত নারী জাতির হীনতা ও অমর্যাদা প্রচার করে আসছে। খ্রিস্টান ধর্মে বিবাহ ছিলো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্থায়ী পবিত্র বন্ধন-যা আমৃত্যু বলবৎ থাকবে।[৫] কিন্তু খ্রিস্টান জগতের শ্রেষ্ঠ অবতার ও খ্রিস্টধর্মের রচয়িতা সেন্টপল বিবাহকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পবিত্র ধর্মীয় বন্ধন বলে স্বীকার করেন না।[৬] আর একে তিনি স্বাভাবিক এবং সামাজিক জীবনের সম্মানজনক ও আনন্দদায়ক কিছু বলেও বিশ্বাস

---

[1] Ibid

[2] Libra: *Womanhood and the Bible,* (New York) P. 18. Cleugh, James; (London: Love Locked out, 1936), P. 264-265

[3] Nazhat Afza & Khurshid Ahmad, Ibid, P. 4

[4] Amer ali, *The spirit of Islam*, p: 307

[5] Ibid

[6] Klanser, *Joseph: From Jesus to Paul,* London, 1964, p. 571-572.

Dhaka University Institutional Repository

করেন না। বরং তিনি (Necessary evil) জরুরী পাপ হিসেসেই বিয়ের অনুমতি প্রদান করেছেন। তিনি বলেন:

"It is well for a man not touch a woman. It is well for a person to remain as he is. Do not seck marriage but if you marry. You do not sin and if a girl marries she does not sin. Yet these who marry will have worldly troubles. I want you to be free from anxieties. The unmarried man is anxious about the affairs of the lord, how to please the Lord; but the married man is anxious about wordly affairs how to please his wofe. I say this for your won benefit, not to lay any restraint upon tou, but to promote good order and to secure your undivided devotion to the lord."

"কোন নারীকে স্পর্শ না করাই পুরুষের জন্য ভাল। সে যেমন আছে, তদ্রূপ থাকাই তার জন্য উত্তম। বিয়ে করতে চেওনা। কিন্তু তুমি বিয়ে করলে তোমার পাপ হয় না এবং কোনো বালিকাও বিয়েতে পাপ করেনা। তবে যারা বিয়ে করে, তারা পার্থিব দুঃখকষ্টে পতিত হয়। সাংসারিক উদ্বেগ হতে মুক্ত থাক, এটাই আমি কামনা করি। অবিবাহিত পুরুষ ঈশ্বরের কাছে উদ্বিগ্ন। কীরূপে তাকে সন্তুষ্ট করা যাবে। কিন্তু বিবাহিত ব্যক্তি পার্থিব বিষয়ে উদ্বিগ্ন, কিরূপে তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করবে। আমি তোমার নিজ কল্যাণের জন্যই এই উপদেশ দিচ্ছি, তোমার উপর কোনো বাধা আরোপের জন্য নয়; বরং শৃঙ্খলা স্থাপন এবং প্রভুর প্রতি তোমার অবিভক্ত অনুরক্তি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই আমি এটা বলছি।"[১]

He that giveth her not in marriage doeth better."যে ব্যক্তি তার কণ্যাকে বিয়ে দেয়না, সে উত্তম কাজ করে।"[২]

ডেভিড এবং ভেরামেস (David and Veramace) তাদের বই ম্যারেজ ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট (Marriage East and West) -এ বলেন: "নারী হচ্ছে দোযখের দরজা। মানুষের সকল অশান্তির কারণ হচ্ছে নারী। নারী হয়ে জন্মেছে বলে তার লজ্জিত হওয়া উচিত। যেহেতু পৃথিবীর সব

---

[1] *Bible1 Corinthians*, 7, 1, 26, 28, 29, 32, 35.

[2] Ibid

Dhaka University Institutional Repository

অভিশাপের মূলে সে, সেহেতু সারাজীবন কৃচ্ছ সাধন করাই তার ব্রত। সে যে সুন্দরী তার জন্য সে যেন লজ্জিত হয়, কারণ শয়তানের হাতে তার সৌন্দর্য মানুষকে বিপথে নিয়ে যাওয়ার বড় হাতিয়ার।"[১]

সম্ভবত মধ্যযুগীয় রোমান আইন মোতাবেক বিবাহিতা মহিলাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আর কোনো সমাজই খ্রিস্টীয় মিশ্রণযুক্ত প্রচলিত সামাজিক বিধি-বিধানকে বাঁচিয়ে রাখেনি।[2] জনস্টুয়ার্ট মিল তাঁর Subjection of woman নামক প্রবন্ধে লিখেছেন: "আমাদেরকে বারবার বলা হয়েছে যে, সভ্যতা ও খ্রিস্টবাদ নারীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে। অথচ আমরা দেখি স্ত্রী স্বামীর সেবাদাসী ছাড়া কম কিছু নয়, অন্তত আইনের চোখে তারা ক্রীতদাসীই বটে।"[৩]

নারীর মর্যাদা সম্পর্কে কুরআন মজীদের বিধানগুলো উত্থাপনের আগে বাইবেলের কতিপয় প্রাসঙ্গিক বিধান এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করতে পারে। মূসায়ী বিধানে স্ত্রীকে বলা হয়েছ বাগদত্তা। বাগদত্তা কথাটি সম্পর্কে ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে: "বাগদান অর্থ হচ্ছে পরিশোধযোগ্য টাকায় স্ত্রীর দখলী স্বত্ব, আর বাগদত্তা স্ত্রী হলো সেই নারী, যার বাগদান মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে।" আইনের দিক থেকে বিয়ের বৈধতার জন্যে কনের মতামত নেওয়ার প্রয়োজন মনে করা হতো না। কনের মতামত গ্রহণ অপ্রয়োজনীয়। কারণ, আইনের কোথাও এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলা হয়নি।[8]

তালাক ও পুনঃবিবাহ

তালাকের অধিকার সম্পর্কে আমরা ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকাতে যে বিবরণ পাই তা হলো: "নারী যেহেতু পুরুষের সম্পত্তি, নারীকে তালাক দেওয়ার অধিকারও পুরুষের উপর স্বাভাবিকভাবেই বর্তায়।"[৫]

---

[১] গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামে নারী ও শিশু প্রসঙ্গ*, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ.৭

[2] Mass Devid Overa, *Marriage East and Eest,* New York, 1960, p. 81

[৩] Ibid, p.82-83

[4] *দি ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকা*, ভলিউম-৩, ১৯৫২ খ্রি., পৃ. ২৯৪২

[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪২

Dhaka University Institutional Repository

তালাকের অধিকার শুধু পুরুষের হাতেই ছিল। মূসায়ী বিধানে পুরুষেরই কেবল তালাক প্রদানের বিশেষ অধিকার রয়েছে।[১] খ্রিস্টীয় চার্চগুলো বর্তমান শতাব্দীর আগে পর্যন্ত মূসায়ী (আ) বিধান ও সমসাময়িককালের প্রচলিত সংস্কৃতিদ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ডেভিড ও ভেরাম্যাস তাদের 'বিবাহ পূর্ব ও পশ্চিম' নামক গ্রন্থে লিখেছেন:

"কেউ যেন মনে না করেন যে, আমাদের খ্রিস্টীয় ঐতিহ্য এ ধরনের অবজ্ঞাপূর্ণ বিবেচনা থেকে মুক্ত আছে। নারীদের মর্যাদাকে হীন করার জন্যে খ্রিস্টান পদ্রীদের মত এত অধিক পরিমাণ নজীর বোধকরি আর কোথাও পাওয়া কঠিন।"[২] প্রখ্যাত ঐতিহাসিক লেকী বলেন: এক শ্রেণীর পদ্রীর লেখায় এ ধরনের ভয়ংকর উদ্যোগ এত হাস্যকর ও প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে যে, নারীদেরকে নরকের দরজা এবং সকল প্রকার মানবীয় কুকর্মের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বলা হয়, পোশাকের ব্যাপারেও তার লজ্জিত হওয়া উচিত। কারণ এটা তার পতনের স্মৃতি বহন করে। বিশেষ করে তার সৌন্দর্যের জন্যও লজ্জিত থাকা উচিত। কারণ এটাই হচ্ছে পাপাচারের সবচাইতে শক্তিশালী উপাদান।

নারীদের উপর সবচেয়ে মারাত্মক আক্রমণ এসেছে Tertullion- এর মন্তব্যে: "তোমরা কি জান যে, তোমরা প্রত্যেকেই একেকজন হওয়া?[৩] তোমাদের উপর আল্লাহর এই দণ্ডাদেশ আজকের যুগেও প্রযোজ্য। এটা তোমাদের অদৃষ্টের দোষও বটে। তোমরা শয়তানী কর্মের প্রবেশ পথ। তোমরাই সেই নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণকারী ও আল্লাহর প্রথম আইন ভঙ্গকারী; তোমরা সেই নারী যে শয়তানকে প্ররোচিত না করলে সে একটুকু সাহসী হতো না। তোমরা খুব সহজেই আল্লাহ ও মানুষের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে। তোমাদের জন্যেই যে প্রতিফল মানব জাতিকে দেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ মৃত্যুর কারণে এমনকি আল্লাহর পুত্র যীশুকে[৪] ও মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে)।

---

[1] প্রাগুক্ত, ভলিউম-৩, পৃ. ২৯৪৭

[২] প্রাগুক্ত, ভলিউম-২৮, ১৯১১, খ্রি., পৃ. ৭৮২

[3] ম্যাস ম্যারেজ, ওয়েস্ট, পৃ. ৮০-৮১

[৪] তিনি পৃথিবীর প্রথম সৃষ্ট নারী। হযরত আদম (আ)-এর সুখ-শান্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে জীবন সঙ্গিণী হিসেবে তাঁর বাম পাঁজর হতে আল্লাহ পাক বিবি হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করেন। তিনি জীবন্ত সকল মানুষের আদি মাতা হাওয়ার কারণে তাঁকে 'হাওয়া' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আবদুল মান্নান খান, মুহাম্মদ কুরবান আলী, ইসলামিক স্টাডিজ, (ঢাকা, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৮৮ খ্রি.) পৃ. ১০৬।

Dhaka University Institutional Repository

খ্রিস্টান চার্চ নারীদের শুধুমাত্র হীনতম মর্যাদাই নিশ্চিত করেনি, নারী জাতি পূর্বে যেসব আইনগত অধিকার ভোগ করত সেগুলো থেকেও বঞ্চিত করেছে।[১]

তালাকের অধিকার সম্পর্কে ইনসাইক্লোপেডিয়াতে তালাকের সমর্থন দেখতে পাই। আবার বাইবেলে দেখতে পাই, খ্রিস্টান ধর্মের বিধান অনুসারে তালাকের অনুমতিই নেই।

"That the wife should not separate from her husband and that the husband should not divorce his wife."

"স্ত্রী তার স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন হবে না; আর স্বামীও তার স্ত্রীকে তালাক দেবে না।"[২]

"Who ever divorce his wife and marries another. Commits adultery aganist her; and if she divorces her husband and marries another, she commas adultery."

"যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অপর স্ত্রী গ্রহণ করে, সে তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে আর যে স্ত্রী নিজ স্বামীকে বর্জন করে অপর স্বামী গ্রহণ করে, সে ব্যভিচার করে।[৩] কিন্তু মতান্তরে খ্রিস্টান ধর্মে তালাক ও পুনঃবিবাহ অবৈধ নয়।"[৪]

গৃহের অভ্যন্তরে ও সমাজে স্ত্রীর স্থান

খ্রিস্টান ধর্মমতে নারী পাপের উৎস, এ ধারণাই তার মর্যাদার উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে। নারীর জীবনের পরম অবদান হলো পরিবারের প্রতি দরদ ও সর্তক দৃষ্টি এবং সহজে স্বামীর প্রতি

---

[১] হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে আল-কুরআনের সুস্পষ্ট উক্তি এরূপঃ "সে আমার নিয়ামতপ্রাপ্ত বান্দা ছাড়া অন্য কেউ নয়।" অন্যত্র বলা হেয়েছেঃ "আল্লাহর কাছে ঈসা (আ)-এর উদাহরণ হচ্ছে আদম (আ)- এর অনুরূপ। আল্লাহ তাঁকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে।" অতএব এ আয়াত এবং এ ধরনের অন্যান্য আয়াত থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ঈসা (আ) আল্লাহ তা'আলার মনোনীত বান্দা এবং তাঁর সৃষ্ট। অতএব "তিনি উপাস্য, তিনি আল্লাহর পুত্র" খ্রিস্টানদের এসব দাবি সম্পূর্ন বানোয়াট। পবিত্র কুরআনুল করীম বাংলা অনুবাদ, মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, পৃ. ১৬৪।

[২] খুরশিদ আহমদ, *ইসলামের আহবান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩।

[3] Bible. 7: 10-11

[4] Ibid, Mark 10: 11-12.

Dhaka University Institutional Repository

বশ্যতা স্বীকার। স্বামীর একান্তে অধীন হয়ে থাকা ও নিজকে স্বামী হতে হীন বলে মেনে নেওয়াই ছিলো তার পরম সাফল্য।[১]

"The head of every man is Christ, The head of a woman is her husband."

"প্রত্যেক পুরুষের অধিকর্তা হলেন যীশু; নারীর অধিকর্তা তার স্বামী।"[২]

নারী সমাজের বহির্ভূত ছিলো এবং তাকে একান্তভাবে স্বামীর অনুগত হয়ে থাকতে হত।

"Let a woman learn is silence with all submissiveness. I permit no woman to leach or to keep silent. For Adam was not deceived, but the woman was deceived and became a transgressor."

"পূর্ণ আনুগত্যের সাথে নারী নীরবে শিক্ষা লাভ করবে। পুরুষকে শিক্ষাদান অথবা তার উপর কর্তৃত্ব করার অনুমতি আমি কোনো নারীকেই দেইনি; সে নির্বাক থাকবে। কারণ, সর্বপ্রথম আদম সৃষ্টি হয়েছিলেন, তৎপর হাওয়া এবং আদম প্রতারিত হয়নি; বরং হাওয়াই প্রতারিত হয়েছিলেন ও নির্দেশ ভঙ্গ করেছিলেন।"[৩]

নির্জনে থেকে নারী সূতা কাটবে, বস্ত্র বুনবে ও রান্না করবে। কিন্তু অপরিহার্য কারণে তাদেরকে বের হতে হলে তারা অবশ্যই পর্দা পরিধান করবে।[8]

"Let her wear a veil. For a man ought not cover his head, since he is the image and glory of God; but woman is the glory of man. For man was not made from woman, but woman from man. Neither was man created for woman, but woman for man. That is why a woman ought to have a veil."

"নারী পর্দা পরিধান করবে যেহেতু পুরুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি গৌরব। এজন্য তার মস্তক আবৃত করা উচিত নয়। কিন্তু নারী পুরুষের গৌরব। কারণ পুরুষ নারী হতে সৃষ্টি হয়নি; বরং নারী পুরুষ হতে

---

[1] আবদুল খালেক, নারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

[2] Bible-1: Corinthiaus, 11:3.

[3] Ibid: Timothy, 3:11-13.

[4] Ibid: Timothy, 2: 11-14.

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টি হয়েছে। আর পুরুষ নারীর জন্য সৃষ্টি হয়নি; কিন্তু নারী পুরুষের জন সৃষ্টি হয়েছে। এ জন্যই নারীকে পর্দা পরিধান করতে হবে।"[১]

সেন্টপলের শিক্ষা নারীদেরকে ধর্মানুষ্ঠান হতে বের করে এনেছে এবং এজন্যই গীর্জায় গমন তাদের উচিত নয়। সেন্টপল নারীদেরকে কলরবকারী ও মূর্খ বলে ধারণা করতেন। এজন্য তিনি তাদেরকে ধর্ম-প্রচার ও ধর্ম বিষয়ে অভিমত প্রদানের অনুমতি প্রদান করেননি।

"The woman should keep silence in the churches. For they are not permitted to speak; should be subordinates as even the law says, if there is anything they desire to know, let them ask their husbands at home. For it is shameful for a woman to speak in church."

"নারীরা গীর্জায় নীরব থাকবে। কারণ তাদেরকে কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয়নি; তারা অধীন হয়ে থাকবে। এটা আইনেরও নির্দেশ। তারা কোনো কিছু জানতে চাইলে বাড়িতে তাদের স্বামীদেরকে জিজ্ঞেস করে নেবে। কারণ গীর্জায় কথা বলা নারীর পক্ষে লজ্জার বিষয়।"[২]

খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে খ্রিস্টানদের এক ধর্মীয় কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এত সাব্যস্ত হয়, নারীর আত্মা নেই (Woman has no soul) এবং দোযখ হলো তার বাসস্থান, এর ব্যতিক্রম হলো কেবল হযরত ঈসা (আ)- এর মাতা হযরত মরিয়ম (আ)।

নারী মানুষ কিনা এ বিষয় আলোচনার জন্য পরবর্তী শতাব্দীতে তাদের অপর একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এতে সিদ্ধান্ত হয়, নারী মানুষ বটে তবে পুরুষের কল্যাণ ও দাসত্বের জন্যই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।[৩] প্রচীন ভারতে পুরুষ নারীকে দাসীর মত রাখত এবং স্বামীকে প্রভু বা ঈশ্বর বলে সম্বোধন করতে হত। অতএব মনু নারী সম্পর্কে যে উক্তি করেছিলেন, খ্রিস্টধর্মেও এর কোনো ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে না। বরং উভয় জাতি একই ধারণা পোষণ করেছে।

---

[1] আবদুল খালেক, *নারী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

[2] Bible: Corinthiaus, 11:3.

[3] Bible: Corinthiaus. 14: 34-35.

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধ ধর্মে নারীর অধিকার ও মর্যাদা

বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা হলো নারীর সাহচর্যে নির্বাণ লাভ করা চলে না। এটা হতেই বৌদ্ধধর্মে নারীর মর্যাদা সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যায়। বিয়ে ও এর আনুষাঙ্গিক যাবতীয় কার্য-কলাপ বৌদ্ধধর্মের চরম লক্ষ্যের পরিপন্থি। এর লক্ষ্য হলো সকল বাসনা-কামনার বিলোপ সাধন। সুতরাং এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার সাধনার ক্ষেত্রে চির কৌমার্য নিতান্ত আবশ্যক।[1] বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর মতে, নারী হলো সকল অসৎ প্রলোভনের ফাঁদ। এর বর্ণনা দিতে যেয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ওয়েস্টার মার্ক (Westermark) বলেন: "Woman are of all snares which the tempter has sperad for men the must dangerous; in woman are embokied all the power of infatuation which bling the mind of the world."

"মানুষের মধ্যে প্রলোভন যতগুলো ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে, তন্মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনী শক্তি অঙ্গীভূত হয়ে আছে যা সমগ্র বিশ্বমন অন্ধ করিয়ে দেয়।"[2]

নারী সম্পর্কে এক বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিতের ধারণা ব্যক্ত করতে যেয়ে বেটনী (Bettany) তাঁর World's Religions গ্রন্থে বলেন:

"Unfathomably deep, like a fish's course in the water, is the character of women, robed with many artifices, with whom truth is hard to find, to woman a he is like the truth and truth is like a lie."

"পানিতে মাছের গতিপথের গভীরতা যেমন নির্ণয় করা সম্ভব নয়, নারীর চরিত্র হলো তেমনি নিবিড় যা বহুবিধ ছলনায় আচ্ছাদিত। তার মধ্যে সত্য পাওয়া দুষ্কর। তার নিকট মিথ্যা সত্য সদৃশ এবং সত্য মিথ্যাসম।"[3]

পারস্যের জগৎ বিখ্যাত সম্রাট নওশেরওঁয়ার পিতা কোবাদের সময় বিখ্যাত মজদকের অভ্যুত্থান ঘটে। বিদ্রোহী মজদক ঘোষণা করেন যে, "যন, যামিন ও জর-তথা কামিনী, কাঞ্চন ও ভূমি নিয়েই যখন মানুষ বিবাদ বিসম্বাদ ও পাপে লিপ্ত হয় তখন কোনো প্রকার বিচার-বিবেচনা না করে নিয়ম করতে

---

[1] আবদুল খালেক, *নারী*, পূর্বোক্ত, পৃ.১৪

[2] U. May Oung, Buddhist law, part 1.p.2.

[3] Nahzt Afza and Dhurshid Ahmad: P. 12-13.

Dhaka University Institutional Repository

হবে যে, স্ত্রীলোকমাত্রই পুরুষের উপভোগ্য, বিবাহের বন্ধন বা আত্মীয়তার বিধি-নিষেধ, এমনকি নারীদের সম্মতি বা অসম্মতি এই শয়তানি ভোগবিলাসে কোনো প্রকার বিঘ্ন ঘটাতে পারবে না। সম্রাট কোবাদ মজদকের এই ঘৃণিত প্রস্তাব সমর্থন করেন।[১] পারস্যবাসিগণ এর কুফল ভালভাবেই ভোগ করেছিল।

মূসা (আ)- এর আবির্ভাবের পূর্বে ইসরাঈলীদের মধ্যে বহু বিবহ প্রচলিত ছিল। তারা একজন হিব্রু স্বামী কয়টি স্ত্রীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে সে বিষয়ে কোনো সীমা নির্ধারণ না করেই এ প্রথা অনুসরণ করত। পরবর্তীকালে জেরুজালেমের ধর্মীয় যাজকগণ স্বামীর পক্ষে যথাযথভাবে স্ত্রীর ভরণপোষণের শক্তির উপর স্ত্রী গ্রহণের সংখ্যা নির্ধারিত করেছিল। যদিও য়াহূদী পুরোহিতরা উপদেশ দিতেন যে, চারটির বেশি স্ত্রী গ্রহণ করা যাবে না। তবু কেরাতিরা তাদের সঙ্গে একমত ছিলেন না এবং সীমা-নির্ধারণের বৈধতা স্বীকার করতেন না। ধর্ম পারসিকদেরকে বহু বিবাহের জন্য উৎসাহিত করত।[২]

য়াহূদী ধর্মমতে

য়াহূদী ধর্মমতে নারীর উপর সৃষ্টিকর্তার চিরন্তন অভিশাপ রয়েছে। এ ধর্মমতে নারী হতেই পাপের সূত্রপাত হয় এবং তার কারণেই সকলের ধ্বংস অনিবার্য। কারণ নারীই সকল দুর্নীতির উৎস। য়াহূদী সমাজে নারীর কোনো মর্যাদা ছিলো বলে গণ্য করা হত না এবং সে পুরুষের অস্থাবর সম্পত্তিরূপেই পরিগণিত হত।[৩] য়াহূদী সমাজে নারী পুরুষ হতে অতি নিকৃষ্ট। এমনকি মর্যাদায় নারী চাকরদের অপেক্ষাও নিম্নস্তরের বলে গণ্য হত। ভাই থাকলে সে পিতা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারতো না এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় কণ্যাকে বিক্রি করার পূর্ণ অধিকার ছিল।[৪] বিবাহিতা স্ত্রীর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হত স্বামী। স্বামীকে অপর মহিলার সাথে শায়িত দেখলে য়াহূদী স্ত্রীকে অভিযোগ না করে চুপ থাকতে হয়। কারণ স্বামীর যা ইচ্ছে তাই করার অধিকার তার ছিল। সামাজিক প্রার্থনায় দশজন

---

[১] আবদুল খালেক, *নারী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

[2] ভলিজার, *দি ডেন্টইন এন্ড দি জিই*, পৃ. ৪০৫, ৪০৬

[3] এফ এম আবদুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩

[4] *The Encyclopaedia of Britanica,* Vol. V, P. 732.

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষের উপস্থিতি জরুরী ছিল। কিন্তু নয়জন পুরুষ এবং বহু নারী উপস্থিত থাকলেও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হত না। কারণ নারী মানুষরূপে পরিগণিত ছিলো না।[১]

ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে য়াহূদী নারী

য়াহূদী সমাজে বিয়ে ছিলো ব্যক্তিগত ব্যাপার। সুতরাং এইজন্য রাষ্ট্র ও ধর্মের অনুমতির প্রয়োজন ছিলো না। বাস্তবে এটা ছিলো এক প্রকার ব্যবসা। তখন যৌতুকের গুরুত্ব এত বেশি ছিলো না।[২] সন্তান উৎপাদনই ছিলো বিয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। কাজেই সন্তান জন্মদান ব্যতীত দাম্পত্য জীবনের দশ বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেলেও স্বামী বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারতো বা সে দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারত। বিভিন্ন প্রকারের বিয়ে তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিলো এবং কয়েক প্রকার ব্যতীত সবগুলিরই বিচ্ছেদ হতে পারত।[৩] বিয়ের পূর্বে কৌমার্য ও বিয়ের পর দাম্পত্য জীবনে সততা-সাধুতা ছিলো বিয়ের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নারীদের উপর সতীত্ব রক্ষার জোর তাকিদ ছিলো এবং বিয়ের সময় সতীত্ব প্রমাণ করতে না পারলে বালিকাদেরকে প্রস্তাঘাতে মেরে ফেলা হত।[৪]

বাগদত্তা বা বিবাহিত নারী পরপুরুষের দ্বারা বলপূর্বক ধর্ষিতা হলে ধর্ষণের সময় সাহায্য চেয়ে চিৎকার না দিলে সে জীবনের অধিকার হারিয়ে ফেলত এবং প্রস্তারাঘাতে হত্যাই ছিলো তার শাস্তি। ধর্ষিতা কুমারী হলে ধর্ষণকারীর সাথে বিয়েই ছিলো এর বিধান।[১০]

মাতাপিতা কণ্যাদেরকে বিয়েতে বাধ্য করত না। কিন্তু তাদেরকে বিয়ে দেওয়া কিংবা কারও নিকট বিক্রি করে ফেলার আইনসঙ্গত অধিকার পিতার ছিল।[৫] বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এটা ছাড়াও স্বামী যত ইচ্ছা উপপত্নী রাখতে পারত। তদুপরি অবিবাহিতা দাসী এমনকি অন্যের বিবাহিতা নারীদের সাথে যৌন সম্পর্কে স্থাপনের অধিকারও তার ছিল। এসব কাজ করেও সে ব্যভিচারী বলে গন্য হত না।[৬] স্বামীর তালাক দেওয়ার অধিকার ছিল। কিন্তু স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ

---

1 আবদুল খালেক, *নারী*, পূর্বোক্ত, পৃ.৮

2 Shaner, Donald W: *A Christian View of Divonce* (Leiden 1969), P. 31.

3 *Report of the commission, Marriage, Divorce and the Church,* London-1971 P. 80.

4 Ibid, 22:23-25, 28-29.

5 *The Jewish Encyclopaedia,* Vol-XII, P-556.

6 Pospishil, Victor: *Divorce and Marriage,* London, 1987, P.38.

Dhaka University Institutional Repository

করলে সে চিরকালের জন্য সেই স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ক্ষমতা হতে বঞ্চিত হত। বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত হলে নারী অপর স্বামী গ্রহণ করতে পারত।[১]

বৌদ্ধ ধর্মে নারী

বৌদ্ধ ধর্ম মতে, নারী হচ্ছে মোহের বাস্তব রূপ এবং মানবাত্মার নির্বাণ লাভের সবচেয়ে বড় বাধা। সুতরাং নারীকে বিসর্জন দিয়ে নির্জন পাহাড়-পর্বতে ধ্যানমগ্ন হওয়াই মুক্তি লাভের একমাত্র উপায়।[২] এ ধর্মানুসারীরা তাই বিশ্বাস করেন, নারী হলো সকল অসৎ প্রলোভনের ফাঁদ।[৩] এ কথার সূত্র ধরেই বৌদ্ধ ধর্মে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক Westmark বলেন, 'Women are of all the snares which the tempter has spread for men, the most dangerous; in women are embodied all the powers of infatuation which blind the mind of the world.[৪] অর্থাৎ মানুষের জন্য প্রলোভনের যতগুলো ফাঁদ বিস্তার করে রাখা হয়েছে, তার মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপদজনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনী শক্তি অঙ্গীভূত হয়েছে যা মানুষের মনকে অন্ধ করে দেয়।

নারী সম্পর্কে এক বিখ্যাত বৌদ্ধ পন্ডিতের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে Bettany তার World's Religions' গ্রন্থে বলেন, 'Unfathomably deep, like a fish's course in the water, in the character of women, robed with many artifices, with whom truth is hard to find, to whom a lie is like the truth and the truth is like a lie.[৫] 'পানিতে মাছের গতিপথের গভীরতা নির্ণয় করা যেমন অসম্ভব, নারীর চরিত্র হলো তেমনি নিবিড়– যা বহুবিধ ছলনায় আচ্ছাদিত। তার মধ্যে সত্য পাওয়া দুষ্কর, তার নিকট মিথ্যা সত্যের মতো এবং সত্য মিথ্যার সমান।'

---

[1] Shanar, Donaldw; P. 31.

[২] বিমান চন্দ্র বড়ুয়া, *বুদ্ধের কল্যাণবাদ : একটি প্রায়োগিক বিশ্লেষণ*, দর্শন ও প্রগতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২৪ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন–ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ.১৭৯

[3] বিমান চন্দ্র বড়ুয়া, পূর্বোক্ত, পৃ.১৭৮

[৪] উদ্বৃতি: কাজী আবদুর রউফ, *মানুষ ও সংস্কৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃ.৮৮

[5] *Bettany, World's Religions,* London, 1969, pp.34-37

Dhaka University Institutional Repository

ইহুদি ধর্মে নারী

Encyclopedia Britannica-তে বলা হয়েছে, ইহুদি ধর্ম মতে নারীর ওপর সৃষ্টিকর্তার চিরন্তন অভিশাপ রয়েছে এবং নারী সকল পাপের মূল উৎস।[1] ইহুদি সমাজে নারী ছিলো ব্যক্তির অস্থাবর সম্পত্তি। পুত্র থাকলে কোনো কন্যা তার পিতার সম্পদের উত্তরাধিকারী হতে পারতো না। কেবল কোনো পুত্র সন্তান না থাকলেই নারী উত্তরাধিকারী হতে পারতো, তবে সে ক্ষেত্রেও কড়াকড়ি আরোপ করা হতো যে, এমন কন্যারা নিজ গোত্র ছাড়া অন্যগোত্রে বিয়ে করতে পারবে না এবং কোনোভাবেই সম্পদ অন্য কোনো গোত্রের কাছে হস্তান্তর করতে পারবে না। অপ্রাপ্ত বয়স্ক কন্যাকে বিক্রি করার অধিকার ছিলো পিতার। কোনো মেয়ে পৈত্রিকসূত্রে যদি কোনো সম্পদ পেতো তাহলে সেগুলোর মালিক হতো তার স্বামী। তবে মাতা-পিতা তাদের মেয়েদের বিয়ে করতে বাধ্য করতো না। মেয়েরা বিয়ের ক্ষেত্রে তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারতো। এমনকি বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা হলেও তারা আবার বিয়ে করতে পারতো।[2]

আধুনিক বিশ্বে ইহুদিধর্মভিত্তিক সভ্যতায় নারীর এ দৈন্যদশা অব্যাহত রয়েছে। নারীকে যে কোন স্বার্থ আদায়ের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের হীনমন্যতা ইহুদি ধর্মাবলম্বিদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়।

ইসলামে নারী

বস্তুত বিশ্ব মানবতার মুক্তির শাশ্বত আহ্বান ইসলাম নিয়ে মহান আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (স)এর আগমণের পূর্বে পৃথিবীর কোথাও নারীর মর্যাদা ও অধিকার স্বীকৃত ছিলো না। এ সময়ে আরবে নারীকে বিবেচনা করা হতো সন্তান প্রজননকারী যন্ত্র ও ভোগ্য পণ্য হিসেবে। যে জন্যে যখন-তখন লুণ্ঠিত হতো নারীর ইজ্জত। নির্বিঘ্নে নারীদেহকে পুঁজি করে নির্লজ্জ বেশ্যাবৃত্তির ঘৃণিত ব্যবসা চালাতো প্রভাবশালী আরবরা। যে কারণে কন্যা-সন্তানের জন্ম আরববাসীর কাছে মর্যাদাহানীর এক কলঙ্কজনক ঘটনা ছিল। এ অপমান ও অমর্যাদার হাত থেকে

---

[1] *Encyclopaedia of Britanica,* Vol-4, p-418

[2] আবদুল হাফিয, *মৌলিক সংস্কার ও মানব সমাজ*, মুক্তধারা ১৯৭৫, পৃ.১২৪

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তি পাওয়ার জন্য মেয়ে শিশু জন্ম নিলে সাথে সাথে তাকে জীবিত কবর দেওয়া হতো। এদিকে ঈঙ্গিত করেই কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন,

وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ - بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

"যখন জীবিত কবর দেওয়া মেয়েকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?"[1]

পিতা বা স্বামীর সম্পদে নারীর কোনো অধিকার ছিলো না। সকল সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত নারীকে প্রকাশ্য বাজারে বিক্রি করা হতো পণ্য-দ্রব্যের মতো।

রাসূলুল্লাহ (স)এর আবির্ভাবের পূর্বে আইয়ামে জাহিলিয়া যুগে আরবে নারী জাতির অবস্থা ছিলো অত্যন্ত শোচনীয়। সেখানে বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদের কোনো নিয়ম ছিলো না। যে কারণে আরবের নারীদের বিয়ে ও তালাকের সংখ্যার কোনো সীমা ছিলো না। এমনকি এক নারীকে একই সময় একাধিক পুরুষ পর্যন্ত বিয়ে করতো। ওয়ারিশসূত্রে তারা কোনো সম্পদ পেতো না। তারা ছিলো সকল ধরনের অধিকার বঞ্চিত অসহায় এক জাতি। বিয়ে থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে নারীকে সে সময় ভোগ্য পণ্য মনে করা হতো। অন্ধকার যুগে আরব দেশে ওয়ারিশরা পরিত্যক্ত অন্যান্য অস্থাবর সম্পদের মতো মৃতের স্ত্রীকে যবরদখল করে নিত।[2]

রাসূলুল্লাহ (স)এর আবির্ভাগের পূর্বে সংসার জীবনে নারীর কোনো অধিকার ছিলো না। স্বামীরা যখন-তখন বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে পারতো এবং বিয়ে ভেঙে দেয়ার সময় স্ত্রীকে দেওয়া সকল সম্পদ স্বামীরা ফিরিয়ে নিত। বিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে নারীর মতামতের কোনো তোয়াক্কা করা হতো না। পিতা বা ভাই কিংবা অন্য কোনো পুরুষ অভিভাবক নারীর ওপর যে কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিত। ক্রীতদাসী হিসেবে নারীরা প্রকাশ্য বাজারে বিক্রি হতো। অভিজাত আরবরা ক্রীতদাসীদের দিয়ে দেহব্যবসা পরিচালনা করতো। সম্পদে, সমাজে, ধর্মে-কর্মে, শিক্ষায় নারীর কোনো অধিকার স্বীকৃত ছিলো না।[3]

রাসূলুল্লাহ (স)এর আবির্ভাবের পূর্বে আরবে নারী নিগ্রহের উদ্দেশ্যে বহু বিয়ে, অসম বিয়ে এমনকি সৎমাকে পর্যন্ত স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার রীতি ছিল। কুরআন মজীদে জঘন্য এ প্রথার কথা উল্লেখ করে

---

[1] আল-কুরআন, সূরা তাকভীর, আয়াত: ৮-৯

[2] ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *আস-সীরাতুন নববীয়া*, ঢাকা ২০১২, পৃ.১২

[3] প্রাগুক্ত, পৃ.১৩

Dhaka University Institutional Repository

মহান আল্লাহ বলেছেন, "নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃগণ যাদের বিবাহ করেছে, তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না; অতীতে যা হয়ে গিয়েছে তা নিশ্চয়ই অশ্লীল, অরুচিকর ও নিকৃষ্ট আচরণ।[১]

এ যুগে যুদ্ধে অংশ নিতে এবং লুণ্ঠন ও উপার্জনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিতে পারতো না বলে সম্পদের মালিকানা থেকে নারীকে পুরোপুরি বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। এ সময়ে আরবে শক্তিশালী লোকেরা দুর্বলদের স্ত্রী-কন্যা ছিনিয়ে নিয়ে ক্রীতদাসী বানাতো বা প্রকাশ্য বাজারে বিক্রি করতো। মক্কার কা'বা ঘরের চারপাশে নারীদেরকে নগ্ন হয়ে তওয়াফ করতে বাধ্য করা হতো। বিভিন্ন মেলায় লোকসমক্ষে নারীকে ব্যভিচারে বাধ্য করা হতো।[২]

নারীর প্রতি অব্যাহত নিপীড়ন এবং অমানবিক ও অমর্যাদাকর এ জাতীয় আচরণের কারণে আরবের লোকেরা কন্যা শিশুর জন্মকে অপমানকর বিষয় মনে করতো এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কন্যা শিশু জন্ম নেয়ার পর তাকে জীবন্ত কবর দিয়ে ফেলতো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ - يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ

"তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তান জন্মের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহ্য মনঃকষ্টে পতিত হয়। তাকে (কন্যা সন্তান হওয়ার) যে সুসংবাদ দেওয়া হয় তার লজ্জায় সে নিজের দলের লোকদের নিকট থেকে পালিয়ে বেড়ায়। সে চিন্তা করে, লজ্জার কারণ হওয়া সত্ত্বেও সে তার কন্যা-সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখবে, না কি মাটিতে পুঁতে ফেলবে! জেনে রেখো! তারা কতই না মন্দ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।"[৩]

মহানবী (স)এর আবির্ভাবের পূর্বে আরবে নবজাত কন্যা সন্তানকে বিভিন্ন প্রকারে হত্যা করা হত। কেউ কেউ গর্ত খনন করে তাতে কন্যা শিশুকে জীবন্ত পুঁতে দিতো। কেউ কেউ খুব উচ্চস্থান হতে তাদেরকে নীচে নিক্ষেপ করতো; আবার কেউ কেউ তাদেরকে পানিতে ডুবিয়ে মারত বা কেটে ফেলত। এ সকল নির্যাতনের কারণে নারী মৃত্যুর নিকট আত্মসমর্পন করতো যেন এরূপ মৃত্যুবরণের জন্যই তার জন্ম হয়েছে। স্ত্রী কন্যা সন্তান জন্ম দিলে আরবগণ সমাজের ভয়ে তা গোপন রাখত,

---

[১] আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত: ২২

[2] ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *আস-সীরাতুন নববীয়া*, পূর্বোক্ত, পৃ.১৫

[3] আল-কুরআন, সূরা নাহল, আয়াত: ৫৮-৫৯

Dhaka University Institutional Repository

কারণ তাদের বিবেচনায় এটি ছিলো ভীষণ পাপ এবং স্থায়ী অমর্যাদার মাধ্যম। এমন নৃশংস ও বর্বর ব্যবহারে নারীদের অধিকার হরণ করা হত যেন তারা কসাই খানায় নীত হওয়ার উপযোগী নির্বাক পশু ছিল।[1]

রাসূলুল্লাহ (স) ইসলাম নিয়ে আরবে আর্বিভাবের অব্যবহিত পূর্বে আরবে নারীদের অবস্থা কেমন ছিলো সে সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে, ইতিহাসবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীগণের বিশ্লেষণে। ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীগণের প্রত্যেকে বলেছেন, ইসলামের আবির্ভাবের আগে আরবে নারীদের অবস্থা অত্যন্ত দুঃখজনক ছিল। তারা মানবরূপে পরিগণিত ছিলো না। পুরুষ ও জীবজন্তুর মধ্যস্থলে ছিলো তাদের অবস্থান। কন্যা-সন্তানের জন্ম সে দেশে এক চরম অভিশাপ বলে গণ্যহত।[2]

আল-ইসলাম রুহুল মাদানিয়্যাহ গ্রন্থে শায়খ মুস্তফা আল-গালায়ীনী বলেন, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পুরুষের অধিকৃত বিষয়-সম্পদের মধ্যে নারীও থাকত এবং তার সাথে পশুর মত আচরণ করা হত। নারীর মর্যাদা এত নীচ ছিলো যে, তাদের তুলনায় পশুর প্রতি অধিকতর সুনজর দেওয়া হত। সে এমন নিদারুণ অবস্থায় নিপতিত ছিলো যে, দুনিয়ার অপর কোনো জাতিই আরবদের ন্যায় নারীদেরকে এত অধিক অপমান ও নির্যাতন করতো না। কন্যা সন্তান জন্মকে আরবগণ কুলক্ষণ ও অপমানজনক বলে মনে করতো। নবজাত কন্যা সন্তান হত্যার নীতি বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। তাকে জীবন্ত কবর দিয়ে হত্যা করা হত। পণ্যদ্রব্যের মত তাদেরকে বিক্রয়ও করা হত এবং পশুর বদলে তাদেরকে বিনিময় করা হত।[3]

465996

আরবদের সমাজে যেখানে যুদ্ধবিগ্রহ তাদের নিত্যদিনের প্রধান কর্ম ছিল, সেখানে নারীদের ব্যাপারে তাদের এই বিরূপ মনোভাব ছিলো স্বাভাবিক। কারণ যুদ্ধ বিগ্রহে জয়–পরাজয় গোত্রীয় মানমর্যাদার মানদণ্ড ছিল। অথচ যুদ্ধে নারীরা ততটা কাজে আসত না যতটা কাজে আসত বিভিন্ন ধরনের পশু। উপরন্তু নারীরা শত্রু পক্ষের লোভনীয় লক্ষ্য বস্তু ছিল। শত্রুরা তাদের মেয়েদের ক্রীতদাসীতে পরিণত করে তাদের সেবা এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহারও করতো। এভাবে মেয়েরা ছিলো গোত্রের জন্যে এক স্থায়ী বোঝা। কেননা সব সময় মেয়েদের নিরাপত্তার বিষয়টি তাদের দুশ্চিন্তার কারণ ছিল।

[1] আব্দুল খালেক, *নারী*, ঢাকা-১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১৬

[2] মোঃ হাসান আলী চৌধুরী, *ইসলামের ইতিহাস*, আইডিয়াল লাইব্রেরি, ঢাকা ১৯৯৬, পৃ.৪

[3] মুস্তফা আল-গালায়ীনী, *আল-ইসলাম রুহুল মাদানিয়্যাহ*, বৈরুত ১৯৯৫, পৃ.৩২

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কারণ এক গোত্রের নারীকে অন্য গোত্রের লোকেরা ধরে নিয়ে ক্রীতদাসী বানালে বা তার সঙ্গে সঙ্গম করলে আরবের গোত্রগুলো পরাজিত হওয়ার মত অপমানকর বিষয় মনে করত। নারীর কারণে এ সম্ভাবনা সবসময় বিদ্যমান থাকত বলে নারীকে আরবের লোকেরা ক্ষতির মাধ্যম বলে মনে করত।[১]

সুশৃঙ্খল সমাজ জীবন সম্পর্কে প্রাচীন আরবদের কোনো জ্ঞান ছিলো না। তারা বিভিন্ন গোত্রে ও বংশে বিভক্ত হয়ে যাযাবররূপে বসবাস করতো। গোত্রে গোত্রে তাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত। এ সকল যুদ্ধে বিজয়ী পক্ষ বিজিত পক্ষের নারীদেরকে ধরে নিয়ে বিয়ে করতো। এভাবে অপমানিত হওয়ার জন্য আরবগণ কন্যা সন্তানদের জন্মকে ভয় ও ঘৃণা করতো এবং পুত্র সন্তান জন্মকে পছন্দ করতো। কারণ পুত্র সন্তান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও যুদ্ধের ময়দানে সাহায্যকারী হত। এ লজ্জা ও অপমান থেকে বাঁচার জন্যই তারা নারী শিশুকে জীবিত কবর দিয়ে হত্যা করতো।"[২]

This revolting custom prevailed extensively until it was supresyed by Muhammad peace be on him.[3]

"অজ্ঞতার যুগে পিতার মৃত্যুর পর তার পুত্র মাতার উত্তরাধিকারী হত। সে নিজেই তাকে বিয়ে করতে পারত। অথবা নিজ ইচ্ছানুসারে যে কোনো লোকের নিকট বিয়ে দিতে পারতো আর সে তার বিয়ে বন্ধও করতে পারত। মাতা অন্য স্বামী গ্রহণ করতে চাইলে, পুত্রকে মুক্তিপণ দিতে হত।[৪]

আরব রমণীদের স্বামী নির্বাচনের কোনো অধিকার ছিলো না। পিতা বা তার কোনো পুরুষ আত্মীয়ের তার স্বামী নির্বাচনের পূর্ণ ক্ষমতা ছিল। মুতআ বিয়ে[৫] এবং বহুপতি গ্রহণের প্রথা ও তৎকালে আরবে প্রচলিত ছিল। আরববাসী তার বৈমাত্রেয় বোন, বিমাতা, এমনকি তার বিধবা পুত্র বধূকেও বিয়ে করতে পারত। ভ্রাতার মৃত্যুর পর ভ্রাতৃবধূকে বিয়ে না করেই স্ত্রীরূপে ব্যবহার করতে পারত।[৬]

---

[১] প্রফেসর মোহাম্মদ নূরনবী, *মুসলমানের ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, ঢাকা ২০০৯, পৃ.১৬

[2] Rustum and Zurayk, *History of the Arabs and Arabic culture*, Beirut, 1940, p.36.

[3] O'lerry, De lacy: *Arabia before Muhammad*, London 1927, p.202.

[4] Said Abdullah Seif Al-Hatimy, Ibid, p-15.

[৫] নারী পুরুষের মধ্যে চুক্তিতে নির্ধারিত সময়ের জন্য বিয়ে।

[6] Jones Beven, *Woman in Islam*, Luckhnow; 1951, p.23,28,18-21, W. Smith, *Kinshipant marriage in Early Arabia*, London 1907, p.91-92; Jamshid Katrak,

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত স্ত্রীর উপর স্বামীর অপ্রতিহত কর্তৃত্ব নারীর মর্যাদা একেবারে হীন করে দিয়েছিলো এবং নারী তার স্বামীর ভূ-সম্পত্তি ও লাখেরাজ সম্পদরূপে পরিগণিত হত। জগতের তৎকালীন সভ্যতায় যেমন বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, তদ্রুপ আরবেও বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। একজন পুরুষ কতজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে সরকারি আইন, সামাজিক রীতি নীতি ও ধর্মের বিধানে এর কোনো সীমা নির্ধারিত ছিলো না; বরং সামর্থ থাকলে যে যত খুশি, বিয়ে করতে পারত।[১]

তখনকার আরবে প্রতিষ্ঠিত পতিতালয় না থাকলেও নারী পুরুষের মধ্যে শর্তাধীনে ও অস্থায়ীভাবে নির্দিষ্টকালের জন্য পতি-পত্নী সম্পর্ক অবাধেই স্থপিত হতে পারত। এতদ্ব্যতীত সমাজে নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে পেশাধারী নর্তকী ও গায়িকা ছিল। তারা অবাধে পুরুষদের সাথে মেলামেশা করতো এবং তারা মর্যাদাপূর্ণ স্থানে অধিষ্ঠিত আছে বলে জনগণ মনে করতো।[২]

এমনিভাবে নারী পুরুষের নিকট হস্তচালিত যন্ত্রের ন্যায় ছিলো যা সে নিজ খেয়াল-খুশি মত ব্যবহার করে থাকে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর পয়গাম ও কুরআন মজীদের অমিয় বাণী নিয়ে আগমনের পূর্ব পর্যন্ত নারীদের উপর এরূপ অমানুষিক নির্যাতন চলছিল। এ সময় কোনো পুরুষ তার স্ত্রীকে রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হলে স্ত্রীটির কোনো পুরুষ আত্মীয় স্ত্রীটিকে স্বীয় চাদর দ্বারা ঢেকে ফেলত যেন লোকজন তাকে দেখতে না পায়। বিধবাটি সুন্দরী হলে চাদরের মালিক আত্মীয় তাকে বিয়ে করতো। আর সুন্দরী না হলে তাকে যাবজ্জীবন কারাগারে রাখা হত এবং কারাগারে মৃত্যুর পর সে তার সম্পত্তি দাবি করতো।[৩]

কোনো পুরুষ দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের ইচ্ছা করলে প্রথম স্ত্রীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটাত। ফলে তাকে প্রদত্ত সকল সম্পদ স্বামীকে দিয়ে সে তার নিকট হতে নিস্তার লাভ করতো। এ সম্পদ সে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণে ব্যবহার করতো।[৪]

Marriage in Ancient Iran, Mombay, 1965, p.36; Thomas Bertram: *The Arabs,* London 1937, p.16.

[1] O'leary Delacy: Ibid, P.191; Thomas, ibid. p.16

[2] Ameer Ali, *The Spirit of Islam,* Ibid, pp.24-25

[3] Ibid. p.28

[4] মোঃ হাসান আলী চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ.৫

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জাহেলিয়াতের যুগে তৎকালীন আরব সমাজেও নারী জাতি ছিলো অবহেলিত ও লাঞ্ছিত। প্রাচীন অতীতে কোনো সভ্যতায়ই নারীর আইনগত মান বা মর্যাদা ছিলো না। ছিলো না তাদের অর্থনৈতিক বা মানবিক অধিকার। সভ্যতার ইতিহাস থেকে এটাও জানা যায় যে, এমন বঞ্চিত ও নিপীড়িত জীবনের জন্য নারীর আর কোন অপরাধ ছিলো না। নারীত্বই ছিলো নারীর সবচেয়ে বড় অপরাধ এবং এই নারীত্বই তার অযোগ্যতা প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট ছিল।

তবে এ যুগেও আরবের নারীদের গর্ব করার মতো বিষয় ছিল। সাধারণভাবে নারীকে কোনো সম্মান দেওয়া না হলেও নিজের স্ত্রী-কন্যার জীবন ও সম্মান রক্ষার জন্য আরব পুরুষরা সর্বশক্তি নিয়োগ করতো। এটাকে তারা তাদের সম্মান ও পৌরুষের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ মনে করতো। মূলত এ রকম মানসিকতার কারণেই বঞ্চিত-লাঞ্চিত আরব নারীদের মধ্যেও খাদীজা (রা)-এর দৃষ্টান্ত তৈরি হয়েছিল।[১]

জগতের বিভিন্ন ধর্ম ও জড়বাদী সভ্যতা নারীজাতির উপর পাপ ও অপবিত্রতার যে কলঙ্ক লেপন করেছে, ইসলাম এক প্রচণ্ড আঘাতে উহা মোচন করে দিয়েছে। ইসলাম ঘোষণা করে, নারী ও পুরুষ একই উৎস হতে উদ্ভূত। অতএব, নারী পাপী বলে পরিগণিত হলে পুরুষ ও পাপী বলে গণ্য হওয়া উচিত। আর পুরুষের মধ্যে মহত্বের কোনো স্ফুলিঙ্গ থাকলে নারীর মধ্যেও উহা থাকা আবশ্যক।

খ্রীস্টানগণ বলেন, নারী হৃদয়হীন জন্তু এবং তাকে যৌন অনুভূতিহীন ভাবেই সারাজীবন অতিবাহিত করতে হবে। ইসলাম তাদের এ দাবিও খণ্ডন করেছে। পবিত্র কুরআন দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে,

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

"নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোজা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী

---

[1] ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *আস–সীরাতুন নববীয়া*, পূর্বোক্ত, পৃ.১৬

Dhaka University Institutional Repository

নারী, যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী তাদের সকলের জন্যই আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখেছেন।[১]

"নারীই সর্বপ্রথম প্রতারিত হয়েছিল। সুতরাং নারীই হযরত আদম (আঃ) এর পতনের জন্য দায়ী।"[২] বাইবেলের এই উক্তিও খণ্ডন করে ইসলাম। ইসলাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে, হযরত আদম (আঃ) এবং হযরত হাওয়া (আঃ) উভয়েই যুগপৎভাবে প্রতারিত হয়েছিল। সুতরাং তাঁরা উভয়েই পতনের জন্য সমানভাবে দায়ী। কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَـذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِينَ- فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ-

"আমি বললাম, হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বাস কর, যেখান থেকে ইচ্ছা খাও আর এ গাছটির নিকটে যেয়ো না। তাহলে তোমরাও যালিমদের অর্ন্তভুক্ত হয়ে যাবে। এরপর শয়তান তাদের পতন ঘটাল। তারা যেখানে ছিলো সেখান থেকে তাদের বের করল। আমি বললাম, তোমরা একজন আরেকজনের শত্রু হিসেবে এখান থেকে নেমে যাও। পৃথিবীতে তোমাদের জন্য কিছু কালের আবাস ও জীবিকা থাকবে।"[৩]

"না পুরুষ নারীর জন্য এবং নারী পুরুষের জন্য সৃষ্টি হয়েছে।"[৪] খ্রীস্টধর্মের এই ঘোষণার প্রতিবাদে কুরআন মজীদে আল্লাহপাক ঘোষণা করেন,

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

---

1 আল-কুরআন, সূরা আহযাব, আয়াত:৩৫

2 লুক লিখিত সুমাচার, ৩: ৩৪

3 আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত: ৩৫-৩৬

4 লুক লিখিত সুমাচার, ৩: ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

"রোযার রাতে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম করা হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের ভূষণ, তোমরা তাদের ভূষণ। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করছিলে। তাই তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। অতএব তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম কর এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা হালাল করেছেন তা কামনা কর। রোযার রাতে তোমরা খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ কর যতক্ষণ না রাতের কালো অন্ধকার থেকে ফজরের সাদা রেখা পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। এরপর তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। মসজিদে ইতিকাফ করা অবস্থায় তোমরা স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম কর না। এগুলো আল্লাহ নির্ধারিত সীমা, তাই এগুলোর কাছেও যেয়ো না। এভাবে আল্লাহ তাঁর বিধানসমূহ মানুষের কাছে বর্ণনা করেন, যেন তারা তাকওয়া অর্জন করতে পারে।"[১]

অর্থাৎ পোশাক ও দেহের মধ্যে যেমন কোনো আবরণ থাকে না; বরং উভয়ের পরস্পর সম্পর্ক ও মিলন একেবারে অবিচ্ছেদ্য, তদ্রুপ সম্পর্কই তোমাদের ও তোমাদের স্ত্রীগণের মধ্যে বিরাজমান রয়েছে। কুরআন মজীদে আল্লাহ পাক আরও বলেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا
وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন, যিনি সৃষ্টি করেছেন সে ব্যক্তি থেকে তার জোড়া, আর তাদের দুজন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন অসংখ্য পুরুষ ও নারী। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অন্যের নিকট কিছু চাও। আর তোমরা আত্মীয়দের (হক আদায় ও সম্পর্ক অটুট রাখার) ব্যাপারে সতর্ক হও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।"[২]

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, আল্লাহ তা'আলা প্রথমে মাটি দ্বারা হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন। পরে তাঁর দেহ হতে আদি নারী হযরত হাওয়া (আ)কে সৃষ্টি করেন। অতঃপর তিনি তাঁদেরকে স্বামী-স্ত্রীরূপে বিবাহে আবদ্ধ করেছেন। হাদীস শরীফে আরও উল্লেখ রয়েছে, স্বামী–স্ত্রী একে অপরের জোড় বা অর্ধাংশ।

---

[১] আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত:১৮৭

[2] আল–কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত:১

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম নারীকে পুরুষের সমমর্যাদা প্রদান করেছে। নারী ও পুরুষের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে, তা কেবল দৈহিক ও সৃষ্টিগত কারণে। ইসলাম শ্রম বিভাগের নীতিতে বিশ্বাসী। কঠোর শ্রমসাধ্য এবং গৃহের বাইরের রূঢ় ও কর্কশ কর্ম সম্পাদন ও জীবিকা অর্জনের দায়িত্ব ইসলাম পুরুষের উপর ন্যাস্ত করেছে। ইসলাম গৃহকেই নারীর সর্বপ্রথম কর্মস্থল বলে মনে করে এবং গৃহের ব্যবস্থাপনা, সন্তান-সন্ততির লালন-পালন ও শিশুদের শিক্ষা দান কার্য নারীদের ওপর সমর্পণ করেছে। ইসলাম নারীকে বিদ্যার্জনে বিশেষভাবে প্রণোদিত করে এবং প্রয়োজনে জাতির উন্নয়নমূলক ও জাতি গঠন কার্যে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করে। অফিস ও কল-কারখানার কার্যাবলী ইসলাম নারীর রুচি ও প্রকৃতি বিরুদ্ধবলে মনে করে এবং নারী ও পুরুষকে তাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে উভয়ের সমন্বয়, সহানুভূতি ও প্রেম-প্রীতির সাথে কার্য সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করে।

পারিবারিক বিষয়াদি পরিচালনার চূড়ান্ত কর্তৃত্ব কার উপর ন্যস্ত থাকবে এটি নির্ধারিত থাকলে অনেক সমস্যা সহজে এড়ানো যায়। এটি অনস্বীকার্য সত্য যে, কর্ম পন্থার ঐক্য না থাকলে পরিবারের সুষ্ঠু পরিচালনা সম্ভব নয় এবং একাধিক ব্যক্তির উপর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকলে কর্মপন্থায় ঐক্য থাকতে পারে না। এ জন্য একজনের উপর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকা আবশ্যক।

মুসলিম পরিবারে মাতাকে পিতা অপেক্ষা অধিক, বোনকে ভাইয়ের চেয়ে অধিক এবং কন্যাকে পুত্র অপেক্ষা অধিক মর্যদা দান করা হয়েছে। কিন্তু পরিচালনার ব্যাপারে স্ত্রীর উপর নয়; বরং স্বামীর উপরই চূড়ান্ত কর্তৃত্ব অর্পিত হয়েছে। এতদসঙ্গে স্বামীর উপর স্ত্রীর যাবতীয় সুখ-সুবিধা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে এবং স্ত্রীর উপর কোনো প্রকার অন্যায় সাধনে স্বামীর প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। অন্যায় করলে স্বামীকে আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি ও শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

কুরআন মজীদে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ
يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ

"তালাকপ্রাপ্তা নারী তিনটি ঋতুস্রাব পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। যদি তারা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান এনে থাকে তবে আল্লাহ তাদের গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখা তাদের জন্য হালাল হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

যদি তারা আপোষে মীমাংসা করতে চায় তাহলে ঐ সময়ের মধ্যে তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে তাদের স্বামীরা অধিকতর হকদার। স্ত্রীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে স্বামীদের উপর যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার আছে স্বামীদের। তবে স্ত্রীদের উপর স্বামীদের মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রশালী, মহাবিজ্ঞানী।"[১]

কোনো কোনো ধর্মে নারীকে "An organ of Satan" (শয়তানের অঙ্গ) বলে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামে নারী শয়তানে অঙ্গ নহে; বরং ইসলাম তাকে মুহ্সানাহ বা সুরক্ষিত দূর্গ বা সৎকর্মপরায়ণা বলে আখ্যায়িত করেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত।"[২]

মহানবী (স)এর এ ঘোষণায় "মাতৃজাতিকে অতীব উচ্চ মর্যদা প্রদান করা হয়েছে। তিনি বিদ্যা অর্জনকে নর-নারী উভয়ের জন্যই ফরয (অবশ্য কর্তব্য) বলে ঘোষণা করেছেন।"[৩]

নারী-পুরুষের বিবাহ বন্ধনকে কোনো কোনো ধর্মে ও সভ্যতায় অগ্রাহ্যের দৃষ্টিতে অবলোকন করা হয়েছে এবং ইহাকে ক্ষতিকর ও অপমানজনক মনে করা হয়েছে। কিন্তু বিশ্বনবী হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)চিরকালের জন্য ঘোষণা দিয়ে বলেছেনঃ "বিবাহ্ আমার সুন্নত এবং যে ব্যক্তি আমার সুন্নত পরিত্যাগ করে, সে আমার দলভূক্ত নহে।"[৪]

তিনি আরও বলেনঃ "যে ব্যক্তি বিবাহ করল, সে ধর্মের অর্ধেক সম্পন্ন করল।" (বায়হাকী) এরূপে তিনি বিয়ের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

তিনি নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করে আরও বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা নারীদের প্রতি সম্মানের সাথে আচরণ করতে আমাদেরকে আদেশ করেছেন। কারণ তারা আমাদের মাতা, কন্যা, ফুফু, খালা, মামী ইত্যাদি দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় বস্তুর মূল্য আছে, কিন্তু জগতে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান হলো ধার্মিক নারী।[৫]

---

[1] আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত:২২৮

[2] মুহাম্মদ বিন ইয়াযীদ ইবন মাজা, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২৯

[3] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪

[4] মুহাম্মদ বিন ইসমাইল, *সহীহুল বুখারী*, পূর্বোক্ত, পৃ.৩২১

[5] ইমাম মুসলিম, সহিহ মুসলিম, পূর্বোক্ত, পৃ.২৮

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন মজীদে আল্লাহ পাক বলেনঃ "আর তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন এই, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গীনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।"[১]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লালাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর অনুসারীদেরকে তাদের স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে বলেনঃ

ক) প্রেম-প্রীতির সাথে তাদের সঙ্গী হয়ে থাক। তোমরা তাদেরকে ঘৃণা করলে হতে পারে যে, তোমরা যে বস্তু ঘৃণা কর, তাতেই আল্লাহ তা'আলা অনেক কল্যাণ রেখেছেন।

খ) তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম, যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে।

গ) মুসলমান অবশ্যই তার স্ত্রীকে ঘৃণা করবে না। সে যদি তার কোনো মন্দ স্বভাবের জন্য অসন্তুষ্ট হয়ে থাকে, তবে সে যেন তার মধ্যে যে সৎ স্বভাব রয়েছে, তাতে সন্তুষ্ট থাকে।

ঘ) যে মুসলমান তার স্ত্রীর সাথে যত ভদ্র ও সদাশয়, তার ঈমান ততই পূর্ণতা লাভ করেছে।[২]

ঙ) নারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর।[৩]

চ) হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)নারীদেরকে তাদের গৃহের কর্ত্রী বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৪]

তিনি আরও বলেন, যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, রমজান শরীফের রোযা রাখে, সতীত্ব রক্ষা করে এবং স্বামীর অবাধ্য হয় না, যে কোনো দরজা দিয়ে বেহেশ্তে প্রবেশ করার জন্য তাকে বলে দাও। তাক্ওয়ার পর মু'মিনের সর্বোত্তম সম্পদ হলো ধার্মিক স্ত্রী, যে স্বামীর আদেশ মেনে চলে।[৫]

হযরত মুহাম্মদ (সা) এর আবির্ভাবের পূর্বে নারী পুরুষ হতে স্বতন্ত্র কোনো স্বাধীন সত্তার অধিকারীর মর্যাদা পেত না। ইসলামেই তার স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকৃত হয়েছে। সে স্বাধীনভাবে যে কোনো

---

[১] আল-কুরআন, ৩০, আয়াত: ২১

[২] ইমাম তিরমিযি (র), সুনান, পূর্বোক্ত, পৃ.২০৭

[৩] মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজা, আস-সুনান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২৫

[৪] ইমাম বুখারী (র), আস-সহীহ, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৩২

[৫] ইমাম তিরমিযী (র), সুনান, পূর্বোক্ত, পৃ.২০৯

Dhaka University Institutional Repository

হালাল ব্যবসায়ে অনুপ্রবেশ করতে পারে এবং তার স্বনামে নিজ দায়িত্বে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে পারে। মাতা, স্ত্রী, বোন, কন্যা হিসাবে সে সম্পত্তির উত্তারাধিকারী হতে পারে। ইসলামই তাকে পছন্দ অনুসারে স্বীয় স্বামী গ্রহণের অধিকার দিয়েছে। ইসলামের পূর্বে কোনো ধর্ম, কোনো আইন কিংবা কোন সভ্যতাই নারীকে এই সকল অধিকার প্রদান করেনি।

জীবনের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে মহান আল্লাহ মানব সৃষ্টি করেছেন। এই প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে তিনি বলেন,

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ- الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ-

"বরকতময় আল্লাহ তিনি, যাঁর হাতে সকল কর্তৃত্ব। তিনি সকল কিছুর উপর শক্তিমান। তোমাদের মধ্যে কে আমলে সবচেয়ে ভাল তা পরীক্ষা করার জন্য যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন। তিনি মহাপরাক্রমশালী, অসীম ক্ষমাশীল।"[১]

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ

"আল্লাহর কাছেই তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। নিশ্চয় তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং মুমিন ও সৎকর্মশীলদের ন্যায়সঙ্গত প্রতিদান দেয়ার জন্য আবারো তিনিই সৃষ্টি করবেন। কাফিররা যে কুফরি করত সে কারণে কাফিরদের জন্য আছে ভয়ঙ্কর গরম পানীয় এবং ভয়াবহ শাস্তি।"[২]

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَـذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ

[১] আল-কুরআন, সূরা মুলক, আয়াত:১-২

[২] আল-কুরআন, সূরা ইউনুস, আয়াত: ৪

Dhaka University Institutional Repository

"তিনিই মহান আল্লাহ তাআলা যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করেন। তখন তাঁর আরশ ছিলো পানির উপর। যেন তিনি পরীক্ষা করতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে কে সর্বোত্তম আমল করে। আপনি যখন বলেন: 'মৃত্যুর পরে তোমাদেরকে অবশ্যই আবারো জীবিত করা হবে' তখন যারা কাফির তারা অবশ্যই বলবে: নিশ্চয় এটা হলো সুস্পষ্ট যাদু।"[১]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ প্রমাণ করে যে, আত্মিক উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হওয়ার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেই আল্লাহ তা'আলা মানব সৃষ্টি করেছেন এবং আত্মীক উন্নতিই তার পরম কাম্য। সে নির্জনবাস অবলম্বন করবে না; বরং আত্মীয়-স্বজন, স্বজাতি ও বৃহত্তর মানব-সমাজে বসবাস করবে। নিছক ব্যক্তিগত কর্তব্য ছাড়াও আপনজন, বন্ধু-বান্ধব এবং সমগ্র মানব-সমাজের প্রতি তার উপর আরোপিত কর্তব্য তাকে অবিরত পরীক্ষার সম্মুখীন করে রাখবে। এই কর্তব্য সম্পাদনের মাধ্যমেই তাকে মানব-জীবনের পরম ও চরম লক্ষ্য, আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করতে হবে। এই মানবীয় কর্তব্যের প্রতি কে কতটুকু সাড়া দিতে পারল, ইহা দ্বারাই প্রতিটি ব্যক্তির জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা নিরূপিত হবে।

পার্থিব উন্নতি ও অগ্রগতিকে ইসলাম নিন্দনীয় বলে না; বরং উহাকে উৎসাহিত করে। তবে পরকালকে বিসর্জন দিয়ে নহে। মানবীয় সম্পর্ক অটুট ও শান্তিপূর্ণ রেখে দুনিয়া আখিরাতের কল্যাণলাভের পথই ইসলাম প্রদর্শন করে। সুতরাং নারী পুরুষের সম্বন্ধে ইসলামের শিক্ষা বিষয়ে কোনো উক্তি করতে হলে এদিকে লক্ষ্য রেখেই বলতে হবে।

ইসলামে মানবতার সাম্য

ইসলাম সমগ্র মানবতার সাম্য ঘোষণা করেছে। বর্ণ, ভাষা ভৌগোলিক সীমারেখা এই সাম্যে কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। সাদা-কালো, ইংরেজ বাঙ্গালী, চীনা মালয়েশীয়, আমেরিকান-এশিয়াবাসী, আরব-অনারব তথা দুনিয়ার সকল মানুষ একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত। জাতি ধর্ম-বর্ণ, ভাষা-ভৌগোলিক সীমার পার্থক্য এখানে একেবারে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন,

[১] আল-কুরআন, সূরা হুদা, আয়াত: ৭

Dhaka University Institutional Repository

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তিই সবচেয়ে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে সবেচেয় বেশি তাকওয়াবান। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন।"[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন: "সকল মানুষই চিরুনীর শলাকার ন্যায় সমান। অনারবের ওপর আরবের, কালোর উপর সাদার, পুরুষের নারীর উপর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নাই। কেবল মুত্তাকী লোকদের জন্য তাঁর নিকট অধিক মর্যাদা রয়েছে।"[২]

আরবের অভিযাত শ্রেণীর লোকেরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে তর্ক-বিতর্ক করতো- "আপনি কিভাবে বলতে পারেন যে, আমাদের নারী ও দাস-দাসীগণ আমাদের সমমর্যাদা সম্পন্ন?"[৩] আমাদের মহানবী হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)অতীব সুন্দর ভাবে তাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ কারো প্রতি পক্ষপাত দুষ্ট নন। আল্লাহর নিকট নারী-পুরুষ, দাস আমীর সবাই সমান।

ইসলামে নারী-পুরুষের সাম্য

নারী-পুরুষের সাম্য ঘোষণা করে কুরআন মজীদে মহান আল্লাহ বলেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

"মুমিন পুরুষ অথবা মুমিন নারীর মধ্যে যে সৎকাজ করবে তাকে আমি অবশ্যই পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কাজের শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার দান করব।"[৪]

---

[1] আল-কুরআন, সূরা হুজুরাত, আয়াত: ১৩

[2] আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, আল–মুসনাদ, মক্কা ১৯৭৮, পৃষ্ঠা-৪১১

[3] Alfred Guillaume, *The life of Muhammad,* Oxford University Press, 1955, P.199.

[4] আল-কুরআন, সূরা নহল, আয়াত: ৯৭

Dhaka University Institutional Repository

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّن عِندِ اللّهِ وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

"এরপর তাদের প্রতিপালক তাদের প্রার্থনা কবূল করে বলেন – 'আমি তোমাদের কোন কর্মনিষ্ঠ পুরুষের অথবা নারীর কাজ নষ্ট করি না। তোমরা (পুরুষ এবং নারীরা) একে অপরের অংশ। কাজেই যারা হিজরত করেছে, নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিস্কৃত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে, যুদ্ধ করেছে এবং নিহত হয়েছে – আমি অবশ্যই তাদের পাপসমূহ দূর করে দেব এবং নিঃসন্দেহে তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ বয়ে যায়। আল্লাহর পক্ষ থেকে এগুলো হলো তাদের (কাজের) পুরস্কার। আর সুন্দরতম পুরস্কারসমূহ আল্লাহর নিকটেই রয়েছে।"[১]

وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"যা দিয়ে আল্লাহ তোমাদের একজনের উপর অন্যজনকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তোমরা তার লোভ কর না। পুরুষ যা উপার্জন করে তা তার প্রাপ্য আর নারী যা উপার্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ। আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ কামনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয় সম্পর্কে মহাজ্ঞানী।"[২]

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"মাতাপিতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদে পুরুষের অংশ আছে; মাতাপিতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদে নারীরও অংশ আছে; কম হোক বা বেশি, নির্ধারিত অংশ।"[৩]

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের অভিভাবক। তারা ভাল কাজের আদেশ দেয়, খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, সালাত কায়িম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য

[১] আল-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান, আয়াতঃ ১৯৫

[২] আর-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াতঃ ৩২

[৩] আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াতঃ ৭

Dhaka University Institutional Repository

করে। আল্লাহ তাদের প্রতি অচিরেই রহমত নাযিল করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়।"[১]

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَتَأْخُذْ كُمْ بِهِمَا رَافَةٌ فِى دِيْنِ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْ مِنِيْنَ-

"ব্যভিচারী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষকে একশত কশাঘাত করবে। আল্লাহর বিধান কার্যকর করায় তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদের প্রভাবিত না করে যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখিরাতে বিশ্বাসী হয়ে থাকো। মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।[২]

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"পুরুষ চোর ও নারী চোর – তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও। এটা তাদের কাজের শাস্তি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক দণ্ড। আর আল্লাহ তো মহাপরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়।"[৩]

নারী-পুরুষের সাম্যের ব্যাপারে কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

قُلْ لِلْمُؤْ مِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذَالِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ- وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَيُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّمَاظَهَرَمِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلاَيُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْاٰبَائِهِنَّ اَوْاٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْاَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْبَنِىْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْبَنِىْ اَخَوَاتِهِنَّ اَوْنِسَائِهِنَّ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِالتَّبِعِيْنَ غَيْرِ أُوْلِى الاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِالطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَيَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَايُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْا اِلَى اللهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

"মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; এটিই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে আল্লাহ তার সব খবরই রাখেন। মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; তারা যেন সাধারণত যা প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই,

[১] আল-কুরআন, সূরা তওবা, আয়াত: ৭১

[২] আল-কুরআন, সূরা নূর, আয়াত: ২

[৩] আল-কুরআন, সূরা মায়িদা, আয়াত: ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে; তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে ফিরে এসো, তাহলে তোমরা সফল হতে পারবে।"[১]

إنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

"নিশ্চয় আল্লাহ মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, (আল্লাহ ও রাসূলের) অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সাওম পালনকারী পুরুষ ও সাওম পালনকারী নারী, (অবৈধ সম্পর্ক থেকে) যৌনাঙ্গকে হিফাযতকারী পুরুষ ও হিফাযতকারী নারী এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী – তাদের সকলের জন্য আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা এবং মহাপুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।"[২]

উপর্যুক্ত আয়াত সমূহে নারী-পুরুষ উভয়কেই কর্মের দায়িত্বশীল করা হয়েছে। তাহাদেরকে সমভাবে আইনের প্রতি অনুগত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সৎকর্মের পুরস্কার ও অসৎকর্মের শাস্তি প্রদানের ওয়াদা করা হয়েছে। নর-নারী উভয়কেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, পুরুষ যা উপার্জন করে, ইহা তার প্রাপ্য ও নারী যা উপার্জন করে, ইহা তার প্রাপ্য এবং মাতাপিতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উভয়ের উত্তরাধিকার ঘোষণা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন হাদীসে এই সকল অধিকারের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে এবং উৎসসমূহ অবলম্বনে ফিকহ্শাস্ত্রে এইগুলির বর্ণনা আরোও বিস্তৃত। স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিতেও অধিকার এবং উহা ভোগ দখল ও হস্তান্তরের পর হতে বহু শতাব্দী যাবত নারী-পুরুষ উভয়েই এই অধিকার সমভাবে ভোগ করে আসছে।

---

[১] আল-কুরআন, সূরা নূর, আয়াতঃ ৩০-৩১

[২] আল-কুরআন, সূরা আহযাব, আয়াতঃ ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

নারী-পুরুষ একই মৌলিক উপাদানে সৃষ্ট বলে উভয়েই আইনের চোখে, নৈতিক ক্ষেত্রে এবং অর্থনৈতিক ব্যাপারে সঙ্গতভাবেই সমতা দাবি করতে পারে। কিন্তু এ কথা সত্য যে, তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট দৈহিক পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে-যা উভয়ের শারীরিক ও মানবিক ধাতু-প্রকৃতি ও মেজাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। আর এজন্যই বাস্তব কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষরে ভূমিকা কিছুটা হলেও বিভিন্নতা রয়েছে।

কন্যা হিসেবে নারী

ইসলামে নারীকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। নারীকে প্রথম মর্যাদা দেওয়া হয়েছে কন্যারূপে। পূর্ব পরিকল্পনা ব্যতীত এলোমেলোভাবে কোনো শিশুই নারী বা পুরুষ হয়ে ধরা ধামে আগম করে না; বরং নভোমণ্ডলের একচ্ছত্র অধিপতি মহাপরাক্রমশালী ও পরম কৌশলী মহান আল্লাহই শিশুটি নর হবে কিংবা নারী হবে, নির্ধারণ করে দেন। সে নর বা নারী যাই হয়ে থাকুক না কেনো, ঈমানদারের পক্ষে এতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। নারী ও পুরুষ উভয়ের উপরই মহান দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। এ দায়িত্ব উভয়কেই সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদন করতে হবে। ছেলে বা মেয়ে যাই জন্মগ্রহণ করুক না কেনো, তা নিয়েই আল্লাহ তায়ালার নিকট কৃতজ্ঞ থাকা আবশ্যক। কন্যা সন্তান জন্মে অনীহা ছিলো প্রাক ইসলামী যুগের মানসিক বিকৃতি। এই জন্যই কন্যা সন্তানকে জীবিতাবস্থায় প্রোথিত করা হত অথবা সামাজিক অবজ্ঞার শিকার হয়ে তাকে জীবিত থাকতে দেয় হত। এ অবজ্ঞা প্রসূত দৃষ্টিভঙ্গিতে অবমাননার মনোভাব ইসলাম সফলতার সাথে রহিত করে দিয়েছে। কুরআন মজীদে আল্লাহ পাক বলেন,

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ- أَوْ
يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ-

"বস্তুত আকাশসমূহ ও যমীনের সর্বময় মালিকানা শুধুই আল্লাহ তা'আলার। তিনি যা ইচ্ছা তা সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা যাকে ইচ্ছা তিনি পুত্র ও কন্যা উভয় সন্তানই দান করেন আবার যাকে ইচ্ছা তাকে সন্তানহীন রেখে দেন। নিশ্চয় তিনি সবকিছু জানেন, সব বিষয়ের উপর শক্তিমান।"[১]

---

[১] আল-কুরআন, সূরা শূরা, আয়াত: ৪৯-৫০

Dhaka University Institutional Repository

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ- يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ-

তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তান জন্মের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহ্য মনঃকষ্টে পতিত হয়। তাকে (কন্যা সন্তান হওয়ার) যে সুসংবাদ দেওয়া হয় তার লজ্জায় সে নিজের দলের লোকদের নিকট থেকে পালিয়ে বেড়ায়। সে চিন্তা করে, লজ্জার কারণ হওয়া সত্ত্বেও সে তার কন্যা সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখবে, না কি মাটিতে পুঁতে ফেলবে! জেনে রেখ! তারা কতই না মন্দ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।"[১]

ইসলাম মানবতা-বিরোধী ভাবধারার প্রতিবাদ করেছে। এ কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং কন্যা-সন্তানকে পুরুষ ছেলের জীবনে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছে। আর কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করা হলে কাল কিয়ামতের দিন যে তার পিতাকে আল্লাহর দরবারে কঠোর ভাবে জবাব দিহি করতে হবে, তা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে। বলা হয়েছে,

وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ- بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ-

"যখন জীবন্ত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কি অপরাধে তোমাকে হত্যা করা হয়েছিল?"[২]

এ কারণে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ "যে লোকের কোনো কন্যা-সন্তান রয়েছে এবং সে তাকে জীবন্ত প্রোথিত করেনি এবং ঘৃণার চোখেও দেখিনি, তার উপর পুত্র সন্তানকে অগ্রাধিকারও দেয়নি, তাকে আল্লাহ তা'আলা বেহেশত দান করাবেন।"[৩]

আরব জাহেলিয়াতের সমাজে নারী ও কন্যাকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে চরমভাবে পঙ্গু করে রাখা হত। তাকে পিতার মীরাস লাভের অধিকার মনে করা হত না। বরং সেখানে মীরাস দেওয়া হত সেসব পুত্র-সন্তানকে, যারা যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে শত্রুর সঙ্গে মুকাবিলা করতে পারত। নারীদের মীরাসের অংশ দেওয়াতো দূরের কথা, স্বয়ং এই নারীদের ও মীরাসের মাল চরম অমানবিক অবজ্ঞা এই বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও সভ্যতার চরম উন্নতির যুগেও যত্রতত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আধুনিক চীনের দুজন

---

[১] আল-কুরআন, সূরা নহল, আয়াত: ৫৮-৫৯

[২] আল-কুরআন, সূরা ইনফিতার, আয়াত: ৮-৯

[৩] আবূ দাউদ সুলায়মান ইবন আল-আশ'আস, *আস–সুনান*, দিল্লী, ১৪০৭ হি, পৃ.৩৫৪

Dhaka University Institutional Repository

নারীকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে শুধু এ অপরাধে যে, তারা কেবল কন্যা সন্তানই প্রসব করেছে, স্বামীকে কোনো পুত্র সন্তান উপহার দিতে পারেনি।

কন্যা সন্তানের ব্যাপারে কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

(হে রাসূল স) আপনি তাদেরকে বলুন, এস, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন তা তোমাদেরকে পড়ে শোনাই। তা হল: তোমরা তাঁর সাথে কোন শরীক করবে না, মাতাপিতার সাথে সদাচারণ করবে, অভাবের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না – তোমাদেরকে এবং তাদেরকে তো আমিই জীবিকা দেই, প্রকাশ্য বা গোপনে অশ্লীল কাজের নিকটেও যাবে না, আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, যথাযথ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করবে না। তিনি তোমাদেরকে এ সকল নির্দেশ দিলেন এ কারণে যেন তোমরা তা বুঝতে পার।"[১]

ইসলাম মানবতা বিরোধী অনেক অবমাননাকর রীতি চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছে। কুরআন মজীদে কন্যা সন্তানকে পুত্র সন্তানের মতই মীরাসের অংশীদার করে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য পুত্রদের তুলনায় কন্যাদের অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব কম বলে পুত্রদের তুলনায় কন্যাদের অংশ অর্ধেক রাখা হয়েছে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে,

يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا

"আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন: এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। যদি কেবল কন্যাই থাকে আর তারা হয় দুইজনের বেশি তাহলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিনভাগের দুইভাগ। যদি কেবল একজন কন্যাই থাকে তাহলে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক। মৃতের সন্তান থাকলে তার মাতাপিতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয়ভাগের একভাগ, মৃত

---

[১] আল-কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত: ১৫১

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তি সন্তানহীন হলে এবং মাতাপিতাই তার উত্তরাধিকারী হলে তার মায়ের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিনভাগের একভাগ। মৃতের ভাইবোন থাকলে মায়ের জন্য ছয়ভাগের একভাগ। এ সকল অংশ বন্টিত হবে মৃতের ওসিয়াত পুরণ ও ঋণ পরিশোধ করার পর। তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে কে তোমার বেশি উপকারী তোমরা তা জান না। মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনের এ বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাবিজ্ঞানী।[১]

এ আয়াতে মেয়েদেরকেও পুরুষছেলেদের সমান সম্পত্তির অংশীদার বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাধারণ লোক এ আইনকে ভালভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। তারা বলল, এদের মধ্যে কেউতো এমন নয় যে, যুদ্ধে গিয়ে শত্রুর মুকাবিলা করতে পারে। এ মনোভাবের প্রতিবাদ করে কুরআন মজীদের উপরিউক্ত আয়াতে কন্যা-সন্তানকে বিয়ের পূর্বেই এমন পরিমাণ মীরাস লাভের অধিকার দেওয়া হয়েছে, যা তার জন্যে যথেষ্ট হতে পারে।

কন্যা সন্তানদের প্রতি জাহেলী যুগে বড় অত্যাচার করা হতো। কন্যা শিশুদেরকে জিন্দা কবর দেওয়া হতো। ইসলাম এ অত্যাচার ও যুলুম বরদাশত করেনি। ইসলামের শিক্ষা হলোঃ "কন্যা প্রতিপালনে অনেক পূণ্য।" হাদীস শরীফে আছে- "যে ব্যক্তি দুটি কন্যা সন্তানকে বয়োপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত লালন পালন করবে সে ও আমি কেয়ামতের দিন এতটুকু কাছা কাছি থাকবো" এই বলে হুযুর (সাঃ) ইশারায় তার দুই আঙ্গুলকে মিলিয়ে নৈকট্যের পরিমাণ প্রদর্শন করলেন।[২]

আর একবার নবীকরীম (সাঃ) বলেছেন- "যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা বা তিনজন বোনকে প্রতিপালন করে তাদেরকে ইসলামী আদব কায়দা শিক্ষা দেবে এবং তাদের প্রতি স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করবে, তাদের বিয়ে দিয়ে আত্মনির্ভরশীলতা করে দেবে, সে ব্যক্তির জন্য বেহেশত নির্ধারিত হয়ে আছে।"[৩]

এ ধরনের আরেকটি হাদীস আছে, তাতে রয়েছে মেয়েদের লালন-পালন তার জন্য দোযখে যাওয়া হতে প্রতিবন্ধক হবে।[৪]

---

[1] আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াতঃ ১১

[২] ইমাম আহম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৪১

[3] মুহাম্মদ বিন ঈসা আত-তিরমিযী, আস-সুনান, কায়রো ১৪০১ হিজরি, পৃষ্ঠা-৩১৭

[৪] ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫১৩

Dhaka University Institutional Repository

"যাকে মেয়েদের দ্বারা পরীক্ষা করো হয়েছে,-অতপর সে উত্তমভাবে লালন-পালন করল, তবে এ মেয়েরা তার জন্য দোযখ থেকে প্রতিবন্ধক হবে।"

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর চার কন্যা ছিলেন। তিনি তাদেরকে অতি স্নেহযত্নে লালন-পালন করেন। তাঁদের বিবাহিত জীবনেও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। কনিষ্ঠা কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) ব্যতীত তিন কন্যাই তাঁর জীবদ্দশায় ইনতিকাল করেন। তাঁদের ইনতিকালে তিনি নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেন। বিয়ের পর হযরত ফাতিমা (রাঃ) স্বামীর সাথে দূরে চলে গেলে তিনি একটি নিকটবর্তী বাড়ি ভাড়া করে তাদেরকে তাঁর নিজের সান্নিধ্যে নিয়ে আসেন। তিনি কন্যা ফাতিমা (রা) সম্বন্ধে বলতেন, "ফাতিমা আমারই অংশ বিশেষ। যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি অন্যায় করে, সে আমার উপরই অন্যায় করল এবং যে তাঁকে সন্তুষ্ট করল সে আমাকে সন্তুষ্ট করল।"[১]

"একদা জনৈক ব্যক্তি তার মেয়ের মৃত্যু কামনা করল, এতে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) রেগে গিয়ে বললেন, তুমি কি তাকে রিযক দাও।"[২]

সাহাবায়ে কিরাম প্রতিটি বিষয়ে চেষ্টা করতেন হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নাতের অনুসরণ করতে। এ কারণেই তাদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন আসে। কেননা তারা হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে দেখেছেন স্বীয় মেয়েদেরকে আদর-স্নেহ, মায়া-মমতা করতে।

একদিন যে আরব সমাজ মেয়েদের জীবিত রাখাও তাদের লালন-পালনকে লজ্জার বিষয় মনে করতো, এখন তারাই ইসলামের পরশে আবার ইয়াতীম মেয়েদের লালন-পালন নিয়ে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করেছে।

"হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রাঃ) হযরত হামযা (রাঃ)-এর মেয়েকে মক্কা থেকে যখন মদীনা নিয়ে এলেন, তখন আলী (রাঃ) ও জাফর (রাঃ)-এর মাঝে মতানৈক্য শুরু হয়। হযরত জাফর (রাঃ) বললেনঃ মেয়েটি আমার লালন পালনে দেওয়া হোক। আমি তার যোগ্য। কেননা, সে আমার চাচাত বোন এবং তার খালা-যে তার মায়ের মত আমার বিবাহ বন্ধনে আছে।

হযরত আলী (রাঃ) বললেনঃ মেয়েটি আমারও চাচাত বোন এবং আমার বিবাহ বন্ধনে স্বয়ং হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মেয়ে আছে, সে মেয়ের সবচেয়ে বড় অধিকারিণী। হযরত যায়েদ (রাঃ)

---

[১] ইমাম বুখারী, সহীহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪

[২] ইমাম আহম্মদ ইবন হাম্বল, মুসনাদে আহম্মদ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৪৭

Dhaka University Institutional Repository

বললেনঃ যেহেতু মেয়েটিকে আমিই মক্কা থেকে নিয়ে এসেছি। তাই আমি তার অধিক হকদার, আমার লালন-পালনে সে থাকবে। সবার বক্তব্য শ্রবণ করে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত জা'ফর (রাঃ)-এর পক্ষে ফয়সালা দিলেন যে, মেয়েটি তার তত্ত্বাবধানে থাকবে।"[১] রাসূলে করীম (সাঃ)-এর অভ্যাস ছিলো যখন কোনো সফরে যাওয়ার ইচ্ছে করতেন, তখন সবশেষে হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর নিকট গমন করতেন। তাকে দেখতেন। যখন আবার সফর থেকে আসতেন, তখন তিনিই আবার হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাক্ষাত লাভে ধন্য হতেন। যখন তিনি পিতার নিকট যেতেন, তখন পিতা আদর করে তার কপালে চুমুখেয়ে আবার আপন স্থানে এস বসতেন।[২]

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জ্যেষ্ঠা কন্যা হযরত যয়নব (রাঃ) এর দুহিতা হযরত ওসামা (রাঃ)-কে প্রায়ই তাঁর কোলে দেখা যেত। অনেক সময়, এমনকি নামাজে লিপ্ত থাকলেও তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাধে চড়ে বসতেন। সিজদা দেওয়ার সময় তিনি তাঁকে মেঝোয় বসিয়ে দিতেন এবং সিজদা হতে উঠলেই তিনি তাঁর কাধে যেয়ে বসতেন।[৩]

পিতা জীবিত থাকতে ছেলের বালেগ হওয়া পর্যন্ত তার লালন পালন করা যেমন পিতার কতর্ব্য, মেয়ের বিয়ে হওয়া পর্যন্ত তার জন্যেও পিতার অনুরূপ কর্তব্য রয়েছে। উপরন্তু ছেলে বড় হলে পিতা তাকে আয়-রোজগার করার জন্যে বাধ্য করতে পারে; কিন্তু কন্যা সন্তানকে তা পারে না।

ইসলাম ধর্ম পিতার দৃষ্টিতে মেয়েকে শুধু প্রিয়-ই করেনি, বরং আইনগত তার অধিকারও দিয়েছে যে, ছেলের মত পিতার সম্পত্তিতে মেয়ের ও নির্দিষ্ট অংশ আছে। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে মেয়ের অংশ যা ইসলাম দান করেছে, এ ধরনের অধিকার প্রদানের দৃষ্টান্ত নতুন পুরাতন কোনো ধর্মে পাওয়া যায় না। এদিক থেকে তার উপর ইসলামের অনুগ্রহ একক প্রশংসার দাবিদার।

ইসলামে বোন হিসেবে নারী

ইসলাম মেয়েদের ব্যাপারে যে ঘোষণা ব্যাপকভাবে দিয়েছে, তার প্রভাব আত্মীয়-স্বজন মহিলাদের উপরও পড়েছে। পাশাপাশি নিকট আত্মীয়দের সাথে বিশেষ সদাচরণ সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ

---

[1] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, পূর্বোক্ত, পৃ.১৭৬

[২] ইমাম আহম্মদ ইবন হাম্বল, মুসনাদে আহম্মদ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৪৭

[৩] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

(সাঃ)-এর বিশেষ বাণী সমূহ এবং আল-কুরআনে নিকট আত্মীয়দের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ বিধানাবলী সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে "বোনের" ব্যাপারে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর ঘোষণা সাহাবায়ে কিরামের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে যে, "বোনের লালন-পালন বেহেশতে প্রবেশ করার মাধ্যমে।"[১] এ হাদীসটির বর্ণনাকারী হলেন আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ)।

অন্যএক হাদীসে বর্ণিত আছে, "যে ব্যক্তি দুটি বোনের ভার গ্রহণ করেছে এবং সে তাদের সঙ্গে ধৈর্যের সাথে সদ্ব্যবহার করে, সে এবং আমি বেহেশতে এই ভাবে থাকব।"

এই বলে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বীয় তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলীর ইঙ্গিত করলেন।[২]

ইসলামে উক্ত গুরুত্বারোপের পাশাপাশি আইনগত ভাবে ভাইয়ের উপর কানুন করেছে যে, যদি কোনো মেয়ের বাব-মা বেচে না থাকে, তবে তার লালন পালন, শিক্ষা-দীক্ষা ও সকল ব্যয়ভারের দায়িত্ব ভাইয়ের উপর।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্ত অনুপম আদর্শের প্রভাব সাহাবয়ে কিরামের উপর গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। হুনাইনের যুদ্ধে কয়েক হাজার অমুসলিম বন্দি হয়। এদের মধ্যে হযরত রাসূলুল্লাহ(সাঃ)-এর দুধবোন শীমাও ছিলেন। সবাই যখন তাঁকে গ্রেফতার করে তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের পয়গম্বরের বোন। সাহাবায়ে কিরাম সত্যায়নের জন্য তাকে হযরত রাসূলুল্লাহ(সাঃ)-এর খেদমতে নিয়ে এলে মহব্বতের আতিশয্যে হযরত রাসূলুল্লাহ(সাঃ)-এর চোখ অশ্রু ভরে যায় এবং তাকে বসার জন্য তিনি নিজের চাদর বিছিয়ে দেন। তার সাথে হৃদ্যতা পূর্ণ আলোচনা করলেন ও কয়েকটি উট ও ছাগল দান করলেন। এরপর বললেন- "আপনার যদি মনে চায় আমার সাথে থাকেন, অন্যথায় আপনার ঘরেও চলে যেতে পারেন।" তিনি ঘরে যাওয়াকে পছন্দ করেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পূর্ণ ইজ্জত ও সম্মানের সাথে তাকে ঘরে পৌছে দেন।"[৩]

শুধু এটিই নয়, বরং হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এমন অনুপম চরিত্র দেখে একজন সম্মানিত দূত হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে সকল যুদ্ধবন্দী মুক্তি দিতে আরয করল। মুক্তির

---

[১] আত-তিরমিযি, আস-সুনান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা.৩১৮

[২] ইমাম আহম্মদ, আল-মুসনাদে, প্রাগুক্ত

[৩] মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খতীব, মিশকাতুল মাসাবীহ, পূর্বোক্ত, পৃ.৮৯

Dhaka University Institutional Repository

কারণ দর্শাতে গিয়ে সে দূত একটি হৃদয় কাঁপানো দলীল পেশ করে, "যে সকল মহিলা বন্দী আছে, তাদের মধ্যে আপনার ফুপু এবং খালাগণ ও রয়েছে। আল্লাহর কসম! যদি আরব বাদশাহেদের মধ্যে কেউ আমাদের বংশের কারো দুধ পান করতো, তবে তার নিকট অনেক কমই আশা করতাম কিন্তু আপনার নিকট তার চেয়ে আরে অনেক বেশি কামনা করি।"[১]

এমন চিত্তাকর্ষক আপিল শুনে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উদ্বেলিত হয়ে বললেনঃ আব্দুল মুত্তালিবের বংশের যে অংশ রয়েছে, সব তোমাদের। বন্দিদের মুক্তির জন্য কেবল আবদুল মুত্তালিব বংশের অংশসমূহ যথেষ্ট হবে না বলে তিনি তাদেরকে শিখিয়ে দিলেন, নামাজের পর যখন সবাই উপস্থিত থাকবে তখন সবার সম্মুখে দরখাস্ত করবে। যোহরের নামাজের পর আবেদনটি পেশ করা হয়, তখন হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ আমার একমাত্র নিজের বংশের উপর ক্ষমতা আছে। কিন্তু আমি সকল মুসলমানের নিকট তার জন্য সুপারিশ করছি।

অবস্থা এমন হলো যে, মুহাজির এবং আনসার সবাই এক সুরে বলে উঠলঃ আমাদেরও অংশ আছে। এভাবে ছয় হাজার বন্দী এক সাথে মুক্তি পেয়ে গেল।"[২]

ইসলাম ধর্মে সাহাবায়ে কিরামের বাস্তব জীবনে মহানবী (স)এর এ শিক্ষার বাস্তব আমল ছিল। তাঁরা নিজের লাভকে বোনের লাভের সামনে দ্বিতীয় স্থানে রাখতেন এবং বোনদের লাভকে প্রথম স্থান দিতে ও নিজেদের আরাম-আয়েশকে ভুলে যেতে দ্বিধা করতেন না।[৩]

ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে এসে হযরত রাসূলুল্লাহ (স)এর সাহাবীগণ মানব সমাজে চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে একটি তুলনাহীন বিপ্লবের সৃষ্টি করে ছিলো তৎকালীন আরব জাহানে। সে কালের উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা হচ্ছেঃ "বিশিষ্ট সাহাবী হযরত জাবির (রাঃ) তাঁর সাতটি পিতৃহীনা বোনের লালন-পালনের জন্যে কোনো যুবতী কুমারী মেয়ে বিয়ে না করে একজন বয়স্ক বিধবাকে বিয়ে করে

---

[১] হযরত রাসূলুল্লাহ (স)এর দুধমা হালিমা এ বংশের লোক ছিলেন। সে সূত্রেই লোকেরা বন্দি নারীদেরকে রাসূলুল্লাহ (স)এর খালা বা ফুপু বলেছে। মহানবী (স) এ সম্পর্কও অস্বীকার করেননি। বরং নারীকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান প্রদান করেছেন।

[২] ইবনে হিশাম, সীরাত, পূর্বোক্ত, পৃ.৩০৯

[৩] আল্লামা আব্দুস সামাদ রাহমানী, *নারী মুক্তি কোন পথে?* ভাষান্তর-মুফতী মঈনুদ্দীন তৈয়বপুরী, বাড পাবলিকেশন, ঢাকা-২০০০, পৃঃ ১১০

Dhaka University Institutional Repository

আনলেন; অথচ তিনি ছিলেন অল্প বয়স্ক যুবক। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কুমারী মেয়ে বিয়ে করো নি কেন?

তিনি আরয করলেনঃ আমার সম্মানিত পিতা শাহাদাত বরণ করেন এবং কম বয়সী অনেক সন্তান রেখে যান। আমি যদি কুমারী মেয়ে বিয়ে করি, তবে সে তাদেরকে না শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে পারবে, না তাদের তত্ত্বাবধান করতে পারবে। তাই আমি এমন এক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মহিলা বিয়ে করেছি, যে তাদেরকে ধমক-টমক দিয়ে ভীতি প্রদর্শন করতে পারবে। তাদের চুলগুলো আঁচড়ে দিবে। তাদের চুল থেকে উঁকুন বের করতে পারবে। তাদের কাপড় ছিঁড়ে গেলে সেলাই করে দিতে পারবে এবং তাদের সকল কর্মে আঞ্জাম দিতে পারবে।[১]

এভাবে ইসলাম বোনের সাথে শুধু সদাচরণের প্রতিই গুরুত্বারোপ করেনি বরং বোনের জন্য মীরাসে তথা ত্যাজ্য সম্পদের অংশ নির্ধারণ করেছে। যেমনঃ মৃত ব্যক্তি একটি মেয়ে ও একজন বোন রেখে গেলে অর্ধেক মেয়ে পাবে অপর অর্ধেক বোন পাবে। এমনি ভাবে যদি একজন স্ত্রী ও একজন বোন রেখে যায়, তবে তখন স্ত্রী পাবে চার আনা আর বোন পাবে বার আনা।[২]

মা হিসেবে নারী

ইসলাম "মা" হিসেবে নারীর মর্যাদা এত বেশী উঁচু করেছে যে, পুরুষ কোনোভাবেই সে ইজ্জত পর্যন্ত পৌছতে পারবে না। "পিতা-মাতা হিসেবে তার মধ্যে সন্দেহ নেই যে, মায়ের সাথে বাবারও হক আছে। অধিকাংশ স্থানে তাদের আলোচনা একসাথে করা হয়েছে কুরআন ও সুন্নাতে। উভয়ের সাথে সৎ ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল-কুরআনের এক স্থানে তাওহীদের হুকুম ও শিরক হতে নিষেধাজ্ঞার পর মা-বার সাথে সৎ ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

---

[১] আরো দেখুনঃ ইমাম বুখারী, আস-সহীহ; ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ; ইমাম তিরমিযী, আল-জামি; ইমাম নাসাঈ, আস-সুনান; ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান; ইমাম ইবনে মাজাহ, আস-সুনান; কিতাবুল আদব

[২] আরো দেখুনঃ ইমাম বুখারী, আস-সহীহ; ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ; ইমাম তিরমিযী, আল-জামি; ইমাম নাসাঈ, আস-সুনান; ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান; ইমাম ইবনে মাজাহ, আস-সুনান; কিতাবুল ফারাইয

Dhaka University Institutional Repository

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, মাতাপিতার সাথে ইহসান করবে। আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী ও পথচারীদের সাথে এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীর সাথে ইহসান করবে। নিশ্চয় আল্লাহ অহঙ্কারী ও দাম্ভিক ব্যক্তিকে ভালবাসেন না।"[১]

অন্যত্র রয়েছে,

قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"(হে রাসূল স) আপনি তাদেরকে বলুন, এস, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন তা তোমাদেরকে পড়ে শোনাই। তা হল: তোমরা তাঁর সাথে কোন শরীক করবে না, মাতাপিতার সাথে সদাচারণ করবে, অভাবের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না - তোমাদেরকে এবং তাদেরকে তো আমিই জীবিকা দেই, প্রকাশ্য বা গোপনে অশীল কাজের নিকটেও যাবে না, আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, যথাযথ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করবে না। তিনি তোমাদেরকে এ সকল নির্দেশ দিলেন এ কারণে যেন তোমরা তা বুঝতে পার।"[২]

কুরআন মজীদে মায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কঠোর নির্দেশ রয়েছে। ইরশাদ-

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

[১] আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত: ৩৬

[2] আল-কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত: ১৫১

Dhaka University Institutional Repository

"আমি মানুষকে তার মা বাবার সাথে সদয় আচরণের আদেশ দিয়েছি। তার মা তাকে অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করেছে, তাকে প্রসব করে কষ্টের সাথে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার দুধপান ছাড়াতে সময় লেগেছে ত্রিশ মাস। ক্রমে সে যখন বিকশিত হয় এমনকি তার বয়স হয় চল্লিশ তখন সে বলেঃ হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে ক্ষমতা দিন, যেন আমি আপনার নিআমাতের শোকর করতে পারি, যে নিআমাত আপনি আমাকে ও আমার মা বাবাকে দান করেছেন। আপনি আমাকে ক্ষমতা দিন, যেন আমি এমন ভাল কাজ করতে পারি যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন, আমার বংশধরদেরকেও সৎকর্মশীল করুন। নিশ্চয় আমি আপনার নিকট তওবা করলাম এবং নিশ্চিতভাবেই আমি আপনার নিকট আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।"[1]

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

"আমি মানুষকে তার মাতাপিতার সাথে সদাচারণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে অসীম কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করে আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু বছরে। কাজেই তোমরা আমার প্রতি এবং তোমার মাতাপিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। তোমাদের ফিরে আসা তো আমার নিকটেই।"[2]

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا- وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا-

(হে রাসূল স) আপনার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদাত না করতে এবং মাতাপিতার সাথে সদাচারণ করতে। মাতাপিতার মধ্যে একজন অথবা তারা দুজনই বৃদ্ধ হয়ে গেলে (অবহেলা, উপেক্ষা, ক্রোধ ও বিরক্তিতে) তাদেরকে 'উহ' বল না, তাদেরকে ধমক দিয়ো না। তাদের সঙ্গে সম্মানের সাথে কথা বল। ভালবাসা ও শ্রদ্ধায় তাদের জন্য বিনয়ে দু বাহু বিছিয়ে (বাড়িয়ে) দাও। তাদের জন্য প্রার্থনা করে বলঃ 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমার মা-বাবার উপর দয়া করুন, যেভাবে শৈশবে তারা আমার উপর দয়া করেছিলেন।"[3]

---

[1] আল-কুরআন, সূরা আহকাফ, আয়াতঃ ১৫

[2] আল-কুরআন, সূরা লুকমান, আয়াতঃ ১৪

[3] আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াতঃ ২৩-২৪

Dhaka University Institutional Repository

এই পবিত্র আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মাতা-পিতার আনুগত্য, তাঁদের সাথে সুন্দর ব্যবহার এবং তাদের সেবার যত দিক ও পর্যায় থাকতে পারে তার সব দিকই ইঙ্গিত করেছেন এবং তিনি এ সব কিছুকেই নিজ ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। মনীষী ফখরুদ্দীন রাজী বলেন, "মাতা পিতার আনুগত্য এবং আল্লাহর ইবাদতের দিকে এই তীব্র তাগিদের আসল কারণ হচ্ছে মানব সৃষ্টির আসল কর্তা হচ্ছেন আল্লাহ এবং তার সৃষ্টির বাহ্যিক মাধ্যম হচ্ছেন পিতা-মাতা। এজন্যে আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম তাকেই সম্মান দান এবং তারই ইবাদত করার হুকুম দিয়েছেন এবং এরপরই মাতা পিতার প্রতি সম্মান দেখাতে বলেছেন। এতে করে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় পিতা-মাতার আনুগত্য করা বস্তুতঃ আল্লাহর ইবাদতেরই এক পবিত্রতম অঙ্গ।"[১]

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোষণা করেছেন, "বেহেশত মা'দের পায়ের তলে অবস্থিত।"[২]

অর্থাৎ মাকে যথাযোগ্য সম্মান দিলে, তার উপযুক্ত খেদমত করলে এবং তার হক আদায় করলে সন্তান বেহেশত লাভ করতে পারে, অন্যকথায় সন্তানের বেহেশত লাভ মা'য়ের খেদমতের উপর নির্ভরশীল। মা'য়ের খেদমত না করলে কিংবা মা'র প্রতি কোনোরূপ খারপ ব্যবহার করলে, মাকে কষ্ট ও দুঃখ দিলে সন্তান যত ইবাদত বন্দেগী আর নেকের কাজেই করুক না কেন, তার পক্ষে বেহেশত লাভ করা সম্ভবপর হবে না। তার পিতা অপেক্ষা মাতার অধিকার এ ক্ষেত্রে বেশি বলে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে।

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেছেনঃ হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর সময়ে আল-কামা নামক এক যুবক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। তার রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। শয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত সেবা-শুশ্রূষাকারীরা তাকে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" কলেমা পাঠ করার উপদেশ দেয়। কিন্তু শত চেষ্টা করেও সে তা উচ্চারণ করতে পারে না। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এই আশ্চার্য ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেরে জিজ্ঞেস করলেনঃ তার মাকি জীবিত আছে? বলা হল, তার পিতা মারা গেছে, মা জীবিত আছে, অবশ্য সে খুবই বয়োবৃদ্ধা। তখন তাকে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর দরবারে উপস্থিত করা হল। সে বলল, আল-কামা বড় নামাযী, বড় রোযাদার ব্যক্তি এবং বড়ই দানশীল। সে যে কত দান করে, তার পরিমাণ কারো জানা নেই। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার সাথে তার সম্পর্ক কিরূপ? উত্তরে বৃদ্ধা মা বলল, 'আমি ওর প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট।'

[১] ইমাম আবু বকর আল-রাযী, যাদুল মাআদ, কুতুবখানা রশিদীয়া দিল্লী, ১৪০৬ হিজরি, পৃ.১২৬

[২] ইবন মাজা, আস-সুনান, পূর্বোক্ত, পৃ.৯২৯

Dhaka University Institutional Repository

তার অসন্তুষ্টির কারণ জিজ্ঞেস করায় সে বলল, "সে আমার তুলনায় তার স্ত্রীর মন যোগাত বেশী, আমার উপর তাকেই বেশী অগ্রাধিকার দিত এবং তার কথামতই কাজ করতো।' তখন হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "ঠিক এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তার মুখে কালেমার উচ্চারণ বন্ধ করে দিয়েছেন।" অতঃপর হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত বিলালকে আগুনের কুণ্ডলি জ্বালাতে বললেন এবং তাতে আল-কামাকে নিক্ষেপ করার আদেশ করলেন।

আল-কামার মা একথা শুনে বলল- "আমি মা হয়ে তা কেমন করে হতে দিতে পারি! সে যে আমার সন্তান, আমার কলিজার টুকরা।"

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন- "তুমি যদি চাও যে, আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দিন তাহলে তুমি তার প্রতি খুশি হয়ে যাও। অন্যথায় শপথ, তার নামায, রোযা ও দান খয়রাতের কোনো মূল্যই হবে না আল্লাহর দরবারে।"

অতঃপর আল-কামার জননী বলল- "আমি আল্লাহ তাআলা এবং আল্লাহর রাসূলকে স্বাক্ষী রেখে বলছি, আমি তাকে মাফ করে দিলাম।" এর পর খবর নিয়ে জানা গেল যে, আল-কামা অতি সহজেই কালেমা উচ্চারণ করতে সমর্থ হয়েছে।"[১]

এটি একটি নিছক ঘটনা নয়। বরং ঘটনাটি নির্ভুল বর্ণনা ভিত্তিক, এর সত্যতায় কোনোই সন্দেহ নেই। যদিও বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিতে এমন হওয়া সম্ভব নয় এবং এ সব ঘটনার কোনো মূল্যও নেই। কিন্তু ইসলাম যে নৈতিক ও আদর্শিক বিধান উপস্থাপন করেছে, তাতে এ ধরনের ঘটনা মানুষের চোখ খুলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) উপেক্ষিত বঞ্চিত নারী সমাজের অবস্থার উন্নয়ন ও সঠিক মর্যাদায় তাদের প্রতিষ্ঠিত করা প্রসঙ্গে যে উন্নত মানের শিক্ষা পেশ করেছেন, নারী মুক্তির কোনো উচ্চ কণ্ঠ সমর্থকই আজ পর্যন্ত সেই মানের শিক্ষা পেশ করতে পারেনি। একটি ঘোষণায় হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা মায়েদের নাফরমানী, তাদের অধিকার আদায় না করা, চার দিক থেকে

---

[১] ইমাম মুনযিরী, বিররুল ওয়ালিদাইন, তৃতীয় খণ্ড, বৈরুত, ১৪২৩, পৃ.৩৩১-৩৩২

Dhaka University Institutional Repository

ধন-সম্পদ লুণ্ঠন ও বঞ্চিত করা এবং মেয়ে সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিক করাকে তোমাদের জন্য চিরতরে হারাম করে দিয়েছেন।"[১]

এ ধরনের আরো অনেক আয়াত ও হাদীস আছে, যে গুলোর মধ্যে মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ রয়েছে। তা সত্ত্বেও মায়ের মর্যাদা ইসলামে বাবার মর্যাদার উর্ধ্বে।

হাদীস শরীফে আছে, হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সৎ ব্যবহারের সবচেয়ে বড় হকদার কে? হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ তোমার মা। সে বললঃ তারপর কে? তিনি বললেনঃ তোমার মা। সে বললঃ তারপর কে? হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন তোমার মা। সে বললঃ তারপর কেঃ তখন হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) চতুর্থবার বললেনঃ তোমার বাবা। তারপর যে তোমার নিকটে, অতঃপর যে তোমার নিকটে।"[২]

এই হাদীসে মায়ের স্থান বাবার তিনগুন উর্ধ্বে বলে প্রমাণিত হয়েছে। তার কারণ প্রত্যেক মা বাবার চেয়ে তিনগুন বেশি কষ্ট করে থাকেন।

ইসলাম মায়ের জাতিকে কতোখানি সম্মান দিয়েছে তার পরিমান নিম্নে বর্ণিত হাদীস দ্বারাও বুঝা যায়- "এক ব্যক্তি হুযুর (সাঃ) এর কাছে এসে বললেনঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একটি বড় গুনাহ করে বসেছি। আমার কি তওবা আছে? হুযুর (সাঃ) বললেনঃ তোমার কি মা আছেন? লোকটি বললঃ না। হুযুর (সাঃ) বললেনঃ তোমার তওবা আল্লাহ কাছে কবুল করবার জন্য তোমার খালার সেবা করো।

হযরত আয়েশা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত,- "হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, আমি মিরাজের দিন জান্নাতে প্রবেশ করে কিরাআতের আয়াত শুনলাম। তখন জিজ্ঞেস করলামঃ কে? জবাব এল, হারিস বিন নু'মান। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তুমিও কী নেকী কর, যাতে আল্লাহ তোমাকে এত মর্যাদা দিয়েছেন? হারিস বিন নু'মান (রাঃ) বললেন, আল্লাহর হক আদায়ের পর আমি আমার মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করি।"[৩]

---

[1] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, সহীহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৯

[2] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২

[3] মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খতীব, মিশকাতুল মাসাবীহ, পূর্বোক্ত, পৃ.১০০

Dhaka University Institutional Repository

অপর এক হাদীসে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ "যে লোক তার পিতামাতা দুজনকে বা কিংবা একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল অথচ খেদমত করে জান্নাত বাসী হওয়ার অধিকারী হলো না, তার মত হতভাগ্য আর কেউ নেই।[১]

মা হিসেবে নারীর প্রতি অতি উচ্চ মর্যাদা প্রদর্শন করেছে একমাত্র ইসলাম। এ প্রসঙ্গেরই একটি লম্বা হাদীসের শেষ ভাগে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেনঃ "দুটি পথ এমন রয়েছে, যেখান থেকে পৃথিবীতে খুব শীঘ্র ও দ্রুতগতিতে আযাব নাজিল হয়ঃ একটি জুলুম ও সীমালংঘন এবং দ্বিতীয়টি পিতা-মাতার নাফরমানী ও তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা।"[২]

কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই কথায় এক অতীব উচ্চ ও নিগুঢ় তত্ত্বের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। বস্তুতঃ জুলুম ও সীমালংঘন এমনিতেই বেশি দিন চলতে পারে না। কিন্তু তা যদি হয় নিজেরই জন্মদাতা মা-বাবার ওপর, তাহলে মজলুমের বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাসের পূর্বেই জালেমের আয়ুকাল ফুরিয়ে যেতে বাধ্য।

হযরত আবূ তোফায়েল (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত" হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন "জাইররানা" নামক স্থানে গোশত বন্টন করছিলেন, তখন জনৈক মহিলা এসে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে চলে গেল। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে দেখামাত্র চাদর বিছিয়ে দিলেন। সে তাতে বসে পড়ে। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ মহিলাটি কে? তখন সবাই বললঃ হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর দুধমাতা।[৩]

নারী জাতির এতো সম্মান আরকে দিয়েছে? আর একটি হাদীস আছে, "জনৈক সাহাবী হুযুর (সাঃ) এর কাছে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি জিহাদে (ধর্ম-যুদ্ধে) যাওয়ার সংকল্প করেছি। এখন আপনার নিকট পরামর্শ চাচ্ছি। এতে হুযুর (সাঃ) বললেনঃ তোমার মা জীবিত আছে? লোকটি উত্তরে বললো হ্যাঁ। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তাহলে এখন তুমি তোমার মায়ের সেবা করো। কেননা জান্নাত তাঁর পদযুগলের নীচে।"[8]

---

[1] ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, পূর্বোক্ত, ১২৮

[2] ইমাম তিরমিযী, আস-সুনান, পূর্বোক্ত, পৃ.২৭৬

[3] ইমাম আবূ দাউদ, আস-সুনান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫৮

[8] ইমাম ইবনে মাযাহ, আস-সুনান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯২৬

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মযুদ্ধ অনেক সময় ফরয হয়ে থাকে, বিশেষ করে ইসলামের প্রাথমিক যুগে এর প্রয়োজনীয়তার কথা কে না জানে। কিন্তু হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) সেই যুদ্ধ থেকে ও মায়ের সেবার গুরুত্ব বেশী দিয়েছেন। মা না থাকলে মায়ের বোনের সেবা করলেও গুনাহ মাফ হবে বলেছেন। ইসলামী বিশেষজ্ঞরা একটি বিশেষ দিক নির্দেশ দিয়েছেন যে, মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হচ্ছে আনুগত্যের খোদায়ী পদ্ধতি; এর মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে মাতা-পিতার সেবার দায়িত্ব পালিত হয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম রাজী (রহঃ) তাঁর তাফসীরে লিখেছেন- "আল্লাহ তায়ালা তার ছাড়া অন্য কারও উপসনাকে নিষিদ্ধ করেছেন কিন্তু সেবার অনুমতি দিয়েছেন। সেবা হচ্ছে উপাসনার পরবর্তী স্থান এ থেকে দেখা যায় যে সেবা কেবল বৈধই নয় বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে জরুরীও। যেমন মাতা পিতার সেবা করা ওয়াজীব বা জরুরী। ইসলামই নারীদেরকে এক হিসেবে পুরুষের চাইতে ও বেশী সম্মান দিয়েছে। আর কোনো মতবাদ বা মতদর্শই নারীকে এতোটুকু সম্মান বা মর্যদা দিতে সক্ষম হয়নি।

কুরআন মজীদে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন,

لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

"আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করোনা পূজা উপাসনা করোনা এবং পিতা মাতার সাথে অবশ্যই ভাল ব্যবহার করবে।"[১]

সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যিব বলেছেন, "পিতামাতার সাথে কথা বল, যেমন করে অপরাধী ক্রীত দাস কথা বলে রুঢ় ভাষী মনিবের সামনে।"

আল মুজাহিদ বলেছেন, "পিতামাতা তোমার সামনে বার্ধক্যে পৌছলে তাঁদেরকে ময়লার সাথে ফেলে রাখবে না এবং যখন তাদের পায়খানা সাফ করবে তখনো তাঁদের প্রতি কোনো রূপ ক্ষোভ দেখাবেনা। অপমানকর কথা বলবেনা-যেমন করে তাঁরা তোমার শিশু অবস্থায় তোমার পেশাব পায়খানা সাফ করতো, ঠিক তেমনি দরদদিয়ে করবে। সূরা আল-আনকাবুত-এ বলা হয়েছে, "মানুষ সাধারণকে তাদের পিতা মাতার সঙ্গে ইহ্‌সান করতে নির্দেশ দিয়েছি।" এখানে ইহসান শব্দের মূল হচ্ছে হুসনুন, মানে চরম পর্যায়ের ও পরম মানের সর্বোত্তম ভাল কাজ করা, ভাল ব্যবহার করা ও তাঁদের হক আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সব জায়গাতেই প্রথমে আল্লাহর প্রতি কর্তব্যে এবং তারপরই পিতা মাতার প্রতি কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে।

---

[1] আল-কুরআন-২, আয়াতঃ ৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, হে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ), সন্তানের উপর তাদের পিতামাতার অধিকার কি?

জবাবে তিনি ইরশাদ করলেনঃ তারা দু জনই হচ্ছে তোমার জান্নাত এবং তোমার জাহান্নাম।

অর্থাৎ মানে জান্নাত কিংবা জাহান্নাম তাদের কারণেই লাভ হওয়া সম্ভব হবে।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ যে লোক পিতা মাতার ব্যাপারে আল্লাহর অনুগত হয় তার জন্য বেহেশতের দুটি দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে-একজন হলে একটি দ্বার উন্মুক্ত হবে আর যদি কেউ পিতা মাতার ব্যাপারে আল্লাহর নাফরমান হয়ে যায় তবে তার জন্যে জাহান্নামের দুটো দুয়ারই খুলে যাবে আর একজন হলে একটি দুয়ার খুলবে।

অতঃপর এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেনঃ ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ)! পিতা মাতা যদি সন্তানের উপর জুলুম করে আর তার ফলে সন্তানরা তাদের নাফরমানী করে বা তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে! এর জবাবে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ হ্যাঁ, পিতা-মাতা যদি সন্তানের উপর জুলুমও করে তবুও তাদের নাফরমানী করলে জাহান্নামে যেতে হবে।

অপর এক হাদীসে হযরত আবূ বকর (রা) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা চাইলে যত গুনাহ এবং যে কোনো গুনাহ্ই মাফ করে দেবেন। তবে পিতামাতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও তাদের নাফরমানী করলে তিনি তা কখনও মাফ করবেন না। কেননা, এর শাস্তি মৃত্যুর পূবেই এ দুনিয়ায়ই শিগগীর করে দেওয়া হবে।"[১]

পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার করা সম্পর্কে কুরআন হাদীসে যেসব তাকীদ বাণী উদ্ধৃত হয়েছে, এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে যে মূলনীতি উল্লিখিত হয়েছে তা হচ্ছে এইঃ "তোমার কি ভেবে দেখেছ তোমরা যদি যমীনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করো এবং রেহিম (রক্ত সম্পর্ক) ছিন্ন করো, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাদের অভিসম্পাত করবেন এবং এরপর তাদের বধির ও অন্ধকারে দেবেন।"[২]

---

[1] আলবাহি আল খাওলী, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৯৮

[2] আল-কুরআন, ৪৭, আয়াত: ২২-২৩

Dhaka University Institutional Repository

এ আয়াতের প্রেক্ষিতে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর স্মরনীয় একটি হাদীসে বলা হয়েছে, "রেহেমের সম্পর্ক কর্তন কারী কখনই বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।"[১]

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) সবচেয়ে বড় গুনাহ্ কি কি বলতে গিয়ে প্রথমত উল্লেখ করেছেনঃ "আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং পিতামাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা।"

অপর এক হাদীসে তা কবীরা গুনাহ বলে উল্লেখ করেছেনঃ "কোন ব্যক্তির পক্ষে তার পিতা মাতাকে গালাগাল করাও কবীরা গুনাহ।"

সাহাবীগণ এ কথা শুনে বললেনঃ পিতামাতাকেও কি কেউ গালাগাল করে নাকি হে রাসূল? তখন হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ "এক ব্যক্তি অপর কারো বাপক গাল দেয়, প্রত্যুওরে সে দেয় প্রথম ব্যক্তির বাপকে গাল, এমনি ভাবে কেউ অপর ব্যক্তির মাকে গালাগাল করে সে ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির মাকেই গাল দেয়।[২]

অর্থাৎ সরাসরিভাবে নিজের মা-বাপকে কেউ গালাগাল না করলেও প্রকারান্তরে অপর লোক দ্বারা নিজ মা-বাপকে গাল খেতে বাধ্য করে। তাও তার নিজেরই গালাগালের সমান হয়ে দাঁড়ায়। কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে বাপ-মা'র সাথে তো বটেই তাদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সাথেও ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ রয়েছে। বলা হয়েছেঃ- "প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে তার পিতার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে ভাল ব্যবহার করাও অতি উত্তম নেক কাজ।"[৩]

এভাবে ইসলাম নারীকে মা হিসেবে অনন্য মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

সন্তানের সম্পদে পিতা-মাতার অধিকার

ইসলাম ধর্মে নারীর মর্যাদা শুধু সন্তানের খেদমতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেনি, এ সকল মর্যাদা ও অধিকারের পাশাপাশি সন্তানের সম্পত্তিতে অংশ পাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

---

[1] ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩১৫

[২] ইমাম তিরমিযী, আস-সুনান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১২

[3] ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, পূর্বোক্ত, পৃ.৩২১

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, "হে রাসূল, লোকেরা তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, তারা কোথায় ধনমাল ব্যয় করবে। তুমি তাদের বলে দাও, তোমরা যা কিছু খরচ করবে, তা করবে পিতা-মাতার জন্যে, নিকট আত্মীয়দের জন্যে, ইয়াতীম, মিসকীন ও সম্বলহীন পথিকদের জন্যে।"[১]

এ আয়াত সন্তানের ধনসম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে পিতামাতার অগ্রাধিকার স্পষ্টভাবে পেশ করেছে। নওয়াব সিদ্দীক হাসান এ আয়াতের তাফসীর লিখেছেন, সন্তানের অর্থব্যয়ের ব্যাপারে পিতা-মাতাকে সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হয়েছে এ করণে যে, সন্তানের অর্থসম্পদের উপর পিতা-মাতার যে অধিকার রয়েছে, তা আদায় করা সন্তানর জন্যে ওয়াজিব। কেননা এ পিতা-মাতাই হচ্ছে সন্তানের এই দুনিয়ার অস্তিত্ব লাভের বাহ্যিক কারণ ও মাধ্যম।

সন্তানের ধনসম্পদে পিতা-মাতা এ অধিকার কেবল সন্তানের মৃত্যুর পর মিরাস হিসাবেই নয়; বরং তার জীবদ্দশায়-ই এ অধিকার স্বীকৃত।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন- "সন্তান পিতার অতি উত্তম উপার্জন বিশেষ, অতএব তোমরা পিতা-মাতা সন্তানদের ধনসম্পদ থেকে পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ সহকারে পানাহার কর।"[২]

এক ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার মাল–সম্পদ রয়েছে আর সন্তান-সন্ততিও আছে। কিন্তু এমতাবস্থায় আমার বাবা আমার মাল নিতে চায়, এ সম্পর্কে আপনার কি রায়? হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ- "তুমি আর তোমার মাল-সম্পদ সবই তোমার বাবার।"[৩]

এ পর্যায়ের কয়েকটি হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম শাওকানী লিখেছেন, এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পিতা-মাতা তার সন্তানের মাল-সম্পদ ন্যায়ত অংশীদার। এতএব সন্তান অনুমতি দিক আর নাই দিক পিতা-মাতা তার সন্তানের মাল-সম্পদ থেকে পানাহার করতে পারে এবং তা নিজের মালের মতই ব্যয়-ব্যবহারও করতে পারে-যতক্ষণ না সে ব্যয়-ব্যবহার বেহুদা ও নির্বুদ্ধিতার খরচের পর্যায়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, স্বচ্ছল অবস্থায় সন্তানের কর্তব্য হচ্ছে গরীব পিতা-মাতাকে সাহায্য দান করা।

---

[1] আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াতঃ ২১৫।

[2] ইমাম আহমদ, আল–মুসনাদ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৮০

[3] ইমাম ইবনে মাজাহ, আস–সুনান, পূর্বোক্ত, পৃ.৬৭৫

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা শাওকানী লিখেছেনঃ "দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত পিতা-মাতার জন্যে অর্থ ব্যয় করা যে স্বচ্ছল অবস্থায় সন্তানের পক্ষে ওয়াজিব-এ সম্পর্কে শরীয়াবিদদের ইজমা হয়েছে।

পিতামাতার অধিকার সন্তানের উপর এত বেশী যে, তাদের অনুমতি ছাড়া জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি কাজেও যোগদান করা জায়েজ নয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, "এক ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)- এর কাছে এসে জিহাদে যোগদান করার অনুমতি চাইলে তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার পিতা-মাতা জীবিত আছে কি? লোকটি বললঃ জি, বেঁচে আছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ তাহলে তুমি তাঁদের খেদমতেই লেগে যাও। এটাই তোমার জিহাদ।"[১]

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সন্তানের প্রতি পিতামাতার অসীম ও অসাধারণ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ পূর্বক তাদের প্রতি সর্বতোভাবে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এক পর্যায়ে শেষ কথা বলা হয়েছে এই যে, এসব এবং এ ধরনের ক্ষণস্থায়ী ও সাময়িক খেদমতের কাজ করলেই পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন শেষ হয়ে যায় না; বরং তাদের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে অবিরত দোয়াও করতে হবে। সে দোয়ার ভাষাও আল্লাহ তাআলাই শিখিয়ে দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে,

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

"ভালবাসা ও শ্রদ্ধায় তাদের জন্য বিনয়ে দু বাহু বিছিয়ে (বাড়িয়ে) দাও। তাদের জন্য প্রার্থনা করে বল: 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমার মা–বাবার উপর দয়া করুন, যেভাবে শৈশবে তারা আমার উপর দয়া করেছিলেন।"[২]

তার মানে, আমি যখন শিশু ছিলাম, তখন আমার কিছুই করার ক্ষমতা ছিলো না, তখন এই পিতা-মাতার স্নেহ যত্নপূর্ণ লালন-পালন আমি লাভ করেছিলাম বলেই এ দুনিয়ায় আমার বেঁচে থাকা সম্ভব হয়েছে। তখন আমার সে অক্ষমতার সময়ে যেমন তাদের লালন-পালন আমার জন্যে অপরিহার্য ছিল, আজ তারা তেমনি অক্ষম হয়ে পড়েছে, এখন তাদের প্রতি রহমত করা হে আল্লাহ তাআলা তোমারই ক্ষমাতাধীন।

---

[1] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী, সহীহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২১

[2] আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ২৪

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে, এ সকল মর্যাদা ও অধিকারের পাশাপাশি ইসলাম মায়ের জন্যও পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ পাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। মা তাঁর সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে কখনো পূর্ণ সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পাবে আর কখনো ছয়ভাগের একভাগ পাবে।[1] এভাবে ইসলাম নারীকে মারূপে তার আসনে সম্মানজনক ভাবে অধিষ্ঠিত করেছেন।

ইসলামে স্ত্রীরূপে নারী

বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, ইহা ক্ষণস্থায়ী নহে, বরং ইহা শাশ্বত, চিরস্থায়ী। আর বিবাহ বন্ধন হতেই একজন পুরুষ ও একজন নারীর দাম্পত্য জীবনের সূচনা হয় এবং তখন হতেই তাদের পরস্পরের উপর কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত হয়ে থাকে। এই দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালনের উপরই জীবনের সুখ-শান্তি নির্ভর করে।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজে স্ত্রী হিসেবেও নারীদের চরম অমর্যাদা ও অপমান ভোগ করতে হত। তাদেরকে স্বামীর ঘরে যথাযোগ্য মর্যাদা বা অধিকার দেওয়া হত না। তাদেরকে হীন, নগণ্য ও দয়ার পাত্রী মনে করা হত। নিতান্ত দাসী-বাঁদীর মত ব্যবহার করা হত তাদের সাথে। ইসলাম স্ত্রী হিসেবে নারীদের এ অপমান দূর করে তাদেরকে সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে। প্রথমত ঘোষণা করা হয়েছে, তারা নারী বলে মৌল অধিকারের দিক দিয়ে, পুরুষদের তুলনায় কিছুমাত্র কম নয়। বলা হয়েছে,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"স্ত্রীদের ও তেমনি অধিকার রয়েছে যেমন স্বামীদের রয়েছে তাদের উপর এবং তা যথাযথভাবে আদায় করতে হবে।[2]

অন্য কথায়, স্ত্রী ও স্বামী উভয়েই আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণ সমান। তাদের অধিকারও অভিন্ন এবং এ দুয়ের মাঝে এক্ষেত্রে কোনোই পার্থক্য করা যেতে পারে না। মৌল অধিকারের দিক দিয়ে কেউ কম নয়, কেউ বেশী নয়।

---

[1] দেখুন: সূরা নিসা এবং সিহাহ সিত্তাহ ও অন্যান্য সহীহ হাদীসগ্রন্থগুলোর কিতাবুল ফারাইয

[2] আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত: ২২৮

Dhaka University Institutional Repository

আরব সমাজে স্ত্রীদের উপর নানাভাবে অকথ্য জুলুম ও পীড়ন চালানো হত। কোনো কোনো স্বামী তাদের ব্যভিচার ও বিয়ের মাঝামাঝি অবস্থানে দ্বিধান্বিত অবস্থায় রেখে দিত। না পেত তারা স্ত্রীত্বের পূর্ণ অধিকার, না পেত তাদের কাছ থেকে মুক্তি ও নিষ্কৃতি। স্বামী একদিকে যেমন তাদের পুরাপুরি স্ত্রীর মর্যাদা ও অধিকার দিত না, অন্যদিকে তেমনি তালাকদিয়ে মুক্ত করে অন্য স্বামী গ্রহণের সুযোগও দিত না। বরং এভাবে আটকে রেখে তাদের নিকট থেকে নিজেদের দেওয়া ধন সম্পদ ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালাত এবং সে জন্যে নানা কৌশল অবলম্বন করতো। ইসলাম পূর্বযুগে স্বামীরা এটাকে নেওয়ার চেষ্টা চালাত এবং সে জন্যে নানা কৌশল অবলম্বন করতো। ইসলাম এটাকে সমর্থন করে না। আর তাই কুরআন মাজীদ এর প্রতিবাদ করেছে তীব্র ভাষায়। রয়েছে,

وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ

"তোমরা হে স্বামীরা তাদের (স্ত্রীদের) বেঁধে আটকে রাখবেনা এ উদ্দেশ্যে যে, তাদের নিকট থেকে তোমাদের দেওয়া ধন-সম্পদের কিছু অংশ কেড়ে নেবে।"[১]

ইসলাম নারীকে স্ত্রীরূপে পূর্ণ-মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এক সময় স্ত্রীদের ঘরের অন্যান্য মাল সামানের মতই অস্থাবর সম্পত্তি বলে মনে করা হত এবং স্বামী মারা গেলে তার স্ত্রীকে পরিত্যক্ত মাল সম্পত্তির ন্যায় উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হত। কুরআন মাজীদে এ সম্পর্কে ঈমানদার লোকদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا

"হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা মেয়েদেরকে অন্যায় জবরদস্তি করে নিজেদের মীরাসের সম্পদ বনিয়ে নিও না-তা তোমাদের পক্ষে আদৌ হালাল হবে না।[২]

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বলেছিলেন, "তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে অবশ্যই ভয় করে চলবে। তোমাদের মনে রাখতে হবে যে,

---

[১] আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াতঃ ১৯

[২] আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াতঃ ১৯

Dhaka University Institutional Repository

তোমরা তাদের গ্রহণ করেছে আল্লাহর নামে এবং এভাবেই তাদের হালাল মনে করে তোমরা তাদের উপভোগ করেছ।[১]

এই পর্যায়ে হযরত ফারুক (রা)এর একটি কথা উল্লেখ্য। তিনি বলেছিলেন, "আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, জাহিলিয়াতের যুগে আমরা মেয়েলোকদের কিছুই মনে করতাম না-কোনোই গুরুত্ব দিতাম না। পরে যখন আল্লাহ তা'আলা তাদের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে অকাট্য বিধান নাযিল করলেন এবং তাদের জন্য মীরাসের অংশ নির্দিষ্ট করে দিলেন, তখন আমাদের মনোভাবে ও আচরণের আমূল পরিবর্তন সাধিত হল।"[২]

ইসলামে স্ত্রী হিসাবে নারীকে যে উঁচু মর্যাদা ও সম্মান দেওয়া হয়েছে দুনিয়ার অপর কোনো সম্মানের সাথেই তার তুলনা হতে পারে না। কুরআন মজীদে ঘোষণা করেছেন, "তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক।[৩]

কুরআন মজীদে স্বামী ও স্ত্রীকে পরস্পরের পোশাক বলে উল্লেখ করা হয়েছে এর অর্থ হলো পোশাক যেমন দেহের সাথে মিলে মিশে ও মানব দেহকে বাহিরের অনিষ্ট হতে রক্ষা করে, স্বামী ও স্ত্রী ঠিক তদ্রুপ পরস্পর মিলে মিশে থাকবে এবং একে অন্যকে সংরক্ষণ করবে।

এ আলোচনা হতে পরিস্ফুট হয়ে উঠে যে, নারীকে স্ত্রীরূপে তার যোগ্য মর্যাদা প্রদানে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মে এত জরুরী তাগিদ নেই। কুরআন হাদীস দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয়, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক দুনিয়াতেই নিঃশেষ হয়ে যায় না; বরং উভয়ে মুসলমানরূপে ইনতিকাল করলে তারা বেহেশতেও স্বামী-স্ত্রীরূপে পরম সুখে বসবাস করার সৌভাগ্য লাভ করবে। কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً- فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا- عُرُبًا أَتْرَابًا- لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ-

"তাদের স্ত্রীদেরকে আমি বিশেষ ভাবে সম্পূর্ণরূপে নতুন করে সৃষ্টি করব এবং তাদেরকে চিরকুমারী বানিয়ে দিব। তারা হবে স্বামীদের প্রতি সোহাগিনী, আসক্ত ও বয়সে তাদের সমান; ডান পার্শ্বস্থ অর্থাৎ নেককার লোকদের জন্য।"[১]

---

[1] ইমাম মুসলিম, আস–সহীহ, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৪১

[2] ইমাম মুসলিম, আস–সহীহ, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৭৫

[3] আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াতঃ ১৮৭

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে ইসলামই সর্বকালে নারীকে পূর্ণমর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

হালাল উপায়ে যৌন বাসনা পূরণের একমাত্র পন্থা হলো বিবাহ। কিন্তু হইা কেবল যৌন বাসনা চরিতার্থ করার সম্পর্ক নহে; বরং আল্লাহ তা'আলা ভালবাসা, প্রেম-প্রীতি ও আন্তরিকতার এই সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে দিয়েছেন যেন তারা পরস্পর শান্তিতে বসবাস করতে পারে এবং তাঁর সৃষ্টির কারখানা টিকে থেকে মানব-সভ্যতা গড়ে উঠে। কুরআন মজীদে আল্লাহ পাক বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে এটাও অন্যতম যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পেতে পার এবং এ জন্য তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পারিক ভালবাসা ও মমতা সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় চিন্তাশীল জাতির জন্য এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে।"[2]

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

"তিনি আল্লাহ, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তার মধ্য থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন, যেন সে তার স্ত্রীর নিকট শান্তি লাভ করে। এরপর যখন সে তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে তখন সে হালকা গর্ভধারণ করে, যা নিয়ে সে অনায়াসে চলাফেরা করতে পারে। এরপর গর্ভ যখন ভারী হয়ে যায়, তখন তারা উভয়ে তাদের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেঃ আপনি যদি আমাদেরকে একটি পরিপূর্ণ সন্তান দান করেন তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হব।"[৩]

এ আলোচনা হতে পরিস্ফুট হয়ে উঠে যে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে হৃদ্যতা, আন্তরিকতা, ভালবাসা ও প্রেম প্রীতিই দাম্পত্য জীবনের ভিত্তি এবং এর মাধ্যমেই সুখময় জীবন গড়ে উঠে।

---

[1] আল-কুরআন, সূরা ওয়াকিয়া, আয়াতঃ ৩৫-৩৮

[2] আল-কুরআন, সূরা রুম, আয়াতঃ ২১

[3] আল-কুরআন, সূরা আরাফ, আয়াতঃ ১৮৯

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন মজীদে আরও বর্ণিত আছে, "নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে।"[1]

স্বামী স্ত্রীর উপর কর্তা, অভিভাবক ও দায়িত্বশীল, উল্লিখিত আয়াতই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তবে কর্তৃত্ব অর্পণের সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, ইহা যথাযথভাবে পালন না করলে মহান আল্লাহর দরবারে জবাবদিহী করতে হবে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে,

عن ابن عمر رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالامام الذى على الناس راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع على اهل بيته وهو مسئول عن رعيته والامرأة راعية على اهل بيت زوجها وولده وهى مسئولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه الا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته –

"সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অত:পর ইমাম বা নেতা, যিনি জনগণের ওপর দায়িত্ববান-তিনি তার প্রজাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবেন। আর ব্যক্তি, যে তার পরিবারের সদস্যদের দায়িত্বশীল– সে তার পরিবারের সদস্যদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী দায়িত্বশীল তার স্বামীর সম্পদ, সন্তান, সংসারের। সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আর দাস ব্যক্তি তার মনিবের সম্পদের দায়িত্বশীল এবং সে এই মালের দায়িত্ব সম্পর্কেই জিজ্ঞাসিত হবে। কাজেই সতর্ক হও! প্রত্যেকেই তোমরা সংরক্ষক এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"[2]

হযরত রাসুলুল্লাহ (সা) আরও বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া তার উচিত নয়। আর আমি তোমাদের নারীদের সাথে উত্তম ব্যবহারের উপদেশ দিচ্ছি। কারণ, (পুরুষের) বুকের পাশের বক্র হাড় দ্বারা নারী সৃষ্ট হয়েছে এবং এর উপরের অংশই সর্বাধিক বাঁকা। তুমি যদি একে একেবারে সোজা করতে চেষ্টা কর, তবে তা

---

[1] আল-কুরআনঃ সূরা বাকারা, আয়াত: ২২৮

[2] ইমাম বুখারী, আস–সহীহ, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৯৮

Dhaka University Institutional Repository

ভেঙ্গে যাবে। আর একে সোজা করতে চেষ্টা না করলে তা বাঁকাই থেকে যাবে। অতএব আমি তোমাদেরকে নারীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে উপদেশ দিচ্ছি।[১]

স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহারের জন্য স্বামীদেরকে জোর তাকীদ দেওয়া হয়েছে। বস্তুত স্বামীদের সদ্ব্যবহার পাওয়ার একটা বিশেষ অধিকার স্ত্রীদের আছে। বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিই হলো প্রাণঢালা প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা। আর এর দাবিই হলো একাত্মতা, দয়া, সদাচরণ, ও সহানুভূতি, আচার-আচরণ ও মধুর সাহচর্যে স্বামী স্ত্রীকে মুগ্ধ করে তুলবে এটাই তো একান্ত ভাবে কাম্য।

কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"আর স্ত্রীদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর। তোমরা যদি তাদেরকে ঘৃণা কর, তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন ইহাকে ঘৃণা করছ।"[২]

স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ ও সদ্ব্যবহারের সঙ্গে জীবন যাপন করার নির্দেশ এ আয়াতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তব জীবনে সৌন্দর্যহীনতা ও কোনো ত্রুটির কারণে স্ত্রী স্বামীর পছন্দসই না ও হতে পারে। এমতাবস্থায় মনক্ষুন্ন হয়ে অকস্মাৎ তাকে পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা স্বামীর পক্ষে সঙ্গত নয়; বরং যথাসম্ভব ধৈর্য্য ও সহনশীলতা অবলম্বন করা উচিত।

একটি পরিবারের মৌলিক দু'জন সদস্য হলো স্বামী এবং স্ত্রী। তাদের সম্পর্কের ভিত্তি বিবাহ। এই সম্পর্ক দু'টি বিশেষ গুণদ্বারা প্রভাবিত হবে। এর উল্লেখ রয়েছে পবিত্র আল-কুরআনে, এর একটি হলো ভালবাসা, অপরটি হলো সুবিবেচনা বা দয়া।

ভালবাসার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় শারীরিক সম্পর্ক, বন্ধুত্ব এবং প্রগাঢ় অনুভূতি। এর অবশ্যই গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু সুবিবেচনা, দয়া এবং ক্ষমা ছাড়া সুন্দর পরিবার গড়ে উঠতে পারে না। মানুষ দুর্বল। সাময়িক উত্তেজনায় ধৈর্য্য হারা হয়, ভুল করে বসে। পারস্পরিক ত্রুটির প্রতি ক্ষমা এবং দয়া না থাকলে প্রতিক্ষেত্রেই চুলচেরা বিচার করিয়ে শাস্তি দেয়ানো যায়, কিন্তু শান্তি পাওয়া যায় না।

---

[১] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী, সহীহ, পূর্বোক্ত, পৃ.১২১

[২] আল-কুরআন, ৪, আয়াতঃ ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

মানব জাতির যাত্রা শুরু হয় এক থেকে। স্বামী এবং স্ত্রীর মূল সূত্র এক। আদি মাতা হাওয়া (আঃ) সৃষ্টি হন আদি পিতা আদম (আঃ) থেকে। তাঁদের মধ্যে বিরাজিত ছিলো সাম্য ও সম্প্রীতি। যেহেতু এক থেকে দুই হয়েছে, তাই একজন পাবে অন্যের মধ্যে "সাকান" বা শান্তি। আর এভাবেই ইসলাম নারী জাতিকে স্ত্রীরূপে তার মর্যাদায় সমাসীন করেছে।

স্বামী-স্ত্রী মধ্যে মনকষাকষি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আর এ সুযোগে শয়তান পরস্পরের মনে নানারূপ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে কম চেষ্টা করে না। আর তাই সামান্য কারণে স্ত্রীর প্রতি ঘৃণা জমে উঠতে পারে। এ কারণেই হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "কোন মুসলিম পুরুষ যেন কোনো মুসলিম মহিলাকে তার কোনো একটি অভ্যাসের কারণে ঘৃণা না করে। কেননা একটি অপছন্দ হলে অন্য আরো অভ্যাস দেখে সে খুশী ও হয়ে যেতে পারে।"[১]

কেননা, কোনো নারীই সম্পূর্ণরূপে অশ্লীলতা, মন্দ ও খারাবীর প্রতি মূর্তি হয় না। কিছু দোষ থাকলেও অনেকগুলো ভালোগুণও তার থাকতে পারে। সে কারণে কোনো কিছু খারাপ লাগলে অমনি অস্থির, চঞ্চল ও দিশেহারা হয়ে যাওয়া উচিত নয়। তার অপরাপর ভালদিকে উন্মেষ ও বিকাশ লাভের সুযোগ দেওয়া এবং সে জন্যে অপেক্ষা করা স্বামীর কর্তব্য। আল্লামা আহমাদুল বান্না উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ কোনো মুমিনের উচিত নয় অপর কোনো মুমিন স্ত্রীলোক সম্পর্কে পূর্ণ মাত্রায় ঘৃণা পোষণ করা, যার ফলে চূড়ান্ত বিচ্ছেদের কারণ দেখা দিতে পারে। বরং তার কর্তব্য হচ্ছে মেয়েলোকটির ভাল গুণের খাতিরে তার দোষ ও খারাবী ক্ষমা করে দেওয়া আর তার মধ্যে ঘৃণার্হ যা আছে, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করা, বরং তার প্রতি ভালবাসা জাগাতে চেষ্টা করা। হতে পারে তার স্বভাব-অভ্যাস খারাপ; কিন্তু সে বড় দ্বীনদার কিংবা সুন্দরী রূপসী বা নৈতিক পবিত্রতা ও সতীত্ব সম্পন্না অথবা স্বামীর জন্যে জীবন সঙ্গিনী।[2]

উক্ত হাদীস সম্পর্কে আল্লামা শাওকানী লিখেছেনঃ এ হাদীসে স্ত্রীদের সাথে খুব ভাল ব্যবহার ও ভালভাবে বসবাস করার নির্দেশ যেমন আছে, তেমনি তার কোনো এক অভ্যাস স্বভাবের কারণেই তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে নিষেধ ও করা হয়েছে। কেননা তার মধ্যে অশ্যাই এমন কোনো গুণ থাকবে, যার দরুণ সে তার প্রতি খুশী হতে পারবে।

---

[1] ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৬

[2] আহমাদুল বান্না, *ইসলামে নারী*, অনুবাদ: আখতার ফারুক, ঢাকা ২০০২, পৃ.২৬

Dhaka University Institutional Repository

এজন্যে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) স্বামীদের স্পষ্ট নসীহত করেছেন। বলেছেনঃ "তোমরা স্ত্রীদের সাথে সবসময় কল্যাণময় ব্যবহার করার জন্যে আমার নসীহত কবুল করো। কেননা নারীরা জন্মগত ভাবেই বাঁকা স্বভাবের হয়ে থাকে। তুমি যদি জোর পূর্বক তাকে সোজা করতে চাও, তবে তুমি তাকে চূর্ণ করে দেবে। আর যদি তাকে অমনি ছেড়ে দাও তবে সে সব সময় বাঁকা থেকে যাবে। অতএব বুঝে শুনে তাদের সাথে ব্যবহার করার আমার এ উপদেশ অবশ্যই গ্রহণ করবে।[১]

উক্ত হাদীসের মানে বদরুদ্দীন আইনীর ভাষায় নিম্নরূপঃ "আমি মেয়েলোকদের প্রতি ভাল ব্যবহার করার জন্যে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা তাদের সম্পর্কে আমার দেওয়া এ নসীহত অবশ্যই কবুল করবে। কেননা তাদের সৃষ্টিই করা হয়েছে পাঁজরের হাড় থেকে।[২]

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ মেয়েলোক পাঁজরের হাড়ের মত। তাকে সোজা করতে চাইবে তো তাকে চূর্ণ করে ফেলবে, আর তাকে ব্যবহার করতে প্রস্তুত হলে তার স্বাভাবিক বক্রতা রেখেই ব্যবহার করবে।[৩]

এ হাদীস থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো যে, নারীদের স্বভাবে বক্রতা স্বভাবগত ও জন্মগত। এ বক্রতা সম্পূর্ণরূপে দূর করা কখনো সম্ভব হবে না। তবে তাদের আসল প্রকৃতিকে বজায় রেখেই এবং তাদের স্বভাবকে যথাযথভাবে থাকতে দিয়েই তাদেরকে নিয়ে সুমধুর পরিবারিক জীবন গড়ে তোলা যেতে পারে, সম্ভব তাদের সহযোগিতায় কল্যাণময় দাম্পত্য জীবন ও সমাজ গড়া। আর তা হচ্ছে, তাদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা, তাদের সাথে অত্যন্ত দরদ, নম্রতা ও সদিচ্ছাপূর্ণ ব্যবহার করা তাদের মন রক্ষা করতে শেষ সীমা পর্যন্ত যাওয়া এবং যেতে রাজী থাকা। এ ধরনের কথার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নারী সমাজের জটিল ও নাজুক মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে পুরুষ সমাজকে অত্যাধিক সতর্ক ও সাবধান করে তোলা। এ কথার ফলে পুরুষরা নারীদের সমীহ করে চলবে, তাদের মনস্তত্ত্বের প্রতি নিয়ত খেয়াল রেখেই তাদের সাথে আচার ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ হবে। এ কারণে পুরুষদের কাছে নারীরা অধিকতর আদরনীয়া হবে। এতে তাদের দাম বাড়ল বৈ কমলা না একটুকুও।[৪]

---

[1] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী, *সহীহ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১২

[2] আহমাদুল বান্না, *ইসলামে নারী*, পূর্বোক্ত, পৃ.২৯

[৩] ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল কুশায়রী, *সহীহ*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১০৯

[4] আহমাদুল বান্না, *ইসলামে নারী*, পূর্বোক্ত, পৃ.৫১

মহান আল্লাহ যখন স্বামীর উপর স্ত্রীর বিশেষ অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা পরিবর্তন করার ক্ষমতা কার আছে? আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত স্ত্রীর এ অধিকার স্বামী আদায় না করলে তাকে অবশ্যই পরকালে বান্দার হক নষ্ট করার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। কুরআন মজীদে কত সুন্দর পদ্ধতিতে নারীদের পক্ষে সুপারিশ করে বলা হয়েছে, "স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ করো, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করেছো, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।"[১]

স্ত্রীকে পছন্দ না হওয়ার পেছনে অবশ্যই কোনো কারণ থাকবে। স্ত্রীর আখলাক ও চরিত্র সুন্দর না হওয়াই পছন্দ না হওয়ার অন্যতম কারণ হয়ে থাকে। স্ত্রী সুন্দরী ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী না হলে স্বামীর জন্য তা খুবই কষ্টকর হয়। এজন্য আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াতে যেন প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, স্ত্রীর অসুন্দর চরিত্রকে তিনি কল্যাণ লাভের কারণে পরিণত করবেন। আল্লাহ মহাশক্তি ও প্রজ্ঞার অধিকারী। পৃথিবীতে এমন কিছু নেই, যা তিনি করতে সক্ষম নন। অসৎ চরিত্রের স্ত্রীর গর্ভে তিনি এমন নেক সন্তান দান করতে পারেন, যে কিয়ামত দিবসে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য নাজাতের কারণ হয়ে যেতে পারে।

ইসলামে স্ত্রীদের উপর অত্যাচার করা নিষেধ

ইসলামে নারীকে স্ত্রীরূপে প্রতিটি ক্ষেত্রে তার যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদানের নজির রেখেছে। নারীরা খুব কষ্ট সহিষ্ণু অল্পে সন্তুষ্ট, স্বামীর জন্যে জীবন প্রাণ উৎসর্গ করতে সতত প্রস্তুত। সন্তান গর্ভে ধারণ, সন্তান প্রসব ও সন্তান লালন পালনের কাজ নারীরা, মায়েরা যে কতখানি কষ্ট সহ্য করে সম্পন্ন করে থাকে, পুরুষদের পক্ষে তা অনুমান পর্যন্ত করা সহজ নয়। এ কাজ একমাত্র তাদের পক্ষেই করা সম্ভব। ঘর-সংসারের কাজ করায় ও ব্যস্থাপনায় তারা অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত, একান্ত বিশ্বাসভাজন ও একনিষ্ঠ। তাই বলা যায়, তাদের মধ্যে দোষের তুলনায় গুণের দিক অনেক গুণ বেশী।[২]

সুতরাং ইসলাম ধর্মে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ক্ষমাশীলতাই দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য ও স্থায়িত্বের জন্যে একান্ত অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেছেন। যে স্বামী স্ত্রীকে ক্ষমা করতে পারে না, ক্ষমা করতে জানে না, কথায় কথায় দোষ ধরাই যে স্বামীর স্বভাব, শাসন ও ভীতি প্রদর্শনই যার কথার ধরণ, তার পক্ষে নারীকে স্ত্রী হিসেবে সঙ্গে নিয়ে স্থায়ীভাবে জীবন যাপন করা সম্ভব হতে পারে না। স্ত্রী হিসেবে বাণী

---

[1] আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াতঃ ১৯

[2] ইসহাক ওবায়দী, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৯

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রতি ক্ষমা সহিষ্ণুতা প্রয়োগের ও নির্দেশ দেয়া হয়েছে কুরআন মাজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"হে মুমিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু; অতএব তাদের ব্যাপারেও তোমরা সাবধান থাক। তোমরা যদি তাদেরকে ক্ষমা কর, তাদের দোষ-ত্রুটি না ধর এবং তাদেরকে ক্ষমা কর, তাহলে জেনে রেখ, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।"[১]

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর স্ত্রীদের অনেক বাড়াবড়িই মাফ করে দিতেন। হযরত উমর ফারুকের বর্নিত একদিনের ঘটনা থেকে তা বাস্তব ভাবে প্রমাণিত হয়। হযরত উমর (রাঃ) একদিন খবর পেলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর বেগমগণকে তাদের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি কারণে তালাক দিয়েছেন। তিনি এ খবর শুনে খুবই ভীত হয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট উপস্থিত হলেন। জিজ্ঞেস করলেনঃ আপনি আপনার বেগমদের তালাক দিয়েছেন? হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর সাথে হাসিমুখে কথাবার্তা বলেছেন।[২] যা থেকে প্রমাণ হয় তিনি তাঁদেরকে তালাক দেননি। হযরত উমর (রা) বিষয়টি নিয়ে বেশি চিন্তিত ছিলেন, কারণ তাঁর কন্যা হাফসা (রা) উম্মুল মুমিনীন হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। কোনভাবেই হযরত উমর (রা) এ সৌভাগ্য থেকে নিজেকে এবং নিজের কন্যাকে বঞ্চিত দেখতে চাননি।

এ হাদীসকে ভিত্তি করে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেন, এ ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীদের পীড়ন ও বাড়াবাড়িতে ধৈর্য ধারণ করা, তাদের দোষ-ত্রুটির প্রতি বেশী গুরুত্ব না দেওয়া এবং স্বামীর অধিকারের পর্যায়ে তাদের যা কিছু অপরাধ বা পদস্খলন হয়, তা ক্ষমা করে দেওয়া স্বামীর একান্তই কর্তব্য। ইসলাম এভাবেই নারীদের অধিকার সমুন্নত রেখেছে। ইসলাম মানবতার ধর্ম। এ ধর্মে অন্যান্য ধর্মের মত নারীকে পণ্য হিসেবে না দেখে তাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে সোচ্চার ভূমিকা পালন করে।[৩]

---

[1] আল-কুরআন, সূরা তাগাবুন, আয়াতঃ ১৪

[2] ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, পূর্বোক্ত, পৃ.৩০৩

[৩] বদরুদ্দীন আইনী, *উমদাতুল ক্বারী*, ২য় খণ্ড, দিল্লী, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা-১৮৩

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষ মানুষের জন্য তাদের স্ত্রীদের জুলুম অত্যাচার করা, স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়া ও দাম্পত্য জীবনকে বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত করাও ইসলামে নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতটি উল্লেখ করা যেতে পারে। বলা হয়েছে,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও আর তাদের ইদ্দত[1] পূর্ণ হওয়ার সময় নিকটবর্তী হয় তখন তোমরা হয় তাদেরকে নিয়ম অনুসারে ফিরিয়ে নেবে অথবা নিয়ম মত মুক্ত করে দেবে। কিন্তু নির্যাতন করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকে রাখবে না। যে এমন করে সে নিজের প্রতিই যুলম করে। আল্লাহর বিধানকে তোমরা ঠাট্টার বিষয়ে পরিণত কর না বরং তোমরা আল্লাহর নিআমাতের কথা স্মরণ কর, যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন। স্মরণ কর কিতাব ও হিকমাত থেকে যা তিনি তোমাদের উপর নাযিল করেছেন তা, যা দিয়ে তিনি তোমাদের উপদেশ দান করেন। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। জেনে রেখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে জানেন।"[2]

স্ত্রীকে কোনো প্রকার অকারণে কষ্ট দেওয়া বা তার ক্ষতি করা যে নিষেধ, তা এ আয়াত থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। আরও বোঝা যাচ্ছে যে, নিজের স্ত্রীকে যে লোক কষ্ট দেবে, জুলুম-নিপীড়ন করবে। পরিণামে তার নিজের জীবনই নানাভাবে সমস্যায় জর্জরিত হয়ে উঠবে, সে নিজেই কষ্ট পাবে, তার দাম্পত্য জীবন দুঃসহ তিক্ততায় পূর্ণ হয়ে যাবে এবং স্ত্রীর সাথে মধুর সম্পর্ক বজায় রাখলে যে শান্তিপূর্ণ সুখময় জীবন যাপন সম্ভব, তা থেকে সে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

বস্তুত স্ত্রীদের সাথে মিষ্টি ও মধুর ব্যবহার করা এবং তাদের কোনোরূপ কষ্ট না দিয়ে শান্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা তা'আলা স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও যদি কেউ তার স্ত্রীকে অকারণ জ্বালা-যন্ত্রণা দেয়, ক্ষতিগ্রস্থ করতে চেষ্টিত হয়, তবে সে আল্লাহর নির্দেশনা

---

[1] স্বামীর মৃত্যু অথবা তালাকের পর যে সময়সীমার মধ্যে বিয়ে করা স্ত্রীর জন্য বৈধ নয়, সে সময়সীমাকে ইদ্দত বলে।

[2] আল-কুরআন, ২:২৩১।

Dhaka University Institutional Repository

অমান্য করার কারণে আল্লাহর গজব পড়ার যোগ্য হবে। আল্লামা আলুসীর মতে তার নিজের কষ্ট ও ক্ষতি হবে।[১]

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর নিজের ভাষায় স্ত্রীদের মারপিট করতে স্পষ্ট নিষেধ করেছেন। বলেছেন, "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে, তোমাদের অর্ধাঙ্গিনীগণকে এমন নির্মমভাবে মারধোর করো না, যেমন করে তোমরা মেরে থাকো তোমাদের ক্রীতদাসীদের।"[২]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জামায়াত (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের কেউ যেন তার স্ত্রীকে ক্রীতদাসদের মারার মত না মারে, আর মারধোর করার পর দিনের শেষে তার সাথে যেন যৌন সঙ্গম না করে।"[৩]

অর্থাৎ স্ত্রীর সাথে যৌন-সঙ্গম করা তো এক স্বাভাবিক কাজ, কিন্তু একদিকে মারধোর করা অপরদিকে সেদিনই তার সাথে যৌন সঙ্গম করা অত্যন্ত ঘৃর্ণাহ কাজ। এ দুয়ের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। স্ত্রীদের মারধোর করা, গালাগাল করা এবং তাদের সাথে কোনোরূপ অন্যায় জুলুম জাতীয় আচরণ করতে নিষেধ করে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "তোমাদের স্ত্রীদের আদৌ মারধোর করবে না এবং তাদের মুখমণ্ডলকে কুশ্রী ও কদাকার করে দিওনা।[৪]

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেছেন, আল্লাহর দাসীদের তোমরা মারধোর করো না।[৫]

লক্ষণীয় যে, স্ত্রীদেরকে এখানে 'আল্লাহ তাআলার দাসী' বলা হয়েছে, পুরুষদের বা স্বামীদের দাসী নয়। তাই তাদের অকারণে মারধোর করা কিংবা তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করার কোনো অধিকার স্বামীদের নেই।[৬]

---

[1] আহমাদুল বান্না, *ইসলামে নারী*, পূর্বোক্ত, পৃ.২০

[২] ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, পৃ.-১৭৯

[3] ইমাম বুখারী, *সহীহ*, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৮৭

[৪] ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০৭

[5] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

[6] আহমদ আন্দালুসী, *আল-মুসনাদ*, কায়রো, ১৪০০ হিজরি, পৃ.২১৬

Dhaka University Institutional Repository

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে, "তোমরা স্ত্রীদের মুখের উপর মারবে না, মুখমণ্ডলের উপর আঘাত দেবে না, তাদের মুখের শ্রীবিনষ্ট করবে না, অকথ্য ভাষায় তাদের গালাগাল করবে না এবং নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কোথাও তাদের বিচ্ছিন্নাবস্থায় ফেলে রাখবে না।[১]

উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী লিখেছেন, হাদীসটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীকে খুব হালকাভাবে সামান্য মারধোর করা জায়েয।[২]

মারধোর করা কখন ও কি কারণে করা সঙ্গত?.... এ পর্যায়ে প্রথমে কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে পাঠ করা যেতে পারে। আয়াতটি হল,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

"পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল, দায়িত্বশীল। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদের একজনের উপর অন্যজনকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এ জন্য যে, পুরুষেরা তাদের স্ত্রীদের জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে। কাজেই সৎকর্মশীল নারীরা অনুগত হয়। আল্লাহ তাদেরকে যা হিফাযত করতে বলেছেন তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে তা হিফাযত করে। স্ত্রীদের মধ্যে তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে সুন্দর উপদেশ দাও, এরপর তাদের শয্যা বর্জন কর এবং প্রয়োজনে তাদের প্রহার কর[৩] এরপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অন্য কোন পথ অন্বেষণ কর না। নিশ্চয় আল্লাহ উচ্চমর্যাদাশীল, মহান।"[৪]

এ আয়াতে দুনিয়ার মুসলিম স্বামীদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে। "ভয় করা" মানে জানতে পারা অথবা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারা যে, স্ত্রী স্বামীকে মানছে না, অথচ স্বামীকে মেনে চলাই স্ত্রীর কর্তব্য। এরূপ অবস্থায় স্বামী কি করবে, তা-ই বলা হয়েছে এ আয়াতে। এখানে প্রথমে বলা হয়েছে স্ত্রীকে

---

[১] ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

[৩] এটি 'নারী নির্যাতনমূলক' প্রহার নয়। কল্যাণের জন্য বয়োজ্যেষ্ঠ্য কর্তৃক বয়োকনিষ্ঠকে শাসন। তাছাড়া তাফসীরকার-ফকিহগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন, এ প্রহার নিতান্তই মৃদু প্রহার। কোনভাবেই আহত বা রক্তাক্ত করার মত প্রহার নয়।

[৪] আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত: ৩৪

ভালভাবে বোঝাতে, উপদেশ দিতে ও নসীহত করতে, এ কথা তাকে জানিয়ে দিতে যে, স্বামীকে মান্য করে চলা, স্বামীর সাথে ভাল সম্পর্ক গড়ে তোলা ও তা বজায় রাখার জন্যে আল্লাহ তা'আলাই নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যথায় তার ইহকালীন দাম্পত্য জীবন ও পারিবারিক জীবন তিক্ত-বিষাক্ত হয়ে যাবে, আর পরকালেও তাকে আল্লাহ তাআলার আযাব ভোগ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে, অমান্যকারী স্ত্রীকে মিলন-শয্যা থেকে সরিয়ে রাখা তার সাথে যৌন সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা। অন্য কথায় তাকে না শয্যা সঙ্গী বানাবে, না তার সাথে যৌন সম্পর্ক বজায় রাখবে। আর তৃতীয়ত বলা হয়েছে তাকে মারধোর করতে। কিন্তু এ মারধোর সম্পর্কে একথা স্পষ্ট যে, তা অবশ্যই শিক্ষামূলক হতে হবে মাত্র। ক্রীতদাস ও জন্তু জানোয়ারকে যেমন মারা হয়, সে রকম প্রহার করার অধিকার কারো নেই।

স্ত্রীদের উপর অন্যায়ভাবে, অকারণে ও উঠতে বসতে আর কথায় কথায় কথায় কোনোরূপ দুর্ব্যবহার বা মারধোর করতে শুধু নিষেধ করেই ক্ষান্ত করা হয়নি, ইসলাম আরো অগ্রসর হয়ে স্ত্রীদের প্রতি সক্রিয়ভাবে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন স্বামীদেরকে। এ পর্যায়ে কুরআন মজীদের আয়াত, "স্ত্রীদের সাথে যথাযথ ভাবে খুব ভাল ব্যবহার করবে।"

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আলুসী লিখেছেন, তাঁদের সাথে ভালভাবে ব্যবহার করো। আর 'ভালভাবে' মানে এমনভাবে যা শরীয়াত ও মানবিকতার দৃষ্টিতে অন্যায় নয়, খারাপ নয়।[১] এ ভালভাবের মধ্যে এ কথাও শামিল, স্ত্রীকে মারধোর করবেনা, তার সাথে খারাপ কথাবার্তা বলবে না এবং তাদের সাথে সদা হাসিমুখে ও সন্তুষ্টচিত্রে সম্পর্ক রক্ষা করে চলবে।

তাফসীর কারকদের মতে এ আয়াত থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রী যদি ঘরের কাজকর্ম করতে অক্ষম হয় বা তাতে অভ্যস্ত না হয়, তাহলে স্বামী তার যাবতীয় কাজ করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে বাধ্য।[২]

স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার করা পূর্ণ ঈমান ও চরিত্রের লক্ষণ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম, নিষ্কলুষ সে সবচেয়ে বেশী পূর্ণ ঈমানদার। আর তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে তার স্ত্রী নিকট সবচেয়ে ভাল।[১]

---

[১] আবদুল হক দেহলভী, *আল-সুমআত*, *দিল্লী ১৩৯৮ হিজরি*, পৃ.২৮

[২] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

অপর এক হাদীসে স্ত্রীদের ব্যাপারে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিজের ভূমিকা উল্লেখ করে বলা হয়েছেঃ "তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাললোক সে, যে তার পরিবার ও স্ত্রী-পরিজনের পক্ষে ভাল। আর আমি নিজের পরিবারবর্গের পক্ষে তোমাদের তুলনায় অনেক ভাল। তোমাদের সঙ্গী-স্ত্রী বা স্বামী যদি মারা যায়, তাহলে তার কল্যাণের জন্য তোমরা অবশ্যই দোয়া করবে।[2]

স্ত্রীদের অপ্রস্তুত অবস্থায় না ফেলার তাগিদ

ইসলামে নারীদের কোনোরূপ অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলে তাদের বিব্রত করে তুলতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রয়োজন হলে তাদের অবসর দিতে হবে। দীর্ঘদিন পর হঠাৎ করে রাতের বেলা বাড়িতে উপস্থিত হলে স্ত্রী নিজেকে অপ্রস্তুত ও বিব্রত বোধ করতে পারে। এজন্য হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যদি দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাড়িতে অনুপস্থিত থাকার পর ফিরে আসে, তাহলে পূর্বে খবর না দিয়ে রাতের বেলা হঠাৎ করে বাড়িতে পৌঁছে যাওয়া উচিত নয়।[৩]

হযরত জাবির (রাঃ) বলেছেন, আমরা এক যুদ্ধে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর সঙ্গে ছিলাম। পরে যখন আমরা মদীনায় ফিরে এলাম, তখন আমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ ঘরে চলে যেতে ইচ্ছা করল। কিন্তু হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "কিছুটা অবসর দাও। রাতে ঘরে ফিরে যেতে পারবে। এই অবসরে তোমাদের স্ত্রীরা প্রয়োজনীয় সাজ-সজ্জা করে নেবে, গোপন অঙ্গ পরিচ্ছন্ন করবে এবং তোমাদের গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুতি নিতে পারবে।"[8]

মেয়েরা সাধারণত অপ্রস্তুত অবস্থায় থাকে, তাদের মাথায়ও হয়ত ঠিক মত চিরুণী করা হয় না। প্রয়োজনীয় সাজ-সজ্জায় সুসজ্জিত হয়েও তারা সব সময় থাকে না। বিশেষত স্বামীর দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতিতে মেয়েরা নিজেদের সাজ-সজ্জার ব্যাপারে খুবই অসতর্ক হয়ে পড়ে। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবিগণকে সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘদিন পরে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেও সঙ্গে সঙ্গেই সকলকে নিজের ঘরে ফিরে যেতে দিলেন না। তাদের প্রত্যাবর্তনের খবর সকলের জানা হয়ে গেছে। স্ত্রীরা নিজেদের স্বামীকে সাদরে গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুতি নিতে পারছে এই অবসরে। এ দৃষ্টিতে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর উক্ত কথার তাৎপর্য স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে। স্বামীর দীর্ঘদিনের

---

[1] ইমাম তিরমিযী, আস-সুনান, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৬৬

[2] প্রাগুক্ত, পৃ.৪৭০

[৩] মুহাম্মদ ইসমাঈল ইবনে বুখারী, সহীহ, পূর্বোক্ত, পৃ.২৩৫

[4] প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৬

Dhaka University Institutional Repository

অনুপস্থিতির কারণে স্ত্রী হয়ত ময়লা দেহ ও মলিন বসন পরিধান করে রয়েছে। তার মাথার চুলও হয়ত আচঁড়ানো হয়নি। এরূপ অবস্থায় স্বামী যখন তাকে দেখতে পাবে দীর্ঘদিনের বিরহের পর, তখন স্বামী যে নিরাশ ও নিরানন্দের বেদনায় মূষড়ে পড়বে এবং স্ত্রীও যে এরূপ অবস্থায় দীর্ঘদিনের অপেক্ষার পরও অন্তরঢালা আনন্দ সহকারে স্বামীকে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হবে, তা বুঝতে পারা দুনিয়ার স্বামী ও স্ত্রীদের পক্ষে কঠিন নয়। বস্তুত এর দরুণ স্বামীদের মন স্ত্রীর প্রতি বিরূপ ও তিক্ত বিরক্ত হয়ে যেতে পারে, আর স্ত্রীর মনও স্বামীর কাছে ছোট হয়ে যেতে পারে। এরূপ অবস্থায় স্বামী স্ত্রী কারো মন খারাপ হয়ে যাবার কোনো কারণ যাতে না ঘটতে পারে, এ জন্যই হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের উক্তরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন। অন্যথায় যারা সকালে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় আর সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে আসে, তাদের জন্যে এ রকম কিছু করণীয় নেই।

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে আমরা বুঝতে পারি যে, ইসলাম স্ত্রীকে তার সঠিক মর্যাদা পাবার সকল দিক নির্দেশনা অত্যন্ত মানবিক সুবিবেচনার সঙ্গে প্রদান করেছে।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক উপহার বিনিময়

স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রেম-ভালবাসার স্থায়িত্ব ও গভীরতা বিধানের উদ্দেশ্যে ইসলাম পরস্পরে মধ্যে উপহার-উপঢৌকন বিনিময়ের প্রথা রেখেছেন। স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীকে মাঝে মধ্যে উপহার দেওয়া। মূলত স্বামী–স্ত্রীর পারস্পারিক ভালবাসা বৃদ্ধির জন্যই মহানবী (স) তাদের মধ্যে উপহার বিনিময়ের প্রথা রেখেছেন। স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীকে মাঝে-মধ্যে নানা ধরনের চিত্তাকর্ষক দ্রব্যাদি দেওয়া। স্ত্রীর ও যথাসাধ্য তাই করা উচিত। যার যে রকম সম্বল ও সামর্থ্য, সেই অনুপাতে যদি পরস্পরের উপহার দ্রব্যের আদান-প্রদান হয়, তাহলে তার ফলে পারস্পরিক আকর্ষণ কৌতুহল ও হৃদয়াবেগ বৃদ্ধি পাবে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতি থাকবে সদা সন্তুষ্ট। এ জন্যে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর একটি সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত উপদেশ সবসময়ে স্মরণে রাখা কর্তব্য। তা হলোঃ "তোমরা পরস্পর উপহার-উপঢৌকনের আদান-প্রদান করো। দেখবে, এর ফলে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসার সৃষ্টি হয়েছে, পারস্পরিক প্রেম ভালবাসার মাত্রা বৃদ্ধি পাবে।"[১]

---

[১] ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদ, পূর্বোক্ত, পৃ.২০৯

Dhaka University Institutional Repository

অপর এর হাদীসে বলা হয়েছে, তোমরা পরস্পরে হাদিয়া তোহ্ফার আদান প্রদান করবে, কেননা হাদিয়া তোহ্ফা দিলের ক্লেদ ও হিংসা-দ্বেষ দূর করে দেয়।[১]

এর কারণ সুস্পষ্ট। মানুষের দিলে ধন-মালের মায়া খুবই তীব্র ও গভীর। তা যদি কেউ অন্য কারো নিকট থেকে লাভ করে, তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই তার মন তার দিকে ঝুঁকে পরে, আকৃষ্ট হয় এবং মাল-সম্পদ দানকারীর মন ও ঝুঁকে পরে তার প্রতি, যাকে সে দান করল।

ইবরাহীম ইবনে ইয়াজীদ নখ্‌লী বলেছেন, "পুরুষের পক্ষে তার স্ত্রীকে এবং স্ত্রীর পক্ষে তার স্বামীকে উপহার দান খুবই বৈধ কাজ।"

তিনি আরো বলেছেন, "স্ত্রী যদি স্বামীকে কিংবা স্বামী স্ত্রীকে কোনো উপহার দেয়, তবে তা তাদের প্রত্যেকের জন্যে হবে তার পাওয়া দান।"

কিন্তু এ ব্যাপারে শরীয়াতের নির্দেশ হল, কেউই অপরের দেওয়া উপহার ফেরত নিতে বা দিতে পারবে না। ইবরাহীম নাখ্‌লী বলেছেন, "এ দুয়ের কারোর পক্ষেই তার নিজের দেওয়া উপহার ফিরিয়ে নেওয়া জায়েজ নয়।"[২]

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) বলেছেন, 'এভাবে উপহার আদান-প্রদান করলে কেউই কারোটা ফিরিয়ে দেবেনা, ফিরিয়ে নেবে না।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেন, "স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে যা কিছু একবার দিয়ে দিয়েছে, তা ফেরত নেওয়া কারো পক্ষেই জায়েয নয়।"

ইবনে বাওল বলেছেন, "কারো কারো মতে স্ত্রী তার দেওয়া জিনিস ফিরিয়ে নিলেও নিতে পারে; কিন্তু স্বামী তার দেওয়া উপহার কিছুতেই ফিরিয়ে নিতে পারবে না।"

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মান-অভিমান অনেক সময় জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব করে। অনেক সময় তা সীমাতিক্রম ও করে যায়।

---

[১] ইমাম আহম্মদ, মুসনাদ, পূর্বোক্ত, ২২১

[২] বদরুদ্দীন আইনী, *উমদাতুল ক্বারী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৪৮

Dhaka University Institutional Repository

অনেক সময় কথার কাটাকাটি ও তর্ক-বিতর্কে ও পরিণত হয়ে পড়ে। রাসূলে করীম (সাঃ)- এর দাম্পত্য জীবনেও তা লক্ষ্য করা গিয়েছে। হযরত উমরের বেগম একদিন হযরত উমরকেই বললেন,

আল্লাহর কসম, নবীর বেগমরা পর্যন্ত তাঁর কথার প্রত্যুওর করে থাকেন। এমন কি তাঁদের এক-একজন রাসূলকে দিনের বেলা ত্যাগ করে রাত পর্যন্ত অভিমান করে থাকেন।[১]

তখন হযরত ওমর (রাঃ) চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে তাঁর কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসার নিকট উপস্থিত হয়ে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন ও সত্যাসত্য জানতে চাইলেন। জবাবে হাফসা হ্যাঁ-সূচক উক্তি করলেন। হযরত উমর এর পরিণাম ভয়াবহ মনে করে কন্যাকে সাবধান করে দিলেন ও বললেন, সাবধান! তুমি হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট বেশী বেশী জিনিস চাইবে না। তাঁর কথার মুখের উপর জবাব দেবে না, রাগ করে কখনো তাঁকে ত্যাগ করবে না। আর তোমার কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে তা আমার নিকট চাইবে।[২]

নিজের কন্যার দাম্পত্য জীবন সুখের হওয়ার জন্যে অর্থ ব্যয় করার একটা নির্দেশ এতে নিহিত রয়েছে। আর এ হচ্ছে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই মর্যাদা রক্ষার ব্যাপার এবং এ উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করা কর্তব্য। জামাতার নিকট মেয়ে বেশী বেশী জিনিস চাইলে তার কষ্ট হতে পারে মনে করে কন্যার জন্যে অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত হওয়ার ও নির্দেশ এতে রয়েছে।

ইসলাম এভাবে নারীকে তার অধিকার দিয়ে মর্যাদা প্রদান করেছে।[৩]

স্ত্রীর অধিকারের গুরুত্ব প্রদান

ইবাদত বন্দেগী ও কৃচ্ছতা সাধন অনেক প্রশংসার কাজ সন্দেহ নেই, কিন্তু তা করতে গিয়ে স্ত্রীর অধিকার হরণ করা, তার পাওনা যথারীতি ও পুরাপুরি আদায় না করা, তার সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্নকরা নিশ্চয়ই বড় গুনাহ্। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "নিশ্চয়ই তোমার স্ত্রীর

---

[1] ইমাম বুখারী, সহীহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৯

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

[3] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৬

তোমার উপর একটা অধিকার রয়েছে। কেবল স্ত্রীর অধিকার স্বামীর উপর, সে কথা নয়, স্বামীরও অধিকার রয়েছে স্ত্রীর উপর।"[১]

আল্লামা বদরুদ্দীন এ হাদীসের ব্যাখ্যার লিখেছেন, স্বামী স্ত্রী প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে প্রত্যেকের উপর। স্বামীর উপর স্ত্রীর যা কিছু অধিকার, তার মধ্যে একটি হচ্ছে তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন। আর সাধারণ ভাবে তার প্রাপ্য হচ্ছে, তাকে খাবার দেবে যখন যেমন তুমি নিজে খাবে এবং তার পোশাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করে দেবে, যেমন মানের পোশাক তুমি নিজে গ্রহণ করবে।[২]

এ হাদীসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে মুহাদ্দিসগণ লিখেছেনঃ "স্ত্রীর খোরাক ও পোশাক যোগাড় করে দেওয়া স্বামীর কর্তব্য, যখন সে নিজের জন্যে এ গুলোর ব্যবস্থা করতে যথার্থ হবে।[৩]

আল্লামা আল্-খাত্তাবী লিখেছেনঃ এ হাদীস স্ত্রীর খোরাক পোশাকের ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর উপর ওয়াজীব করে দিচ্ছে। এ ব্যাপারে কোনো সীমা নির্দিষ্ট নেই, প্রচলন মতই তা করতে হবে, করতে হবে স্বামীর সামর্থ্যনুযায়ী। আর হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) যখন একে 'অধিকার' বলেছেন তা পাওয়া না গেলে তা স্বামীর উপর অবশ্য দেয় ঋণ হবে-যেমন অন্যান্য হক অধিকারের ব্যাপারে হয়ে থাক।

এতদ্ব্যতীত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে স্ত্রীর নিকট যাওয়াও স্ত্রীর একটি অধিকার স্বামীর উপর এবং তা স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীর প্রতি। স্বামী যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হয়। তবে তাতে স্ত্রীর মনে আনন্দের ঢেউ খেলে যাওয়া স্বাভাবিক। কেননা তাতে প্রমাণ হয় যে, স্বামী স্ত্রীর মন জয় করার জন্যে বিশেষ যত্ন নিয়েছে এবং পূর্ণ প্রস্তুতি সহকারেই সে স্ত্রীর নিকট হাজির হয়েছে। অপরিচ্ছন্ন ও মলিন দেহ এবং পোশাক নিয়ে স্ত্রীর নিকট যাওয়া স্বামীর একেবারেই অনুচিত। স্ত্রীর ও কর্তব্য স্বামীর ইচ্ছানুরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ও সে অবস্থায়ই স্বামীর নিকট যাওয়া। এ জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সাবান ও অন্যান্য জরুরী প্রসাধনী দ্রব্য সংগ্রহ করে দেওয়া স্বামীর কর্তব্য। হযরত ইবনে আব্বাস এ পর্যায়ে একটি নীতি হিসেবে বলেছেনঃ আমি স্ত্রীর জন্যে সাজসজ্জা করা খুবই পছন্দ করি, যেমন পছন্দ করি স্ত্রী আমার জন্যে সাজসজ্জা করুক।[৪] স্ত্রীর অধিকারের ব্যাপারে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ "স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর। কারণ, আল্লাহ তা'আলা জামিনে

[1] ইমাম বুখারী, ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমা'ঈল, *সহীহুল বুখারী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭৬

[2] ইমাম আবু দাউদ, *সুনান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০৬

[3] মওলানা খলিলুর রহমান, *ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা*, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ.২৩

[4] প্রাগুক্ত, পৃ.২৪

Dhaka University Institutional Repository

তোমরা তাহাদেরকে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালেমার জামিনে তোমরা তাহাদেরকে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে তোমরা তাদের লজ্জাস্থানকে তোমাদের জন্য হালাল করে লইয়াছ। তাদের উপর তোমাদের অধিকার এই, তোমাদের বিছানায় তারা অন্য কাহাকেও আসিতে দিবে না। তারা ইহা করিলে তাহাদেরকে হালকা ধরনের আঘাত কর। আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার এই তোমরা তাহদেরকে প্রচলিত রীতি অনুসারে ভদ্রোচিতভাবে খোরাক ও পোশাক প্রদান করিবে।[১]

স্মরণ রাখা দরকার যে, প্রচলিত নিয়মানুসারে ভদ্রোচিতভাবে জীবন যাপনের জন্য যাহা প্রয়োজনীয়, স্ত্রীর এই অত্যাবশ্যক চাহিদা অবশ্যই পূরণ করতে হইবে।"[২]

স্ত্রীর বিপদে সহানুভূতি প্রদর্শন

স্ত্রীর বিপদে-আপদে, রোগ-শোকে তার প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি প্রদর্শন করা স্বামীর কর্তব্য। স্ত্রী রোগাক্রান্ত হলে তার চিকিৎসার যথাযথ ব্যবস্থা করা স্বামীরই দায়িত্ব। বস্তুত স্ত্রী সবচেয়ে বেশী দুঃখ পায় তখন, যখন তার বিপদে শোকে তার স্বামীকে সহানুভূতিপূর্ণ ও দুঃখ ভারাক্রান্ত দেখতে পায় না অথবা স্ত্রীর যখন কোনো বিপদ হয়, শোক হয় কিংবা রোগ হয়, তখন স্বামীর মন যদি তার জন্যে দ্রবীভূত না হয়, বরং তখন স্বামীর মন মৌমাছির মত অন্য ফুলের সন্ধানে উড়ে বেড়ায়, তখন বাস্তবিকই স্ত্রীর দুঃখ ও মনোকষ্টের কোনো অবধি থাকে না। এজন্যে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) স্ত্রী প্রতি দয়াবান ও সহানুভূতিপূর্ণ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এর সাধারণ নিয়ম হিসেবে বলেছেন, "যে লোক নিজে অপরের জন্যে দয়াপূর্ণ হয় না, সে কখনো অপরের দয়া লাভ করতে পারে না।"[৩]

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের ক্ষেত্রে এ কথা অতীব বাস্তব। এজন্যে স্ত্রীদের মনের আবেগ উচ্ছ্বাসের প্রতি লক্ষ্যে রাখা স্বামীর একান্তই কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে হযরত উমর ফারুকের একটি ফরমান স্মরণীয়। তিনি এক বিরহি নারীর আবেগ উচ্ছ্বাস দেখতে পেয়ে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। তখন তিনি তাঁর কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, মেয়েলোক স্বামী ছাড়া বেশীর ভাগ

---

[1] ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, পৃ.৬০৯

[২] শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৮

[3] মওলানা খলিলুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ.২৭

Dhaka University Institutional Repository

কতদিন পর্যন্ত ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারে? হযরত হাফসা বললেনঃ চার মাস। তখন হযরত উমর বললেনঃ "সৈন্যদেরকে আমি জিহাদের জন্য চার মাসের অধিক বাইরে আটকে রাখব না।"[১]

তিনি খলীফাতুল মুসলিমীন হিসেবে সব সেনাধ্যক্ষকে লিখে পাঠালেন, "চার মাসের অধিক কাল কোনো বিবাহিত ব্যক্তিই তার স্ত্রী-পরিজন থেকে যেন বিচ্ছিন্ন না থাকে।" এ ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, স্ত্রীর মনের কামনা বাসনা ও আন্তরিক ভাবধারার প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখা স্বামীর অবশ্য কর্তব্য। আর স্ত্রীদের পক্ষে স্বামীহারা হয়ে বেশী দিন ধৈর্য ধরে থাকা সম্ভব নয়-এ কথা তার কিছুতেই ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে ও এর সমর্থন পাওয়া যায়। বলা হয়েছে,

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ- وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ-

"যারা স্ত্রীর সাথে সঙ্গম না করার শপথ করে, তারা চার মাস অপেক্ষা করবে। এরপর যদি তারা ফিরে আসে তাহলে আল্লাহ তো নিশ্চিতভাবেই পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। আর যদি তারা তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলেও নিশ্চয় আল্লাহ তো সব কিছু শোনেন, সব কিছু জানেন।"[২]

এর আয়াতে 'ঈলা' সম্পর্কে ও ফয়সালা দেওয়া হয়েছে। ঈলা শব্দের অর্থ হচ্ছে-'কসম করে কোনো কাজ না করা'- কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকা' আর ইসলামী শরীআতের ভাষায় এর অর্থ হচ্ছেঃ কসম করে স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম না করা-স্ত্রী সাথে যৌন সঙ্গম করা থেকে বিরত থাকা।[৩]

উক্ত আয়াতে বলা হয়েছেঃ যারা স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম না করার কসম করবে তাদের জন্যে চার মাসের অবসর। এর চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পরে হয় সে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে তাকে ফিরিয়ে নেবে, আর না হয় তালাক দিয়ে তাকে চিরতরে বিদায় করে দেবে।

আল্লামা শাওকানী লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীর ক্ষতি হয় এমন কাজ বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই এই মেয়াদের সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। জাহিলিয়াত যুগে লোকেরা এক বছর, দুই বছর কি ততোদিক

---

[1] মওলানা খলিলুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ.২৮

[2] আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াতঃ ২২৬-২২৭

[3] আহমদ কুস্তালাবী, *আল-লুগাত*, বৈরুত, ১৯৯৯, পৃ.২৩৮

কালের জন্য 'ঈলা' করতো আর তাদের উদ্দেশ্য হত স্ত্রীলোককে ক্ষতিগ্রস্ত করা। এসব ক্ষতি-লোকসানের পথ বন্ধ করার এবং স্ত্রীলোকদের প্রতি পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত করানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে কথাগুলো বলে দিয়েছেন।[১]

ইসলাম এ ভাবে নারীদের প্রতি বিপদে সহানুভূতি প্রদর্শন করার তাগিদ বা বিধান করে তাদের উপযুক্ত মর্যাদা প্রদান করেছে।

স্বামী-স্ত্রী গোপন কথা প্রকাশ না করা

স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার হচ্ছে এই যে, সে স্ত্রীর গোপন কথা অপরের নিকট প্রকাশ করে দেবে না। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) তীব্র ভাষায় নিষেধ করেছেন এ ধরনের কোনো কথা প্রকাশ করতে। বলেছেন, যে স্বামী নিজ স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় ও স্ত্রী মিলিত হয় তার স্বামীর সাথে, অতপর সে তার স্ত্রীর গোপন কথা প্রকাশ করে দেয় প্রচার করে, সে স্বামী আল্লাহ তাআলার নিকট মর্যাদার দিক দিয়ে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি।[২]

অর্থাৎ স্বামী যাবতীয় গোপন বিষয়ে অবহিত হয়ে থাকে, তার সাথে যৌন মিলন সম্পন্ন করে, স্ত্রী নিজেকে নিজের পূর্ণ সত্তা-দেহ ও মনকে স্বামীর নিকট উন্মুক্ত করে দেয়। এমতাবস্থায় স্বামী যদি স্ত্রীর যাবতীয় গোপন বিষয় অবহিত হয়ে তা অপর লোকের নিকট প্রকাশ করে দেয়, তবে তার অপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তি আর কেউ হতে পারে না। আর আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতেও এ ব্যক্তির মর্যাদা নিকৃষ্টতম হতে বাধ্য। কেননা এর মত হীন ও জঘন্য কাজ আর কিছুই হতে পারে না। ইমাম নববীর মতে, এ কাজ হচ্ছে হারাম।[৩]

তিনি উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে বলেছেনঃ "স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে যৌন সঙ্গম সম্পর্কিত গোপন বিষয় ও ঘটনা প্রকাশ করা এ হাদীসে সম্পূর্ণরূপে হারাম করে দেওয়া হয়েছে।

একদিন হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) নামাজের পর উপস্থিত সকল সাহাবীকে বসে থাকতে বললেন এবং প্রথমে পুরুষদের লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের মধ্যে এমন পুরুষ কেউ আছে নাকি, সে তার স্ত্রীর নিকট আসে, ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়, তার পর বের হয়ে এসে লোকদের সাথে কথা

---

[১] ইমাম আহমদ, *মুসনাদ*, পূর্বোক্ত, পৃ.২৮১

[2] ইমাম মুসলীম, মুসলিম, *সহীহ*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩০৫

[3] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বলে ও বলে দেয়: আমি আমার স্ত্রীর সাথে এই করেছি, এই করেছি? .... হাদীসে বর্ণকারী বলেছেন-এ প্রশ্ন শুনে সব সাহাবীই চুপ থাকলেন। তারপর মেয়েদের প্রতি লক্ষ্য করে তাদের নিকট প্রশ্ন করলেনঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে নাকি, যে স্বামী-স্ত্রীর মিলন রহস্যের কথা প্রকাশ করে ও অন্যদের বলে দেয়?

তখন এক যুবতী মেয়ে বলে উঠলঃ "আল্লাহ তাআলার শপথ, এই পুরুষরাও যেমন সে কথা বলে দেয়, তেমনি এই মেয়েরাও তা প্রকাশ করে।"

তখন হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ তোমরা কি জানো, এরূপ যে করে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে, সে যেন একটি শয়তান, সে তার সঙ্গী শয়তানের সাথে রাজপথের মাঝখানে সাক্ষাত করল আর সেখানে দাঁড়িয়েই তার দ্বারা নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করে নিল। আর চারদিকে লোকজন তাদের তাকিয়ে দেখতে থাকলো।[1]

এ পর্যায়ে দুটো হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম শাওকানী লিখেছেনঃ এ দুটো হাদীসই প্রমাণ করছে যে, স্বামী স্ত্রীর সঙ্গম কার্য প্রসঙ্গে যতকিছু এবং যা কিছু ঘটে থাকে, তার কোনো কিছু প্রকাশ করা অন্যদের কাছে বলে দেয়া সম্পূর্ণ হারাম।[2]

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-ভালবাসার আদান-প্রদান হয়, হয় পারস্পরিক মনের গোপন কথা বলাবলী, একজনতো অকৃত্রিম আস্থা ও বিশ্বাস নিয়েই অপর জনকে তা বলেছে। এখন যদি কেউ অপর কারো কথা কিংবা যৌন-মিলন সংক্রান্ত কোনো রহস্য অন্য লোকের কাছে বলে দেয়, তাহলে একদিকে যেমন বিশ্বাস ভঙ্গ হলো অপরদিকে লজ্জার কারণ ঘটল। এই কারণে ইসলাম এ কাজকে সম্পূর্ণ নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। বস্তুত একজন যদি তাদের স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসার কথা বাইরের কোনো লোক-নারী বা পুরুষকে বলে দেয়, তাহলে শ্রোতার মনে সেই স্ত্রীর বা পুরুষের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আর যদি কেউ যৌন সঙ্গম কার্যের বিবরণ অন্য লোকের সামনে প্রকাশ করে, তাহলে তার গোপনীয়তা বিলুপ্ত হয়, গুপ্ত ব্যাপারাদি উন্মুক্ত ও দৃশ্যমান হয়ে উঠে। কোনো নেককার–পূণ্যবর্তী স্ত্রীর দ্বারাও যেমন এ কাজ হতে পারে না, তেমনি কোনো আল্লাহ তাআলা ভীরু ব্যক্তির দ্বারা ও একাজ সম্ভব নয়। বিশেষ ভাবে মেয়েরাই এ ব্যাপারে অগ্রসর হয়ে থাকে বলে

---

[1] ইমাম তিরমিযী, *আস–সুনান*, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৬৭

[2] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন মজীদে তাদের গুণাবলীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, তারা অতিশয় বিনীত, অনুগত্য অদৃশ্য কাজের হেফাযতকারিণী আল্লাহ তাআলার হেফাযতের সাহায্যে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ইসলাম নারীকে তার স্ত্রীরূপে যে সম্মান প্রাপ্য তা নিশ্চিত করেছে।

স্ত্রীর ভরণ–পোষণের দায়িত্ব স্বামীর

স্ত্রীর শোভনীয় মন অনুপাতে খোরপোশ নিয়মিত সরবরাহ করা স্বামীরই কর্তব্য, যে সে নির্লিপ্তভাবে স্বামীর ঘর-সংসার পরিচালনা ও সংরক্ষণ এবং সন্তান প্রসব ও লালন-পালনের কাজ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করতে পারে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, যে লোককে অর্থ-সম্পদের স্বাচ্ছন্দ দান করা হয়েছে, তার কর্তব্য সেই হিসেবেই তার স্ত্রীর পরিজনের জন্যে ব্যয় করা। আর যার আয় উৎপাদন স্বল্প পরিসর ও পরিমিত, তার সেভাবেই আল্লাহ তাআলার দান থেকে খরচ করা কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকের উপর তার সামর্থ্য অনুসারেই দায়িত্ব অর্পণ করে থাকেন।[1]

এ আয়াতে ব্যাখ্যায় ইমাম শাওকানী লিখেছেন, এ আয়াতে আদেশ করা হয়েছ, সচ্ছল অবস্থার লোকদেরকে যে, তারা দুগ্ধদায়িনী স্ত্রীদের জন্যে তাদের স্বাচ্ছন্দ অনুপাতে বহন করবে। আর যাদের রিযিক নিম্নতম প্রয়োজ মত কিংবা সংকীর্ণ, সচ্ছল নয়, তারা আল্লাহর দেওয়া রিযিক অনুযায়ীই খরচ করবে। তার বেশী করার কোনো দায়িত্ব তাদের নেই।[2]

স্বামীর অবস্থা অনুযায়ী স্ত্রীকে খোরপোশ দেওয়ার কথা কুরআন থেকে প্রমাণিত।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী-উৎবা-কন্যা হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেনঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, আমার স্বামী আবূ সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি, সে আমার ও আমার সন্তানদের প্রয়োজন পরিমাণ ভরণ-পোষণ দেয় না, তবে আমি তাকে না জানিয়ে প্রয়োজন মত গ্রহণ করেন থাকি। এ কাজ জায়েয কিনা?

তখন হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেনঃ সাধারণ প্রচলন অনুযায়ী তোমারও তোমার সন্তানাদির প্রয়োজন পরিমাণ ভরণ-পোষণ তুমি গ্রহণ করতে পার।[3]

---

[1] আল-কুরআন, সূরা তালাক, আয়াতঃ ৭

[2] ইমাম আহমদ, *মুসনাদ*, পূর্বোক্ত, পৃ.২১৭

[3] ইমাম বুখারী, *আস–সহীহ*, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৩১

Dhaka University Institutional Repository

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, আবু সুফিয়ান স্বচ্ছল অবস্থাসম্পন্ন ছিল, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) জানতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কেবলমাত্র কৃপণতার কারণে নিজ স্ত্রী ও পুত্র কন্যার প্রয়োজন পরিমাণ গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছিলেন।[1]

ইমাম শাফিয়ী (র)-এর মতে, এই পরিমাপ শরীআত কর্তৃক নির্দিষ্ট বলে এ ব্যাপারে বিচার-বিবেচনার কোনো অবকাশ নেই। আর এ ব্যাপারে স্বামীর অবস্থানুযায়ীই ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে হবে। স্ত্রী যদি খাদেম-চাকরের প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে স্বামীর সামর্থ থাকলে খাদেম চাকর যোগার করে দেওয়া স্বামীর কর্তব্য। এ ব্যাপারে ফিকাহ্ বিদগণ সম্পূর্ণ একমত। ইমাম মুহাম্মদ বলেছেনঃ স্ত্রীর অক্ষম অবস্থায় প্রয়োজেনে একাধিক খাদেম-চাকরের খরচ বহন করা সচ্ছল অবস্থায় স্বামীর জন্যেও ওয়াজিব হবে।[2]

একজন খাদেম-চাকরের প্রয়োজন হলে তা সংগ্রহ করা ও খরচ বহন করা স্বামীর কর্তব্য কিনা-এ সম্পর্কে ফিকাহ্ বিদগণ একমত নন। ইমাম মালিকের মতে দুই বা তিনজন খাদেমের প্রয়োজন হলে তার ব্যবস্থা করা স্বামীর কর্তব্য। আর ইমাম আবূ ইউসূফ বলেছেনঃ এমতাবস্থায় স্বামীর কর্তব্য হবে ঘরের ভিতরকার জরুরী কাজ-কর্ম করার জন্যে। আর অপরজন হবে ঘরের বাইরের জরুরী কাজ সম্পন্ন করার জন্যে।[3]

গরীব ও অসচ্ছল লোকদের সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতের পরই বলেছেন, মহান আল্লাহ অসচ্ছলতা ও দারিদ্র্যের পরে অবশ্যই সচ্ছলতা ও প্রাচুর্য করে দেবেন।[4]

এ পর্যায়ে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতটি ও পাঠ আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, সন্তানের পিতার কর্তব্য হচ্ছে প্রসূতির খাওয়া-পরার প্রচলিত মানে ব্যবস্থা করা। কোনো ব্যক্তির উপরই তার সামর্থ্যের অধিক বোঝা চাপান যেতে পারে না।[5]

---

[1] ইমাম আহমদ, *মুসনাদ*, পৃ. ২৩৮

[2] প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৪

[3] প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৭

[4] আল-কুরআন, ৬৫, আয়াতঃ ১৭।

[5] আল-কুরআন, ২, আয়াতঃ ২৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

এ আয়াতের ভিত্তিতে ইমাম শাওকানী লিখেছেনঃ "সন্তান ও স্ত্রীর ব্যয়ভার, খোরাক ও পোশাক সংগ্রহ এবং ব্যবস্থা করা সন্তানের পিতার পক্ষে ওয়াজিব। আর তা করতে হবে সাধারণ প্রচলন অনুযায়ী যা লোকেরা সাধারণত করে থাকে। এ ব্যাপারে কোনো পিতাকেই তার শক্তি-সামর্থের বাইরে তার পক্ষে কঠিন ও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে এমন মান বা পরিমাণ তার উপর চাপানো যাবে না।[১]

উক্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, সন্তান গর্ভে ধারণ, সন্তান প্রসব ও লালন-পালন করা স্ত্রীর কাজ; আর তার ও তার সন্তানের ভরণ-পোষণ ও যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব স্বামীর। এর ফলে স্ত্রীরা খোরপোশের যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে গেল। এর প্রভাব তাদের মনে ও জীবনে সুদূরপ্রসারী হবে। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) স্বামীদের লক্ষ্য করে তাই ইরশাদ করেছেন, স্ত্রীদের খাবার ও পরার ব্যবস্থা করার ব্যাপারে তোমরা অবশ্যই তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করবে।[2]

অর্থাৎ কেবল মাত্র মোটা ভাতও মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হলে চলবে না। এ ব্যাপারে তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বনের বদলে সহানুভূতিমূলক নীতি গ্রহণ করতে হবে।

আলোচনার সারকথা হচ্ছে এই যে, স্বামী-স্ত্রীতে অতি স্বাভাবিক ভাবেই কর্মবন্টন করে দেওয়া হয়েছে যে যৌন মিলনের সুখ ও মাধুর্য স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সমান ভাবে ভোগ করে, তার সুদুরপ্রসারী পরিণতি কেবল স্ত্রীকেই ভোগ করতে হয় প্রকৃতির এ অমোঘ নিয়ম অনুযায়ী। পুরুষকে তার কোনো ঝুঁকিই গ্রহণ করতে হয় না। এ হচ্ছে এক স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক ব্যবস্থা। কাজেই স্ত্রী প্রাকৃতিক এই দাবি পূরণে সতত প্রস্তুত থাকবে, আর স্বামী তার যাবতীয় প্রয়োজন পুরণের জন্যে দায়ী হবে। মূল ব্যাপারে সমান অংশীদারিত্বের এটা অতি স্বাভাবিক দাবি।

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীর চলতি নিয়মে কেবল খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে দেওয়াই দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নয়, সেই সঙ্গে স্বামীর তাওফিক অনুযায়ী আরও বেশি এবং অতিরিক্ত হাত খরচ ও স্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া স্বামীর কর্তব্য, যেন স্ত্রী নিজ ইচ্ছা, বাসনা-কামনা ও রুচি অনুযায়ী প্রয়োজনে খরচ করতে পারে। এভাবে ইসলাম নারীর মৌলিক অধিকার খাদ্যের ব্যাপারে নিরাপওা বিধান করেছে।

---

[১] ইমাম আহমদ, *মুসনাদ*, পূর্বোক্ত, পৃ.২৫৬

[2] ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, পৃ.৬৫৪

Dhaka University Institutional Repository

নারী প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে ধৈর্য্য ধারণের নির্দেশ

এ প্রসঙ্গে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর একটি হাদীস উল্লেখ করা হলো। এ হাদীসে তিনি স্ত্রী লোকদের প্রকৃতিগত এক মৌলিক দুর্বলতার প্রতি বিশেষ খেয়াল রেখে চলার জন্য স্বামীদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "নারীরা সাধারণত স্বামীদের অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকে এবং তাদের অনুগ্রহকে অস্বীকার করে। তুমি যদি জীবন ভরেও কোনো স্ত্রীর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর, আর কোনো এক সময় যদি সে তার মর্জি-মেজাজের বিপরীতে কোনো ব্যবহার তোমার মাঝে দেখতে পায় তাহলে তখনি বলে উঠেঃ "আমি তোমার কাছে কোনোদিনই সামান্য কল্যাণও দেখতে পাইনি।"[১]

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর এ কথা থেকে একদিকে যেমন নারীদের এক মৌলিক প্রকৃতিগত দোষের কথা জানা গেল, তেমনি এ হাদীস স্বামীদের জন্যেও এক বিশেষ সাবধান বাণী। স্বামীরা যদি নারীদের এ প্রকৃতিগত দোষের কথা স্মরণ না করে, তাহলেই পারিবারিক জীবনে অতি তাড়াতাড়ি ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। এজন্যে পুরুষদের অবিচল নিষ্ঠা ও অপরিসীম ধৈর্য্য ধারণের প্রয়োজন রয়েছে এবং এ ধরনের নাজুক পরিস্থিতিতে ধৈর্য্য ধারণ করে পারিবারিক জীবনের মাধুর্য ও মিলমিশকে অক্ষুন্ন রাখা পুরুষদেরই কর্তব্য।

এ পর্যায়ে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, রাসুলে করীম (সাঃ) এর সেই ফরমান, যা তিনি বিদায় হজ্জের বিরাট সমাবেশে মুসলিম জনতাকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছিলেন।

আবূ দাউদের বর্ণনা মতে সে ফরমানের ভাষা নিম্নরূপ, "হে মুসলিম জনতা। স্ত্রীদের অধিকার সম্পর্কে তোমরা আল্লাহকে অবশ্যই ভয়-করতে থাকবে। মনে রেখো, তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে পেয়েছে এবং আল্লাহর কালেমার সাহায্যে তাদের দেহ ভোগ করাকে নিজেদের জন্যে হালাল করে নিয়েছ। আর তাদের উপর তোমাদের জন্যে এ অধিকার নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, সে কোনো অবাঞ্ছিত ব্যক্তির দ্বারা তোমাদের দুজনের মিলন-শয্যাকে মলিন ও দলিত কলংকিত করবে না।"[2]

এই শেষ বাক্যের অর্থ কেবল একটুকু নয় যে, স্ত্রীরা ভিন্ন পুরুষকে স্বামীর শর্য্যায় গ্রহণ করবে না বরং স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে স্বামীর ঘরে অপর কাউকে প্রবেশ করতে পর্যন্ত দেবে না।

---

[১] ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, পূর্বোক্ত, পৃ.৭৬৫

[2] ইমা আবু দাউদ, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, পৃ.৬৬

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে প্রতিয়মান হয় যে পুরুষকে নারীর প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে তার মর্জি বুঝে আচরণ করতে হবে এবং বিবাহিতা নারীর ইজ্জত রক্ষার নিমিত্তে পরপুরুষকে এড়িয়ে চলতে হবে।

গুরুতর বিষয়ে স্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ

পারিবারিক এমনকি সামাজিক ও জাতীয় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের গুরুতর ব্যাপার সমূহ সম্পর্কে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করা এবং তার নিকট সব অবস্থার বিবরণ দান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার মতামত গ্রহণ তথা পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ের যাবতীয় বিষয়ে ঘরোয়া পরামর্শ অনেক সময় সার্বিক ভাবেই কল্যাণকর হয়ে থাকে। ঘরের মেয়ে লোকদের নিকটও যে অনেকটা সময় ভাল ভাল বুদ্ধি পাওয়া যায়, পাওয়া যায় জটিল বিষয়াদির সুষ্ঠ সমাধানের শুভ পরামর্শ, তাও তার মাধ্যমে প্রতিভাত হয়ে পড়ে। ফলে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মতের ভিত্তিতে গুরুতর কাজসমূহ সম্পন্ন করাও সম্ভব হয় অতি সহজে এবং অনায়াসে। কুরআন মজীদে এ কারণেই স্ত্রীর সাথে সর্ব ব্যাপারেই পরামর্শ করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তার বড় প্রমাণ এই যে, সন্তানকে কতদিন দুধ পান করানো হবে তা স্বামী স্ত্রীতে পরামর্শের ভিত্তিতে নির্ধারণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, স্বামী ও স্ত্রী যদি পরস্পর পরামর্শ ও সন্তোষের ভিত্তিতে শিশু সন্তানের দুধ ছাড়াতে ইচ্ছা করে, তবে তাতে কোনো দোষ হবে না তাদের।[১]

আল্লামা আহ্মাদুল মুস্তফা আল্-মারাগী এ আয়াতের ভিত্তিতে লিখেছেন, কুরআন মজীদ সন্তান পালনের মত অতি সাধারণ ব্যাপারেও পরামর্শ প্রয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং পিতা-মাতার একজনকে অপর জনের উপর জোর জবরদস্তি করার অনুমতি দেওয়া হয় নি এ কথা যদি তোমরা চিন্তা ও লক্ষ্য কর, তাহলে গুরুতর বিপজ্জনক ও বিরাট কল্যাণময় কাজ কর্ম ব্যাপার সমূহে পারস্পরিক পরামর্শের গুরুত্ব সহজেই বুঝতে পারবে।[২]

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর জীবনে এ পর্যায়ের বহু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম অহী লাভ করার পর তাঁর হৃদয়ে যে ভীতি ও আতংকের সৃষ্টি হয়েছিল, তা অপনোদনের জন্যে তিনি ঘরে গিয়ে স্বীয় প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ) এর নিকট সব অবস্থার বিবরণ দান করেন। বলেছিলেন, "আমি এই ব্যাপারে নিজের সম্পর্কে বড় ভীত হয়ে পড়েছি। এ কথা শুনে হযরত

---

[1] আল-কুরআন, ২, আয়াতঃ ২৩৩।

[2] আহমাদুল মুস্তফা আল–মারাগী, *কিতাবুল মুফরাদাত*, বৈরুত, ১৪১১ হিজরি, পৃ.২২৩

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (স)এর জীবনসঙ্গিনী হযরত খাজীদা (রাঃ) তাকে বলেছিলেনঃ "আল্লাহ তাআলা আপনাকে কখনই এবং কোনোদিনই লজ্জিত করবেন না। কেননা আপনিতো ছেলায়ের রেহ্মী বা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, অপরের বোঝা বহন করে থাকেন, কপর্দকহীন গরীবদের জন্যে আপনি উপার্জন করেন, মেহমানদারী রক্ষা করেন, লোকদের বিপদে আপদে তাদের সাহায্য করে থাকেন, এজন্যে আল্লাহ তাআলা কখনই শয়তানদের আপনার উপরে জয়ী বা প্রভাবশালী করে দেবেন না। কোনো অমূলক চিন্ত-ভাবনা ও আপনার উপর চাপিয়ে দেবেন না। আর এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে আপনার জাতির লোকজনের হেদায়াতের কার্যের জন্যেই বাছাই করে নিয়েছেন।[১]

হযরত খাদীজা (রা)এর এ সান্তনার বাণী হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর মনের ভাব অনেক খানি লাঘব করে দেয়। আর এ ধরনের অবস্থায় প্রত্যেক স্বামীর জন্যে তার প্রিয়তমা ও সহানুভূতি সম্পন্ন স্ত্রীর আন্তিরিক সান্তনাপূর্ণ কথাবার্তা অনেক কল্যাণ সাধন করে থাকে। এভাবেই ইসলাম নারীদের পরামর্শগ্রহণ করার ব্যাপারে তাদের গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

স্ত্রী ঘরের রাণী

পুরুষ ও নারীর জ্ঞান-বুদ্ধি, কর্মক্ষমতা ও দৈহিক আঙ্গিকের স্বাভাবিক পার্থক্যের কারণে পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কর্মবন্টনের নীতি পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করা হয়েছে। পুরুষকে করা হয়েছে কামাই রোজগার ও শ্রম মেহনতের জন্যে দায়িত্বশীল আর স্ত্রীকে করা হয়েছে ঘরের রাণী। "পুরুষের জন্যে কর্মক্ষেত্র করা হয়েছে বাইরের জগত আর নারীর জন্যে ঘর। পুরুষ বাইরের জগতে নিজের কর্ম-ক্ষমতা প্রয়োগ করে যেমন করবে কামাই রোজগার, তেমনি গড়বে সমাজ রাষ্ট্র, শিল্প ও সভ্যতা। আর নারী ঘর থেকে একদিকে করবে ঘরের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা, অপরদিকে করবে গর্ভ ধারণ, সন্তান প্রসব, লালন-পালন ও ভবিষ্যতের উপযুক্ত নাগরিক গড়ে তোলার কাজ।"[২]

এজন্যে নারীদের সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, এবং স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের পরিচালিকা, রক্ষণাবেক্ষণ কারিণী, কর্তী।[৩]

---

[1] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫

[2] মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, খায়রুন প্রকাশনী-১৯৮৮, পৃষ্ঠা-১৯৫

[3] ইমাম বুখারী, *সহীহ*, পূর্বোক্ত, পৃ.৩০৪

Dhaka University Institutional Repository

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেনঃ নারী হচ্ছে হেফাযতকারী, রক্ষনাবেক্ষণকারী, আমানতদার, দায়িত্বের অধীন সব জিনিসের কল্যাণ সাধনের জন্য একান্ত বাধ্য। যে ব্যক্তির দায়িত্বেই যে কোনো জিনিস দেওয়া হবে, এমন প্রত্যেকেরই তেমন প্রত্যেকটি জিনিসের সুবিচার ও ইনসাফ করা এবং তার দ্বীনী ও দুনিয়াবী কল্যাণ সাধন করাই বিশেষ লক্ষ্য। এখন যার উপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সে যদি তা পুরোপুরি পালন করে, তবে সে পূর্ণ অংশই লাভ করল, অধিকারী হলো বিরাট পুরস্কার লাভের আর যদি তা না করে, তবে দায়িত্বের প্রত্যেকটি জিনিসই তার অধিকার দাবি করবে।[১]

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের কথা নিম্নোক্ত হাদীসে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের জন্যে তোমাদের স্ত্রীদের উপর নিশ্চয়ই অধিকার রয়েছে, আর তোমাদের স্ত্রীদের জন্যে ও রয়েছে তোমাদের উপর অধিকার। তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার হচ্ছে এই যে, তারা তোমাদের শয্যায় এমন লোককে স্থান দেবেনা যাকে তোমরা পছন্দকর না। তোমাদের ঘরে এমন লোককেও প্রবেশ করার অনুমতি দেবে না, যাদের তোমরা পছন্দ কর না বলে নিষেধ কর। আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার হচ্ছে, তোমরা তাদের ভরণ-পোষণ খুবই উত্তমভাবে বহন করবে।[২]

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যসম্পন্ন এ দাম্পত্য জীবন যে কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং এ জীবনে স্ত্রীর যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তা ব্যাখ্যা করে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী লিখেছেন, দাম্পত্য জীবনের সম্পর্ক, সম্বন্ধ ও মিলনই হচ্ছে পারিবারিক জীবনের বৃহওম সম্পর্ক। এ সম্পর্কের ফায়দা সর্বাধিক, প্রয়োজন পূরণের দৃষ্টিতে তা অধিকতর স্বয়ং সম্পূর্ণ। কেননা আরব অনারবের সকল পর্যায়ের লোকদের মধ্যে স্থায়ী নিয়ম হচ্ছে এই যে, স্ত্রী সকল কল্যাণময় কাজে কর্মে স্বামীর সাহায্যকারী হবে, তার খানাপিণা প্রস্তুত করণ ও কাপড় চোপড় পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করে রাখার ব্যাপারে সে হবে স্বামীর ডান হাত, আর মাল-সম্পদের রক্ষণা-বেক্ষণ ও তার সন্তানদের লালন-পালন করবে এবং তার অনুপস্থিতিতে সে তার ঘরের স্থলাভিষিক্ত ও দায়িত্বশীল।

ঘরের যাবতীয় ব্যাপারের জন্য প্রথমত ও প্রধানত স্ত্রী দায়ী। তারই কর্তৃত্বে যাবতীয় ব্যাপার সম্পন্ন হবে। এখানে তাকে দেওয়া হয়েছে এক প্রকারের স্বাধীনতা। স্বামীর ঘর কার্যত তার নিজের ঘর,

---

[১] ইমাম বদরুদ্দীন আইনী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৯০

[2] ইমাম বুখারী, সহীহ, পূর্বোক্ত, পৃ.৬৯৭

Dhaka University Institutional Repository

স্বামীর জিনিসপত্র ও ধন-সম্পদ স্ত্রীর হেফাযতে থাকবে। সে হবে তার আমানতদার, অতন্দ্র প্রহরী। কিন্তু স্বামীর ঘরের কাজকর্ম কি স্ত্রীকে তার নিজের হতে সম্পন্ন করতে হবে? এ সম্পর্কে ইমাম হাজমের একটি উক্তি দেখতে পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, স্বামীর খেদমত করা, কোনো প্রকারের কাজ করে দেওয়া মূলত স্ত্রী কর্তব্য নয়, না রান্না-বান্নার আয়োজন করার বাপারে; না রান্না বান্না করার ব্যাপারে; না সূতা কাটা; কাপড় বোনার ব্যাপারে; না কোনো কাজে।[১]

ফিকাহ্‌বিদগণ এর কারণ স্বরূপ বলেছেনঃ "কেননা বিয়ের আক্‌দ হয়েছে স্ত্রীর সাথে যৌন ব্যবহারের সুখ ভোগ করার জন্যে। অতএব স্বামী তার কাছ থেকে অপর কোনো ফায়দা লাভ করার অধিকারী হতে পারে না।

ইবনে হাজমের 'মূলত কর্তব্য নয়' কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা কোনো কাজ মূলত কর্তব্যভুক্ত না হলেও অনেক সময় তা না করে উপায় থাকে না। কুরআন মজীদের আয়াত, "স্ত্রীদের সেই সব অধিকারই রয়েছে স্বামীদের উপর, যা স্বামীদের রয়েছে স্ত্রীদের উপর।[২]

এতে প্রমাণ করে যে, স্বামী যেমন স্ত্রীর জন্যে প্রাণপাত করে, স্ত্রীরও কর্তব্য স্বামীর জন্যে কষ্ট স্বীকার করা। ইমাম ইবনে তাইমিয়াও এ রূপে ফতোয়া দিয়েছেন। আবূ বকর ইবনে শায়বা ও আবূ ইসহাক জাওযানীর মত ও তাই।[৩]

এভাবে ইসলাম নারীকে স্ত্রী তথা সহধর্মিনী রূপে অনেক অধিকার ও ব্যাপক স্বাধীনতা দিয়েছে।

নিজের ও স্বামীর ধন-সম্পদে স্ত্রীর অধিকার

স্বামীর ঘরে স্ত্রীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থায় সুস্পষ্টরূপে স্বীকৃত। স্ত্রীর যেমন অধিকার আছে সীমার মধ্যে থেকে যাবতীয় দায়িত্ব পালন করার পরে যে কোনো কাজ করে অর্থোপার্জন করার, তেমনি অধিকার রয়েছে সেই উপার্জিত অর্থের মালিক হওয়ার এবং নিজের ইচ্ছানুক্রমে তা ব্যয় ও ব্যবহার করার। স্বামীর ধন-সম্পদে ও তার ব্যয়-ব্যবহার, দান ও প্রয়োগের অধিকার রয়েছে। সেই সঙ্গে সে মীরাস পেতে পারে পিতা, ভাইয়ের, পুত্র-কন্যার এবং স্বামীর। স্বামীর ধন-সম্পদে স্ত্রীর অধিকার এতদূর রয়েছে যে, তার ব্যয়-ব্যবহার করার ব্যাপারে সে তার

---

[1] ইমাম বদরুদ্দীন আইনী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৯২

[2] আল-কুরআনঃ ২, আয়াতঃ ২২৮।

[3] ইমাম বদরুদ্দীন আইনী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৯৭

Dhaka University Institutional Repository

স্বামীর মরজি বা অনুমতির মুখাপেক্ষী নয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, স্ত্রী যদি স্বামীর খাদদ্রব্য থেকে শরীয়াত বিরোধী নয় এমন কাজে এবং খারাপ নয়-এমন ভাবে ব্যয় করে তবে তাতে তার সওয়াব হবে, কেননা সে ব্যয় করেছে; আর তার স্বামীর জন্যেও সওয়াব রয়েছে, কেননা সে তা উপার্জন করেছে।[১]

হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রাঃ) একদিন হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! স্বামী জুবাইর আমাকে সংসার বাবদ য কিছু দেন, তা ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। এখন তা থেকে যদি আমি দান সাদ্‌কার কাজে কিছু ব্যয় করি, তবে কি আমার গুনাহ্ হবে?

তখন হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ যা পারো দান-সাদ্‌কা করতে পারো; তবে নিজের তহবিলে নিয়ে জমা করে রেখো না, তা হলে মনে রেখো, আল্লাহ তাআলাও তোমার জন্যে শাস্তি জমা করে রাখবেন।[২]

ইমাম শাওকানীর মতে, এ সম্পর্কিত যাবতীয় হাদীস থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয়ঃ স্বামীর ঘর থেকে তার অনুমতি ব্যতিরেকেই অর্থ সম্পদ ব্যয় করা স্ত্রীর পক্ষে সম্পূর্ণ জায়েয।

অপর এক হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে; মুজার কবীলার এক সম্মানিত মহিলা হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) কে সম্বোধন করে বললেনঃ হে আল্লাহর নবী, আমরা হচ্ছি আমাদের পিতা, পুত্র ও স্বামীদের উপর এক বোঝা স্বরূপ। এমতাবস্থায় তাদের ধনমাল থেকে ব্যয় করার কোনো অধিকার আমাদের আছে কি?

জবাবে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ যাবতীয় তাজা খাদ্য তোমরা খাবে, আর অপরকে হাদিয়া-তোহফা দেবে।[৩]

এ হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, মেয়েদের জন্যে তাদের স্বামী, পিতা ও পুত্রের ধনমাল থেকে তাদের অনুমতি ছাড়াই পানাহার করা ও অপরকে হাদিয়া তোহফা দেওয়া সম্পূর্ণ জায়েজ।[৪] ঈদের ময়দানে উপস্থিত মেয়েরা হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর আহ্বানক্রমে নিজেদের অলংকারাদি যাকাত

---

[1] ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৫

[2] ইমাম বুখারী, *সহীহ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯৭

[3] ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৫৩

[4] শাওকানী, *নাইলুল আউতার*, বৈরুত, দারুল জীল, খ.৪, ১৯৭৩, পৃ. ১২৬

Dhaka University Institutional Repository

বাবদ কিংবা দ্বীনের জিহাদের জন্য দান করছিল। হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছেঃ

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) মেয়েদের কাছে উপস্থিত হয়ে তাদের নসীহত করলেন, তাদের লক্ষ্যে করে ওয়াজ করলেন এবং সাদকা দিতে আদেশ করলেন। এ সময় বিলাল কাপড় পেতে ধরলেন এবং মেয়েরা আংটি, কানের বালা, ঝুমকা ইত্যাদি অলংকার সে কাপড়ের উপর ফেলতে লাগল।[১]

এ হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, মেয়েরা তাদের নিজেদের ধন সম্পদ থেকে স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকেই দান সাদকা করতে পারে-করা জায়েয এবং দান মোট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের মধ্য থেকে হওয়ার কোনো শর্ত নেই।

উপর্যুক্ত যুক্তি প্রমাণ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে ইসলাম নারীদেরকে তার পিতা, পুত্র ও স্বামীর ধন-সম্পদ ব্যয় এর পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

নারীর তালাক প্রাপ্তি ও প্রদানের অধিকার

পারিবারিক জীবনে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় অত্যন্ত মর্মান্তিক ব্যাপার। 'তালাক' হচ্ছে এ বিপর্যয়ের চূড়ান্ত পরিণতি। নারী পুরুষের আনন্দ-ঘন মিলনে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ইহা আজীবন প্রীতিবন্ধন, সাময়িক প্রেম-নিবেদন নহে। স্বামী-স্ত্রী জীবিত থাকাকালীন এই পবিত্র বন্ধন ছিন্ন হতে পারে না। কুরআন মজীদে ইহাকে 'মীসাকান গালীজান'- অতি দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ও চুক্তিরূপে অভিহিত করা হয়েছে।[2]

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "বিবাহ কর কিন্তু তালাক দিও না, কারণ উহাতে আরশ কম্পিত হয়।"[৩]

বিশেষ অবস্থায় পরিপ্রেক্ষিতে তালাক বৈধ ও আবশ্যক হয়ে পড়লেও আল্লাহ তা'আলার নিকট হালাল কার্যের মধ্যে ইহাই ঘৃণ্যতম কাজ বলে হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ

"বৈধ কাজসমূহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাপেক্ষা অপছন্দনীয় কাজ হলো তালাক।"[১]

---

[১] ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, পূর্বোক্ত, পৃ.৭৫৪

[2] আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াতঃ ২১

[3] ইমাম আবূ দাউদ, সুনান, পূর্বোক্ত, পৃ.৬৩১

Dhaka University Institutional Repository

দাম্পত্য জীবনে অশান্তির যে সকল প্রতিকার রয়েছে তন্মধ্যে তালাকই সর্বশেষ প্রতিকার। এ ব্যবস্থা স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। তালাক অর্থ বিচ্ছিন্ন, বন্ধনমুক্ত, বৈধতাকরণছেদ। তালাক শুধু পুরুষের জন্যই বৈধ নয়, স্ত্রীর জন্যও বৈধ। তাই স্ত্রী বা স্বামী একে অন্যকে দাম্পত্য জীবনের অশান্তি হেতু, চরম গরমিলের কারণে ব্যভিচারের দোষে তালাক দিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে পারে। ইসলামের উদারনীতি নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রযোজ্য। ইহুদী, খ্রিস্টান প্রভৃতি ধর্ম নারীর অধিকার তো দূরের কথা এদের আত্মার অস্তিত্বকেই বিশ্বাস করতো না। নারীকে শাস্তিদিয়ে, নারীকে পুতুল করে, নারীর মর্যাদা হরণ করে পুরুষ গৌরবান্বিত হতো। পুরুষ দস্যু হলেও দেবতা, চোর হলেও নমস্য, ব্যভিচারী হলেও পুজারী আর অক্ষম হলেও পরম সঙ্গম মনে করেই নারীকে দিন কাটাতে হবে এটাই ছিলো পূর্ব যুগের মানুষের ধারণা। ইসলাম এই অমূলক ধারণার মাথায় কুঠারাঘাত হানল, নারীর সম্মান দিল, মান দিল, সমভাবে পুরুষের মতোই অধিকার দিল। পুরুষের পছন্দ না হলে যদি স্ত্রীকে তালাক দেওয়া যায়, তবে পুরুষকে পছন্দ না হলে নারীই বা তাকে তালাক দিতে পারবে না কেন?

তালাক প্রথাটা ঘৃণ্য প্রথা। কেউ এ প্রথাকে অভিনন্দিত করবে না, কেননা একটা ঘর বাঁধা খুব কঠিন, সময় সাপেক্ষ। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই একে ভস্মীভূত করে দেওয়া যায়। ঠিক বিবাহ ও তালাক প্রথাও তেমনি। দুটি অজানা, অচেনা প্রাণ একত্র করে ঘর করা খুবই কঠিন। কিন্তু নষ্ট করা অতি সহজ। সামান্য কয়েকটি মাত্র কথা। তাই বৈধ হওয়া সত্ত্বেও এ প্রথাকে কোনো জ্ঞানী মহাজ্ঞনী মনেপ্রাণে উৎসাহিত করেন নি।

হযরত ঈসা (আ) বলেছেন- "যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে অন্যকে বিবাহ করে, সে তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে; আর স্ত্রী যদি আপন স্বামীকে পরিত্যাগ করে আর একজনকে বিবাহ করে, তবে সেও ব্যভিচার করে।"[২]

তালাক প্রথাকে আমাদের হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মোটেই উৎসাহিত করেন নি। তিনি বলেছেন যে, তালাক দিলে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কম্পিত হয়। তাঁর এ মহান বাণী হতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা নিজেও খুশি হতে পারেন না। আরশে যা কিছু আছে, এমনকি ফেরেশ্‌তাকূলসহ তালাক দাতাকে ঘৃণার চোখে দেখে থাকে। এজন্যই হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)নারী ও পুরুষের প্রতি অনেক উপদেশ দিয়েছেন। নারীদের সম্বন্ধে বলেছেন যে, তাদেরকে পুরুষের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা

---

[1] প্রাগুক্ত

[২] বাইবেলঃ মার্ক, যীশুর বিবিধকর্ম ও শিক্ষা পরিচ্ছেদ (১০ নং Verse)

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে, তাই এদের স্বভাব বক্র। ক্ষমা করাই শ্রেষ্ঠ গুণ। ছেলেদের সম্বন্ধেও অনেক মূলবান তত্ত্ব দিয়েছেন যা পূর্বে উদ্ধৃত করেছি। নিচে মহানবী হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)এর দু-একটি বাণী এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি, "বৈধ হওয়া সত্ত্বেও যা আল্লাহর নিকট অপ্রিয় তা হলো তালাক।"[১]

"যে রমণী বিনা কারণে স্বামীর নিকট তালাকের জন্য প্রার্থনা করে, বেহেশ্‌তের সৌরভ তার জন্য হারাম।[২]

"বিশেষ কোনো অপ্রিয় কারণ না থাকলে স্ত্রীদেরকে তালাক দিও না। কারণ আল্লাহ তাআলা কেবল সুখের স্বাদগ্রহণকারী পুরুষকে বা সুখের স্বাদগ্রহণ কারিণী স্ত্রীলোককে ভালবাসেন না।"[৩]

আমরা ওপরের বাণীগুলো হতে দেখতে পাচ্ছি যে, অপ্রিয় কারণ থাকলে যা স্বামী-স্ত্রীর জীবন বিষময় করে তোলে, তখন একে অপরকে তালাক দিতে পারে। ইসলামের নিয়মানুযায়ী স্ত্রী-স্বামীকে তালাক দিতে পারে তখনি, যখন তার স্বামী অত্যাচারী, লম্পট ও অধার্মিক হয় অথবা স্ত্রীর ভরণ পোষণ দিতে স্বামী অপারগ হয় (মাতাল, নিরুদ্দেশ ইত্যাদি কারণে)। এখান থেকে বুঝা যায় যে, শান্তি প্রতিষ্ঠাই তালাক প্রথার একমাত্র কারণ। এবার আমরা দেখব কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া চলে না। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ কি সেটাও সর্বজাতির জানা প্রয়োজন। কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন,

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ- وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ- وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ-

"যারা স্ত্রীর সাথে সঙ্গম না করার শপথ করে, তারা চার মাস অপেক্ষা করবে। এরপর যদি তারা ফিরে আসে তাহলে আল্লাহ তো নিশ্চিতভাবেই পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। আর যদি তারা তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলেও নিশ্চয় আল্লাহ তো সব কিছু শোনেন, সব কিছু জানেন। তালাকপ্রাপ্তা নারী তিনটি ঋতুস্রাব পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। যদি তারা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান এনে

---

[1] ইমাম, আবূ দাউদ, *সুনান*, পূর্বোক্ত, পৃ.৬৩১

[2] প্রাগুক্ত

[3] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

থাকে তবে আল্লাহ তাদের গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখা তাদের জন্য হালাল হবে না। যদি তারা আপোষে মীমাংসা করতে চায় তাহলে ঐ সময়ের মধ্যে তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে তাদের স্বামীরা অধিকতর হকদার। স্ত্রীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে স্বামীদের উপর যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার আছে স্বামীদের। তবে স্ত্রীদের উপর স্বামীদের মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞানী।"[১]

পূর্বকালে আরবে একটা প্রথা ছিলো যে, স্বামী ওপর বিরাগভাজন হয়ে স্ত্রীকে পৃথক করে রাখত, কষ্ট দিত। তালাকও দিত না অথচ তার ভরণ পোষণও করতো না। এতে স্ত্রীর ভয়ানক কষ্ট হতো। আরববাসীদের এই শপথকে 'ঈলা' বলা হতো। আল্লাহ তাআলা এই ঈলার সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন চার মাস। এই চারমাসের মধ্যে স্ত্রীর মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে স্ত্রী যেমন নিজের ভুল বুঝে স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, স্বামীও তেমনি নিজ চরিত্রের দোষ কিছুটা অনুভব করে স্ত্রীর গুণাগুণ দেখতে পায়। সবদেশেই সর্বযুগে এমন ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়। এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ বড় সুন্দর এবং সুস্পষ্ট। এই সময়ের মধ্যে দুজন যদি সংশোধিত হয় তবে আবার তারা বিনা দ্বিধায় দাম্পত্য জীবন শুরু করতে পারে। এটা তালাকের মধ্যে গণ্য হবে না। শুধু শপথ ভঙ্গের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা অথবা আলেমদের মতে কাফ্‌ফারা দিতে পারে। আর যদি কোনোক্রমেই মিলনের সম্ভাবনা না থাকে, বিচ্ছেদকালীন এই চারমাসেও স্ত্রীর অবাধ্যতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বভাব বিনষ্ট না হয় বা সে নিজেকে সংশোধনের কোন চেষ্টাই না করে তাহলে এমন স্ত্রীকে তালাক দেওয়ায় স্বামীর কোন দোষ নেই।[২]

স্বামী যেমন নির্দিষ্ট কারণে স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে, স্ত্রীও তেমনি অনুরূপ কারণে স্বামীকে তালাক দিতে পারে এবং 'ইদ্দত' কাল শেষে সে নারী দ্বিতীয় স্বামীকে গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া স্ত্রী কিছু ধন-সম্পত্তি বা টাকা-পয়সা স্বামীকে দিয়ে তার নিকট থেকে তালাক নিতে পারে। স্বামীকে সন্তুষ্ট করে স্ত্রী যে তালাক গ্রহণ করে শরীয়াত অনুযায়ী তাকে 'খোলা' বলা হয়। এ বিষয়ে কুরআন মজীদ ও হাদীসের নির্দেশ হলো, "সাদিত-বিন্-কাইসের স্ত্রী হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে বলল, 'হে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমি সাদিত-বিন-কাইসের কোনো দোষ পাই না চরিত্রের মধ্যে বা ধর্মের মধ্যে কিন্তু

---

[১] আল-কুরআন, ২, আয়াতঃ ২২৬-২২৮।

[২] আহমদ রফিক, *ইসলামী পরিবার প্রকৃতি ও বিধান*, চট্টগ্রাম ২০০৭, পৃ.৭৬

Dhaka University Institutional Repository

আমি অকৃতজ্ঞতা করতে চাই না ইসলামে থেকে। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 'তুমি কি ফিরিয়ে দিতে চাও তার বাগান? সে বলল, 'হ্যাঁ।'

তখন হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে সাদিত, তুমি তোমার বাগান ফিরিয়ে নাও এবং তাকে তালাক দাও।"[১]

কুরআন মজীদে আল্লাহ পাক বলেন, "এবং যদি তোমরা সম্মিলিত ও সংযমী হও তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল করুণাময় এবং যদি তারা উভয়ে বিচ্ছিন্ন হয়, তবে আল্লাহ তাআলা সুপ্রশস্ত মহাজ্ঞানী।"[২]

স্ত্রী যদি স্বামীকে পছন্দ না করে, তার আচার ব্যবহার খুশি না থাকে, স্বামীকে দিয়ে তার যৌন-পিপাসা না মেটে, তাহলে জোর করে তাকে স্বামীর ঘর করার কোনো বিধান ইসলামে নাই। নর-নারীর শান্তিময় জীবন আল্লাহ ও হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর পছন্দ। জোর করে দাম্পত্য জীবন গড়া যায় না। প্রেমহীন পরিণয় আত্মাহীন দেহের তুল্য। আর তাই ইসলাম দাম্পত্য জীবনের ব্যাপারে নারী-পুরুষকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছে।

স্বামী-স্ত্রীর মিলমিশের জন্য স্ত্রীর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হলে তাদের সমঝোতার মাধ্যমে তালাক গ্রহণই স্ত্রীর জন্য উত্তম ব্যবস্থা। স্ত্রী তালাক চাইলে বিবাহে স্বামীর যে ব্যয় হয়েছে, উহা দাবি করার অধিকার স্বামীর আছে। তার দাবি-দাওয়া পূরণে অথবা যে কোনো উপায়ে তাকে সম্মত করে তালাক লওয়ার বিধান ইসলামে আছে।

কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন, "তবে যদি তাদের উভয়ের আশংকা হয় যে, তারা আল্লাহর সীমা রক্ষা করে চলিতে পারিবে না এবং তোমরা যদি আশংকা কর যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা (বাস্তবিকই) রক্ষা করে চলিতে পারিবেনা-এমতাবস্থায় স্ত্রী কোনো কিছুর বিনিময়ে (স্বামী হইতে) নিষ্কৃতি পাইতে চাহিলে ইহাতে (স্বামী-স্ত্রীর) কাহারো কোনো দোষ নাই। এই সকল আল্লাহ তাআলার সীমারেখা। অতএব, তোমরা উহা লংঘন করিও না এবং যাহারা আল্লাহ তাআলার (নির্ধারিত) সীমারেখা লংঘন করে, তারাই অত্যাচারী।"[৩]

---

[১] ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমা'ঈল, *সহীহুল বুখারী*, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৯৫

[2] আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত: ১৩০

[3] আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত: ২২৯।

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহের সময় স্ত্রীকে যে মহর প্রদানের অঙ্গীকার করা হয়, তালাকের পূর্বে তা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। এ ছাড়া স্ত্রীকে যেসব গয়নাপত্র বা সম্পত্তি বিবাহের পর দেওয়া হয় সেগুলো ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ নয়। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেনঃ "তবে তোমরা তাহাদেরকে যাহা প্রদান করেছ তাহা হতে কিছু প্রতিগ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়।"

কুরআন মজীদে আল্লাহ পাক আরো বলেন, "এবং যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে ইচ্ছে কর এবং তাদের একজনকে ধনরাশি প্রদান করে থাক, তথাপি তন্মধ্য হতে কিছু প্রতিগ্রহণ করিও না; তবে কি তোমরা অপবাদ প্রয়োগ এবং প্রকাশ্য গুনাহ্ করে উহা গ্রহণ করিবে? এবং কিরূপে তোমরা উহা গ্রহণ করিবে? বস্তুত তোমরা পরস্পর একে অন্যের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলে এবং তারা তোমাদের নিকট সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিল।"[১]

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলমিশ ও আপোষ-মীমাংসার কোনো পথ বের হয়ে আসে কিনা দেখার জন্যই তিন তালাকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একবারেই তিন তালাক দিলে এর কোনো সুযোগ থাকে না। বর্ণিত আছে, একবারে যারা তিন তালাক দেয়, হযরত উমর (রাঃ) তাদেরকে দুররা মারতেন। একবারে যে ব্যক্তি স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, তার সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণের অপরাধে সে ব্যক্তি অপরাধী।"[2]

শেষ তালাকের পরই স্ত্রীকে ঘর হতে বের করে দেওয়ার অনুমতি ইসলাম স্বামীকে দেয় না; বরং তার প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ইদ্দত (অপেক্ষাকাল) শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে গৃহের বাইরে বের করা যাবে না। এই সময়ে তার ভরণ-পোষণ করাও স্বামীর দায়িত্ব। আর এ সময়ে সে-স্বামীর বাড়িতেই পৃথক গৃহে অবস্থান করবে, অন্যত্র যাবে না এবং স্বামী-স্ত্রী তখন কেউ কারও সাথে দেখা সাক্ষাত করতে পারবে না।

তালাক হওয়ার পর যে সময়ের মধ্যে নারী পুনরায় অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না, তাকে ইদ্দত বলে। এই ইদ্দত তিনিটি মাসিক ঋতুকাল অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত। আর যারা হায়েয হতে নিরাশ হয়েছে এবং যাদের এখনও হায়েয আসে নাই, তাদের ইদ্দত হলো তিনটি চন্দ্রমাস। তালাকের সময় স্ত্রী গর্ভবতী থাকলে তার ইদ্দত হলো গর্ভস্থ শিশু ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত।

---

[১] আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত: ২০-২১

[2] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, পূর্বোক্ত, পৃ.২৮৮

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ আর যে সকল স্ত্রী লোককে তালাক দেয় হয়েছে তারা তিনটি মাসিক ঋতু পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে।[১]

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে প্রমাণিত হয় যে, দাম্পত্য জীবনে তালাকের ব্যাপারে ইসলাম নারীকে যথেষ্ট স্বাধীনতা প্রদান করেছে যা অন্য ধর্মে দৃষ্ট হয় না।

পুত্র–কন্যা জন্মে ইসলামে নারীর দায় মুক্তি

কোনো দম্পত্তির সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে এ দায়িত্ব কার? অনেক পরিবারের ক্রমাগত কন্যা সন্তান হলে স্বামীর অভিভাবকবৃন্দ অথবা নিজেই পুত্র সন্তান লাভের আশায় আর একটি বিবাহ করতে উদ্যত দেয়। অনেক সময় নারীকে শারীরিক নির্যাতন করে, এমনকি তালাক পর্যন্ত দিয়ে দেয়। কিন্তু মেয়ে সন্তান হওয়ার ব্যাপারে নারীর কোনো হাত নেই। এখানে সৃষ্টিকর্তা মানুষের মধ্যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব চালু রেখেছে। যার দায়ভার নারীর উপর বর্তায় না।

'জিন' (genes) এবং ক্রোমোসম (Chromosoms) সম্পর্কীয় অজ্ঞতার কারণেই বিভিন্ন সমাজে বিশেষ করে বাংলাদেশে এ ধরেনের কুসংস্কার চলে এসেছে এবং এজন্য নারীকে দায়ী করা হয়। পুরুষের বীর্যের মধ্যে X এবং Y এ দুজাতের ক্রোমোসম থাকে। নারীর ডিম্বে শুধুমাত্র 'X' প্রকৃতির ক্রোমোসম থাকে।

পুরুষের সাথে যৌন ক্রিয়ার ফলে পুরুষের বীর্য নারীর ডিম্বকোষের দিকে যেতে থাকে। যদি পুরুষের Y জাতের ক্রমোসম সম্বলিত শুক্র দ্রুতবেগে এগিয়ে গিয়ে নারীর X জাতীয় ক্রোমোসমের ডিম্বের সাথে মিলিত হতে পারে, তবে পুরুষ সন্তানের জন্ম হবে। অর্থাৎ পুরুষ সন্তানের জন্মের জন্য দায়ী পুরুষের প্রয়োজন X এবং Y জাতীয় ক্রোমোসম। যদি সহবাসের সময় পুরুষের বীর্যের Y জাতীয় ক্রোমোসমের শুক্রকীট নারীর X ক্রোমোসম ডিম্বের সাথে মিলিত হয়, তবে কন্যা সন্তান হবে।

নারী পুরুষের XY ক্রোমোসম জাতীয় শুক্র এবং ডিম্বানুর মিলনে হয় পুরুষ সন্তান, আর উভয়টি X অর্থাৎ দুইটি XX মার্কা ক্রোমোসম জাতীয় ডিম্বানুর শুক্রকীটের মিলনে হয় কন্যা সন্তান।[১]

---

[1] আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াতঃ ২২৮

Dhaka University Institutional Repository

সহজে বোঝার জন্য আরো একটু বিস্তারিত ভাবে এবং দ্বিরুক্তি করে কল্পিত উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করতে পারি। ধরে নিই Y মার্কা ক্রোমোসম পুরুষ জাতীয় এবং X মার্কা ক্রোমোসম নারী জাতীয়, পুরুষের বীর্যে একই সঙ্গে X মার্কা ও Y মার্কা উভয়ে ক্রোমোসম থাকে। Y মার্কা ক্রোমোসমের কারণে হয় পুত্র সন্তান এবং X মার্কা ক্রোমোসমের কারণে হয় কন্যা সন্তান।

সন্তান জন্মের জন্য নারীর ডিম্ব এবং পুরুষের বীর্যের দরকার হয় এবং এ জন্য ইসলামে বৈধভাবে বিবাহের মাধ্যমে শারীরিক মিলন ছাড়া আর কোন পথ রাখা হয়নি। পুরুষের বীর্য হতে যদি X মার্কা ক্রোমোসোম দিয়ে নারীর X মার্কা ডিম্বের সাথে মিলিত হয় তবে সন্তান হবে কন্যা। নারীর ডিম্বে কোনো Y মার্কা বা পুরুষ জাতীয় ক্রোমোসম থাকে না, তা আসবে পুরুষের শুক্র থেকে। পুরুষের বীর্যে থেকে যদি Y মার্কা ক্রোমোসম নারীর ডিম্বানুতে প্রবেশ করতে না পারে বা প্রত্যেকবারই যদি X মার্কা ক্রোমোসমই প্রবেশ করে তবে দুটি X এর মিলনে কন্যা সন্তান হবে। পুত্র সন্তান হয় নারীর X জাতীয় ক্রোমোসমের সাথে পুরুষের Y জাতীয় ক্রোমোসমের মিলনে।

নারীর কন্যা সন্তান জন্মের জন্য পুরুষের অজ্ঞতার কারণেই অহেতুক দায়ী করা হয়। পুরুষের দেহ হতে কি X জাতীয় ক্রোমোসম নারী দেহে যাবে অথবা Y জাতীয় ক্রোমোসম যাবে, তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। এতে যার পুত্র সন্তান হয় না তার করণীয় কিছুই নেই। ইচ্ছা করে কোনো পুরুষ সহবাসের সময় তার দেহ হতে Y জাতীয় বা পুরুষ ক্রোমোসমের শুক্র নারী দেহের ডিম্বে স্বীয় প্রচেষ্টায় প্রবেশ করাতে পারে না।

বিজ্ঞানীরা আজকাল চেষ্টা করেছেন পুরুষের Y এবং X জাতীয় শুক্রকীটকে ল্যাবরেটরীর পরীক্ষার মাধ্যমে আলাদা করে নিতে। যদি এরূপ গবেষণা সফল হয়, তবে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে শুধুমাত্র Y জাতীয় ক্রোমোসমের শুক্র নারী দেহে প্রবেশ করিয়ে পুরুষ সন্তান প্রাপ্তি সম্ভব হতে পারে।

কন্যা সন্তানের ব্যাপারে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মেয়ে সন্তানদের ঘৃণা করো না। তারাই তোমাদের নয়ন শান্তিকর আনন্দদায়ক আপনজন।[2]

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেনঃ "প্রথম সন্তান কন্যা হওয়া মেয়েদের জন্য একটি সৌভাগ্য।"[3]

---

[1] R. R. Wright, *An Internal Biological Analysis,* Oxford 1998, p.217-18

[2] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, পূর্বোক্ত, পৃ.২১০

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলে করিম (সাঃ) আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি এই কন্যাসন্তানের জন্মে অসুবিধায় পড়ল, সে যদি তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে, তাহলে এই মেয়েরা তাদের জন্য জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার কারণ হবে।[2]

পুত্র সন্তান বা কন্যা সন্তান জন্মের ব্যাপারে কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।"[3]

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে-পুত্র বা কন্যা সন্তান জন্মের ব্যাপারে নারীর কোনো হাত বা দায় নেই, এ ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। এভাবে ইসলামে নারীকে কন্যা সন্তান জন্মদানের দায়ভার থেকে মুক্তি প্রদান করেছে।

সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণের অধিকার

ইসলামের ধর্মীয় দিগন্তে নারী এবং পুরুষের সমান অধিকার রয়েছে। ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধতা নেই। নিপীড়িত, নির্যাতিত নারী জাতি কতোভাবেই না লাঞ্ছিত অপমানিত হয়েছে অন্যান্য ধর্মে। কেউ তাদের বলতো শয়তানের যন্ত্র, কেউ বলতো কামড়ানো বিচ্ছু; কেউ বা বলতো খল, ভীমরুল, বোলতা ও বিষাক্ত সাপ, বাধা দেওয়ার কেউ ছিলো না। প্রতিবাদ করার কারো সাহস ছিলো না। পথে-ঘাটে ধর্ষিতা হতো, স্বামীর ঘরে পশুর মতো মার খেত, সমাজের বিচারে অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিত। প্রাণের ভয়ে সৃষ্টিকর্তার কাছে নিবেদন জানাবে সে সুযোগ ও ছিলো না। বেদবাণী শুনলে কানে গরম সীসা ঢেলে দেওয়া হতো। আঁতুর ঘরে থাকলে নারী অস্পৃশ্যা হতো।

কিন্তু ইসলাম দিল নারীকে ধর্মের অধিকার। ইসলাম ধর্মে নারী আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে যে কোনো স্তরে উন্নীত হতে পারে। পবিত্র কুরআন মজীদে বলা হয়েছে,

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ
وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ

---

[1] প্রাগুক্ত, পৃ.২২১

[2] ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৪৭

[3] আল-কুরআন, সূরা শূরা, আয়াত: ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

"নিশ্চয় আল্লাহ মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, (আল্লাহ ও রাসূলের) অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সাওম পালনকারী পুরুষ ও সাওম পালনকারী নারী, (অবৈধ সম্পর্ক থেকে) যৌনাঙ্গকে হিফাযতকারী পুরুষ ও হিফাযতকারী নারী এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী – তাদের সকলের জন্য আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা এবং মহাপুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।"[১]

ওপরে বর্ণিত কুরআন মজীদের আয়াতে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে, আল্লাহ পাক পুরুষ ও নারীকে এক সঙ্গেই সম্বোধন করেছেন যারা তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে সৎকর্ম করছে এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী চলছে।

নারীর জন্যও যে ধর্মের প্রয়োজন, নারীর কর্তব্যও যে পুরুষের মতোই, নারীর প্রতিদানও যে পুরুষেরই অনুরূপ-এ কথাই তিনি বুঝিয়ে দিয়ে নর-নারীর পার্থক্যের যেমন অবসান করেছেন, তেমনি তাদের উৎসাহিত করে ধর্মের পথে তুলে দিয়েছে। যারা মনে করতো নারী উপাসনার জন্য নয়, সৎচিন্তার জন্য নয়, দান করে পূণ্য অর্জনের জন্য নয় তাদের অন্ধ চিন্তাধারাকে এ বাণী নির্মূল করে দিয়েছে এবং নারীদের ধর্মের স্বাধীনতাকে ঘোষণা করেছে। এরূপ বাণী কুরআন মজীদে আমরা আরও বহু স্থানে দেখতে পাই।

অন্য আয়াতে কুরআন মজীদে ঘোষণা করা হয়েছে,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

"মুমিন পুরুষ অথবা মুমিন নারীর মধ্যে যে সৎকাজ করবে তাকে আমি অবশ্যই পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কাজের শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার দান করব।"[২]

---

[১] আল-কুরআন, সূরা আহযাব, আয়াত: ৩৫।

[২] আল-কুরআন, সূরা নহল, আয়াত: ৯৭

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের যে পাঁচটি স্তম্ভ আছে কালিমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত- এর প্রত্যেকটিতেই নারীর সমঅধিকার রয়েছে। এসবক্ষেত্রে নারীর দায়িত্ব পুরুষ স্কন্ধে বহন করে নারীদের মুক্তি দেবে বা পার করবে এ ক্ষমতা পুরুষের নেই। পাহাড়সম পুণ্য অর্জনে নারীর কোনো বাধা নেই। সুদূর আরবের কাবা ঘরে গিয়ে হজব্রত পালন করবে, পুরুষের সঙ্গে অনাবৃত মস্তকে কাবা প্রদক্ষিণ করবে, আল্লাহর কাছে হাত তুলে মোনাজাত করবে, এতে নারীর কোনোই দোষ নেই। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)এ অধিকার নারীদের দিয়েছেন। সাম্যবাদের ঝড়-তুফান তুলে নারীরা যে অধিকার চায় ইসলাম তা পুরণ করেছে তাদের ধর্মীয় জীবনে। হাদীসেও নারীর ধর্মীয় স্বাধীনতার বর্ণনা আছে।

শিক্ষা-দীক্ষা, কুরআন মজীদ তেলাওয়াত, নামাজ, রোজা ও যাকাতে নারী-স্বাধীন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)এর সময় নারীরা ফজরের নামাজে সমস্ত শরীর আবৃত করে পুরুষের সঙ্গে মসজিদে গমন করতেন। এশার নামাজেও অনেক নারী মসজিদে গমন করতেন।[১]

ইসলাম ধর্মে নারীদেরকে ধর্মের ব্যাপারে অনেক স্বাধীনতা দিয়েছে। এমনকি আনুষ্ঠানিক ভাবে পালনকৃত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ও নারীর অংশগ্রহণে তেমন কোনো বাধা নেই। ইজ্জত-আব্রু, পর্দা ও শালীনতা রক্ষা করে তারা সে সকল ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে যোগ দিত।

ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, "স্ত্রী (মসজিদে আসাবার) অনুমতি চাইলে, স্বামী যেন নিষেধ না করে।"[২]

স্ত্রীদের মসজিদে যাবার ব্যাপারে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)এর নির্দেশ নিম্নরূপঃ "যদি রাত্রিকালে মসজিদে যাইতে তোমাদের স্ত্রীরা অনুমতি চায় তবে অনুমতি দিবে।"[৩]

উক্ত নির্দেশ পেয়ে নারীরা অনেকেই জামাতে নামাজ পড়তে মসজিদে গমন করতেন। অনেকের নির্দেশটি মন মতো না হলেও স্ত্রীদের মসজিদে গমনে বাধা দেবার সাহস তাদের হয় নি এ তত্ত্বটিও মেলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের বর্ণনা হতে।

তিনি বর্ণনা করেছেন, "হজরত ওমর (রাঃ) এর স্ত্রী রাত্রির ও ভোরের নামাজে মসজিদে যেতেন। তার স্বামী তা পছন্দ না করলেও কখনও নিষেধ করতে সাহসী হন নাই। কেননা হযরত রাসূলুল্লাহ

---

[1] ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৯৮

[2] ইমাম মুসলিম, সহীহ, পূর্বোক্ত, পৃ.৩২৬

[৩] ইমাম বুখারী, সহীহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৫

Dhaka University Institutional Repository

(সা) বলেছেন, 'আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদে যেতে নিষেধ করো না।"[১] এটা শুনে ইবনে ওমরের পুত্র বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি এতে নিষেধ করবো। ইবনে ওমর এতে অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে তিরস্কার করেন এবং সারাজীবন তার সঙ্গে কথা বলেন নি।"[২]

হযরত উম্মে সালমা বর্ণনা করেছেন- "নারীরা পুরুষের পশ্চাতে থেকে নামাজে যোগ দিতেন। সালাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তারা মসজিদ হতে সত্বর চলে যেতেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর শিষ্যেরা সালাম উচ্চারণের পর কিছুক্ষণ বসে অপেক্ষা করতেন, পরে অন্য নামাজ পড়তেন।"[৩]

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও জুম্মার নামাজে নারীদের যোগদান ইচ্ছাধীন ছিল। বাধ্যবাধকতা কিছু ছিলো না। কেননা নারীরা পুরুষের মতো মুক্ত নয়। ঋতুমতী, গর্ভবতী, স্তন্যদান ও গৃহকর্মে জড়িত থাকাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু দুই ঈদের নামাজে সমস্ত ধরনের মেয়েদেরই যোগদানের নির্দেশ হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)দিয়েছে। এ তত্ত্বটি মেলে তাঁর নিম্নোক্ত বাণী হতে-

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ "সকল নারী এমনকি ঋতুমতী ও অন্তঃপুরবাসিনী যুবতীরা পর্যন্ত যেন ঈদের ময়দানে যায় এবং মুসলমানদের জামাআত ও দোয়ায় যোগদান করে। তবে ঋতুমতী স্ত্রীলোকের নামাজরে স্থান অন্য সকলের স্থান হতে পৃথক,থাকবে।" একজন স্ত্রীলোক বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যদি কোনো স্ত্রীলোকের চাদর না থাকে? তিনি উত্তর দিলেন, 'তার সঙ্গিনী তাদের চাদর দিবে।'[৪]

ঈদ ও জুমার নামাজে যোগদানের প্রশ্নে অনেকেরই মনে কিছুটা গোলক ধাঁধা বাঁধার সম্ভাবনা। আমাদের দেশে কোথাও এ প্রথা দেখা যায় না। কিন্তু ইসলাম নারীদের সে অধিকার দিয়েছে। বিশেষ বিধানের সঙ্গে পুরুষ নারীদের জামাআতে ইমামতি করতে পারত। হযরতের সময়ে নারীরা নারীদের

---

[1] প্রাগুক্ত

[2] ইমাম ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৪৩

[3] ইমাম বুখারী, *সহীহ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯০

[4] ইমাম বুখারী, *সহীহ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩১

Dhaka University Institutional Repository

জামাআতের ইমামতি করতো। হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) (হযরতের পত্নীদ্বয়) তারাবীর নামাজে ও ফজরের নামাজে স্ত্রীলোকদের ইমামতি করতেন।[১]

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইসলাম নারীদের ধর্ম পালনের বেশ অধিকার দিয়েছে। দ্বীনের দাওয়াত এবং ধর্মীয় অন্যান্য ক্রিয়াকর্মে তাদের পূর্ণ অধিকার আছে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের অভিভাবক। তারা ভাল কাজের আদেশ দেয়, খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, সালাত কায়িম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। আল্লাহ তাদের প্রতি অচিরেই রহমত নাযিল করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়।"[২]

উপর্যুক্ত আয়াত হতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম নারীর ধর্ম পালনের যথাযথ অধিকার বা স্বাধীনতা দিয়েছে।

ইসলামী বিপ্লবে অংশ গ্রহণের সুযোগ

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর যুগের কোনো কোনো নারীর ধারণা হলো যে, ইসলামের নৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পুরুষের অবদান হবে বেশী। তাঁরা হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট গমন করে সম্মুখে বসে থাকতে পারেন এবং আনুগত্যের শপথ নিতে পারেন।

নারীদের পক্ষে যে কোনো সময় হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হওয়া অসুবিধাজনক। তারা পুরুষের ন্যায় ইসলামের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে পারে না।

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] আল-কুরআন, সূরা তওবা, আয়াতঃ ৭১

Dhaka University Institutional Repository

কয়েকজন নারী আল্লাহ তাআলার নবী (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, তারাও কি পুরুষের ন্যায় জীনের সর্বক্ষেত্রে আনুগত্যের শপথ নিতে পারেন? হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে জানালেন যে, তাদেরও পুরুষের অনুরূপ অধিকার আছে।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) তিনি মেয়েদের বায়াত গ্রহণ বা আনুগত্যের শপথ নেওয়ার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিলেন, যেদিন তারা এসে দ্বীনি জীবন যাপনের "বায়াত" বা আনুগত্যের শপথ নিতেন।

এ সম্পর্কে আল্-কোরআনে বলা হয়েছেঃ হে নবী (সাঃ) মোমিন নারীগণ যখন আপনার নিকট এসে 'বায়াত' করে এ মর্মে যে তারা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যাভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না এবং কুৎসা রটনা করে বেড়াবে না, সৎকাজে 'বায়াত' বা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন।[1]

কৃতকর্মের শাস্তি এবং পুরস্কারের ব্যাপারে নারী-পুরুষের মধ্যে ইনসাফ করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শারীরিক দুর্বলতার কারণে নারীকে কম শাস্তি দেওয়া হয়। কুরআন মজীদে উল্লেখ করা হয়েছে, অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, 'আমি তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষ অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না। তোমরা একে অপরের অংশ।[2]

কুরআন মজীদে আরও বলা হয়েছেঃ নারী বা পুরুষ কেহ সৎকাজ করলে ও মুমিন হলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাঁদের প্রতি এক অণু পরিমান ও জুলুম করা হবে না।[3]

স্বামীর পূণ্য বা পাপের কারণে স্ত্রী পুরস্কৃত হবে না এবং শাস্তিও পাবে না, তাঁরা নিজেদের আমলের জন্যই পুরস্কৃত হবে অথবা শাস্তি পাবে। ফেরাউন ছিলো আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ এবং ধর্মত্যাগী অভিশপ্ত। কিন্তু তার স্ত্রীকে আল্লাহ মুনিদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। একজন কাফেরের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাকে শাস্তি পেতে হবে না, বরং আল্লাহ মুমিনদের জন্য ফেরাউন পত্নীর দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছেঃ আল্লাহ মুমিনদের জন্য উপস্থিত করেছেন ফেরাউন পত্নীর দৃষ্টান্ত, যে

---

[1] আল-কুরআন, মুমতাহিনা, আয়াতঃ ১২

[2] আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াতঃ ১৯৫

[3] আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াতঃ ১২৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রার্থনা করেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তোমরা সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ কর এবং আমাকে উদ্ধার কর ফেরাউন ও তার দুষ্কৃতি হতে এবং জালিম সম্প্রদায় হতে।[১]

অন্যদিকে নবী পত্নী হওয়ার কারণে ও কোনো নারীকে তার অপরাধের জন্য ক্ষমা করা হবে না। এ ছাড়া দু'জন পথ ভ্রষ্টা নারী ছিলেন হযরত নূহ্ এবং লুৎ (আঃ)-এর পত্নী। তাদের সম্বন্ধে কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ আল্লাহ কাফেরদের জন্য নূহ (আ) এবং লুৎ (আ) এর স্ত্রীর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন। ওরা ছিলো আমার দুই সৎকর্মশীল বান্দার অধীন। কিন্তু তারা নবীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ফলে নূহ্ এবং লুৎ(আ) তাদেরকে আল্লাহ তাআলার শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারতো না এবং তাদেরকে বলা হবে জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সংগে তোমরাও উহাতে প্রবেশ কর।[2] সুতরাং আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ইসলাম নারীকে ইসলামী বিপ্লবে অংশ গ্রহণেরও সুযোগ করে দিয়েছে।

জেহাদের ব্যাপারে সমতা

দেশ ও ধর্ম রক্ষায় ইসলাম নারী পুরুষকে সমভাবে দায়িত্ব দিয়েছে। জেহাদের দায়িত্ব শুধু পুরুষের উপর নয়, নারীর উপর। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "অভিযানে বের হয়ে পড়ে হালকা অবস্থায় হোক ভারী অবস্থায় হোক (রণসম্ভার বেশী হোক, কম হোক)। সংগ্রাম করো আল্লাহ তাআলার পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে।"[৩]

উপর্যুক্ত আয়াত নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। তবে নারীরা তাদের শক্তি সামর্থ মত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে। তাদের অশ্বারোহী হয়ে এবং অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে হবে এরূপ কোনো বাধ্যবাধকতা ইসলাম আরোপ করেনি।

মুসলিম নারীরা যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষের সহযাত্রী হতো। তারা যোদ্ধাদেরকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করতো। তাদের কাজ ছিলো আহতদের সেবা-শুশ্রুষা করা, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মৃতদের সরিয়ে নেওয়া, যোদ্ধাদেরকে অস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধসামগ্রী সরবরাহ করা। এরূপ দায়িত্ব পালনে তাদেরকেও মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে হতো।

---

[১] আল-কুরআন, সূরা তাহরীম, আয়াতঃ ১১

[2] আল-কুরআন, সূরা তাহরীম, আয়াতঃ ১০

[৩] আল-কুরআন, সূরা তওবা, আয়াতঃ ৪১

বিবাহিতা মহিলাগণ যুদ্ধে অংশগ্রহণের পূর্বে স্বামীর অনুমতি গ্রহণ করতো। অবিবাহিতাদের তেমন বাধ্য বাধকতা ছিলো না। যে সমস্ত ক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রচণ্ডতা তীব্র হতো, সকল নারীই তখন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতো। অস্ত্র নিয়েও শত্রুকে আক্রমণ করতো। নারী বলে তারা পিছু হটে থাকতো না। ধর্ম ও দেশ রক্ষায় তারা পুরুষের ন্যায় মৃত্যুবরণ করতো।

মহিয়সী মহিলা খানছা নিজে উপস্থিত থেকে তাঁর সন্তানদেরকে জেহাদে উৎসাহিত করতেন। তিনি তাঁর ৪টি সন্তানকে নিজে উপস্থিত থেকে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় উৎসর্গ করেছেন। তাদের মৃত্যুর খবর পেয়ে অশ্রু বিসর্জন করেছেন। কিন্তু সংগে সংগে শুকরিয়া আদায় করেছেন এই বলে, আল্লাহ তাআলার রাস্তায় জিহাদ ও লড়াই করার দায়িত্ব প্রতিটি মুসলমানের উপর ন্যস্ত এবং শুধু পয়গাম্বর (সাঃ) এ জন্য আদিষ্ট নন।[১]

অহুদ যুদ্ধে একজন মহিলা সাহাবীর বীরত্ব গাঁথা অমর হয়ে আছে। তিনি হলেন সাহাবীয়া নাসিবা বিনতে কা'ব। অহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয়ের পর বহু সংখ্যক দুশমন আল্লাহর নবীকে একযোগে আক্রমন করেন। আক্রমন কালে তারা তলোয়ার, বল্লম এবং তীর ব্যবহার করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে হত্যা করা।

এই সংকটময় অবস্থায় নাসিবা বিনতে কা'ব তলোয়ার এবং তীর নিয়ে শত্রুর সংগে মরণপণ যুদ্ধ করেছিলেন। আহত হয়েও তিনি ওহ! আমার মোহাম্মদ বলে চিৎকার করেছিলেন। দেহে বহু সংখ্যক আঘাতের ফলে তার প্রচুর রক্তপাত হয় এবং তিনি মাটিতে পড়ে যান। কিন্তু যখন তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় তখন ও তিনি জিজ্ঞাসা করতে থাকেন আল্লাহ তাআলার রাসূল (সাঃ) কি দুশমনের থেকে নিরাপদ হয়েছেন?[২]

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইসলাম নারীদেরকে প্রয়োজনে জেহাদে অংশগ্রহণের ব্যাপারেও পুরুষের ন্যায় সমতা প্রদান করেছে।

---

[১] নিউজ লেটার, ২৮ তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ইরান দূতাবাস, মার্চ-এপ্রিল, ২০০৬, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৭

[2] Ibn Kathir Al-Bidayah, vol-42, pp. 34,35.

Dhaka University Institutional Repository

আল রা'বী বিনতে মু'য়াজ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমরা আল্লাহ তাআলার রাসূল (সাঃ) এর সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমাদের কাজ ছিলো যোদ্ধাদেরকে পানি পান করানো এবং তাদের সেবা করা। আহত ও মৃতদের আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে সরিয়ে দিতাম এবং মদিনায় পাঠিয়ে দিতাম।[১]

তখনকার দিনে পুরুষ সাহাবীগণই কাফেরদের মধ্যে যারা বন্দী হতো তাদের পক্ষে সুপারিশ করতেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) মহিলাদেরকেও এইরূপ অধিকার দান করেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর নেতৃত্বে ছয়টি যোগদান কারী দলের একজন মহিলা সাহাবী বলেছেনঃ আমরা আহতদের জখমের ওপর ব্যান্ডেজ করতাম এবং রোগাক্রান্তদের চিকিৎসা বা সেবা-শুশ্রূষা করতাম।[২]

সবচেয়ে বড় কথা এই মহিলারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের জন্য বিশেষ সম্মান ও পরকালের মহা কল্যাণ লাভের উপায় মনে করে এই সব কাজে অংশগ্রহণ করতেন। সুতরাং ইসলামে নারীদেরকে জিহাদে অংশগ্রহণে সুযোগ করে দিয়ে তাদের যথাযথ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

স্বাধীন মত প্রকাশ ও পরামর্শ দানের অধিকার

উপর্যুক্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, ইসলামী সমাজের ভাল-মন্দ ও লাভক্ষতির ব্যাপারে মুসলিম মহিলারা কখনও নিঃসম্পর্ক বা নীরব-নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে থাকতে পারে না। কেননা সমাজের ভাঙ্গা-গড়া, উন্নতি-অবনতি ও কল্যাণ-অল্যাণের সাথে নারী-পুরুষ সকলেরই নিবিড় ও অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক বিদ্যমান। আবার সমাজের কল্যাণ সাধিত হলে তার সুফল নারী সমাজ ও সমানভাবে ভোগ করে। এমতাবস্থায় কোন মহিলাই কল্যাণ সাধনের কাজ থেকে কিছুতেই দূরে থাকতে পারে না। সমাজ জীবনের বিভিন্ন ব্যাপারে তা ব্যক্তিগত হোক বা সামাজিক-সমষ্টিরই হোক নিজেদের অভিমত ও হৃদয়াবেগ প্রকাশের অবাধ অধিকার ইসলামে সর্বোতভাবে স্বীকৃত। মৌখিক ভাবে প্রকাশ, লেখনী চালানো ইত্যকার যে কোনো উপায়ে হোক, নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে এই মত প্রকাশের অধিকার ইসলামে তারা অনায়াসে ভোগ করতে পারবে। এই অধিকার থেকে কেউই তাদের বঞ্চিত রাখতে পারে না।

---

[১] ইমাম বুখারী, সহীহ, পূর্বোক্ত, পৃ.১০৫

[২] ইমাম মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল কুশায়রী, সহীহ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৪১

Dhaka University Institutional Repository

নারীদের একান্ত নিজস্ব ব্যাপারে বিয়ে, খোলা তালাক গ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে-ইসলামী শরীয়াত স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, অন্য কেউ নিজের সিদ্ধান্ত তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারে না। এ পর্যায়ে যা কিছু করা হবে, তা করতে হবে তাদের মতের ভিত্তিতে।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেনঃ একবার বিবাহিতা নারীকে বৈধব্য বা তালাক প্রাপ্তির পর পুনরায় বিয়ে দেওয়া যাবে কেবল মাত্র তখন, যখন সে তা করার পরামর্শ দেবে। অনুরূপভাবে কুমারী মেয়েকে বিয়ে দেওয়া যাবে শুধুমাত্র তার অনুমতি পাওয়ার পর।[1]

ইয়াতীম মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে ও সর্বপ্রথমে তাদের সাথে পরামর্শ করতে হবে। কেননা তারা ইয়াতীম বলে বহু উদ্দেশ্য পরায়ণ স্বার্থপর ব্যক্তি তাদের ওপর নানাভবে জুলুম-নির্যাতন চালাতে পারে, শরীয়াতের দেওয়া অধিকার থেকেও তাদের বঞ্চিত করতে পারে; তাদের বিয়ে নিয়ে টালবাহানা করতে পারে। এ কারণে বিশেষভাবে তাদের মতামত নিয়েই তাদের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে, এর পূর্বে নয়।

ইসলামী শরীয়াত যে নারীকে যাবতীয় ব্যাপারে দায়িত্বশীল বানিয়েছে, তা এভাবেই তাদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দিয়ে কার্যকর হতে পারে।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেছেনঃ স্ত্রীলোকদের সাথে তাদের কন্যাদের ব্যাপারে পরামর্শ কর।

বস্তুতঃ জীবনের যে সব ব্যাপারে স্ত্রীলোকেরা অন্যদের তুলনায় অধিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী, তুলনামূলকভাবে ভাল ও বেশী জানে, যেসব ব্যাপারে তাদের সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে সমাজকে উপকৃত হতে হবে। নারী সমাজের সাথেও পরামর্শ করা এবং তাদের মতামত জানা ছিলো রাসূলে করীম (সাঃ)-এর একটা স্থায়ী রীতি। হযরত হাসান বসরী বলেছেনঃ হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) প্রায়শঃই পরামর্শ করতেন, এমনকি স্ত্রীলোকদের সাথেও। তাদের পরামর্শও তিনি গ্রহণ করতেন।[2]

এই পরামর্শ গ্রহণের ব্যাপারে কোনো বিষয় নির্দিষ্ট ছিলো না। জীবনের যাবতীয় ব্যাপারেই তাদের সঙ্গে পরামর্শ করা হত। তাতে কোনো একটা দিকও বাদ পড়তো না।

---

[1] ইমাম বুখারী, *সহীহ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭

[2] ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪০

Dhaka University Institutional Repository

হুদাইবয়ার সন্ধির একটি শর্ত ছিল, এই বছর মুসলমানগণ উমরাহ না করেই ফিরে যাবে। তাই হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)কে হুদাবিয়াতেই ইহরাম খুলে ফেলা ও সঙ্গে করে নিয়ে আসা পশুগুলো জবাই করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সাহাবাগণ যেহেতু এ সন্ধি ও সন্ধির শর্তসমূহ দেখে বিশেষ ভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন, সে কারণে তাঁরা কেউ হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর এই নির্দেশ পালনে কোনো তৎপরতাই দেখালেন না। এইরূপ অবস্থা দেখে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) এর নিকট দুঃখ প্রকাশ করলেন। তিনি সাহাবাদের মনস্তত্ত্ব লক্ষ্য করে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা সহকারে পরামর্শ দিলেনঃ "আপনি এরপর কাউকে আর কিছুই না বলে যা কিছু করার আপনি নিজেই অগ্রসর হয়ে করে ফেলেন। দেখবেন, সকলেই আপনার দেখাদেখি সব কাজই করবেন। তখন আর কেউ আপনার আদেশ পালনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হবে না।"

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এই পরামর্শ সানন্দে গ্রহণ করলেন এবং যখনই তিনি করণীয় সব কাজ করলেন, সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) ও তাঁর অনুসরণ শুরু করে দিলেন। এভাবে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)এর যথার্থ ও সুচিন্তিত পরার্মশ উপস্থিত অচলাবস্থা দূর করতে সক্ষম হলো এবং বাস্তবিকভাবে প্রমাণ করে দিল যে মহিলাদেরও যথেষ্ট জ্ঞান বুদ্ধি আছে এবং তাদের পরামর্শ জাতীয় জীবনের অনেক সমস্যারই সমাধান করতে সক্ষম।[১]

সুতরাং ইসলাম পরামর্শদানের ক্ষেত্রেও নারীদের পিছিয়ে রাখেনি। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর পর খুলাফায়ে রাশেদীন ও তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে মহিলাদের দেওয়া পরামর্শ গ্রহণ করতেন। একটি বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ হযরত উমর (রাঃ) অগ্রবর্তী সামষ্টিক বিষয়াদিতে মত দিতে সক্ষম লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। এমন কি এই ধরনের ব্যাপারে বিবেক বুদ্ধির অধিকারীণী কোনো মহিলা হলেও তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেন। তাঁর দেওয়া পরামর্শে কল্যাণের কোনো দিক দেখতে পেলে কিংবা কোনো ভাল পছন্দনীয় জিনিস পেলে তা তিনি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতেন।

হযরত শিফা (রাঃ) হিজরতের পূর্বেই ঈমান এনেছিলেন। তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট বায়'আতও গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বুদ্ধি বিবেচনায় খুবই মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন।

---

[1] ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, ১ম খণ্ড, বৈরুত, তা.বি. পৃ.১৪৩

Dhaka University Institutional Repository

জীবনীকার ইবনে আবদুল বার লিখেছেনঃ হযরত উমর (রাঃ) পরামর্শ দান ও মত প্রকাশে তাঁকে অগ্রবর্তী স্থান দিতেন তিনি (কথাবার্তায়) তাঁকে সন্তুষ্ট রাখতেন এবং তাঁকে অন্যদের ওপর বিশেষ মর্যাদা দিতেন।

হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলী (রা) সম্পর্কেও এই ধরনের নীতি অনুসরণ সংক্রান্ত বিবরণ গ্রন্থাবলীতে উদ্ধৃত হয়েছে। খলীফা নির্বাচনে পুরুষদের ন্যায় মহিলাদের মতামত ও গ্রহণ করা হয়েছে। এভাবেই ইসলাম যুগে যুগে অবহেলিত নারীকে পরামর্শদানের সুযোগ প্রদান করে তাদের স্বাধীন মত প্রকাশের মর্যাদাকে কে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

নারীর মানসিক অধিকার

প্রতিটি জীবই চায় তার স্বাধীন মত অনুযায়ী চলা ফেরা করতে ও বেঁচে থাকতে। এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করলেই তার বিরুদ্ধে জুলুম করা হয়। মানুষ আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ট সৃষ্টি। তার অধিকার সবার উপরে। অথচ এ মানুষ এক জন আর একজনের অধিকারকে নির্মমভাবে হরণ করে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। সমাজের সব সুযোগ, সুকীর্তি ও সুখ-সম্পদ লুটে নিতে চায়। ক্রীতাদাসী প্রথা, সহমরণ ও সতীদাহ প্রথা, আমরণ বৈধব্য প্রথা যুগ যুগ ধরে নারীদের প্রাণে যে অসীম জ্বালা দিয়ে এসেছে তার বিবরণ দেয়ার মত ভাষা আমার নেই। তবুও একটু আলোচনা না করে পারছিনা। কেননা নারীর অধিকারের উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করছি। তাই এর উপর একটু আলোকপাত করে দেখতে চাই যে পূর্বে নারীর মনকে স্বীকার করা হতো কি না? তাদের মনের স্বাধীনতা ছিলো কি না? মানসিক অধিকার তাদের দেওয়া হয়েছিলো কি না?

প্রচীনকালে মিশর ব্যাবিলন, অ্যাসিরিয়া প্রভৃতি দেশে রাজা-মহারাজা বা গণ্যমান্য কোনো ধনী ব্যক্তির মৃত্যু হলে তাকে সমাধিস্থ করার সময় বা দাহ করার সময় তার স্ত্রী, দাসী, খাট-পালঙ্ক এবং কিছু খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে দেওয়া হত। তারা মনে করতো পরপারে গিয়ে ঐ ব্যক্তি স্ত্রী, দাসী ও খাদ্যভাবে ভয়ানক কষ্ট পাবে। যে সব হতভাগী নারী ও দাসী এসব খ্যাতনামা রাজা-বাদশাহদের মনের খোরাক জোটাত তাদের কি মনের স্বাধীনতা ছিল? তারা কি স্বাধীন ও প্রফুল্ল মনে স্বামীর কবরে শয্যা রচনা করতো? জোর করে, জুলুম করে ও অত্যাচার করে, এসব নারীর মানবিক অধিকারকে ছিনিয়ে নিয়ে মানসিক স্বাধীনসত্তার কবর দিত।[১]

---

[১] অধ্যাপক নাজির আহমেদ ও ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, পূর্বোক্ত, পৃ.২১

Dhaka University Institutional Repository

ঠিক এ প্রথারই ছোঁয়া লাগে প্রাচীন হিন্দু ধর্মে। তাদের সময় সতীত্বকে প্রমাণ করতে মেয়েরা স্বামীর মৃত্যুর পর চিতায় তার গলাধরে অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে যেত এবং প্রমাণ করতো যে, তারা সতী। মানুষ কেন, পতঙ্গ ছাড়া এমন কোনো সৃষ্ট জীব নেই, যারা আগুনে ভয় করে না। মেয়েরা রাগের বশবর্তী হয়ে, দুঃখে অসহ্য জ্বালা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে গলায় ফাঁস ঝোলাতে পারে, পানিতে ডুবে মরতে পারে কিন্তু জ্বলন্ত অগ্নিকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে মরতে পাওে না।

এমন দৃষ্টান্ত বিরল। উন্মাদিনী ছাড়া এ প্রকৃতি কোনো নারীরই হয় না। অথচ এদের টেনে হেঁচড়ে স্বামীর চিতায় পোড়ানো হতো, তারা পালিয়ে রক্ষা পেত না। প্রাণ ফেটে কেঁদে ও কোনো মহাত্মার হৃদয় গলাতে পারতো না। স্বামীর মৃত্যুর পর কি তাদের বেঁচে থাকবার ইচ্ছে হতো না? ছেলে-মেয়ে নিয়ে কি স্বামীর স্মৃতি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত হৃদয়ে বহন করার বাসনা তাদের জাগত না? কত মেয়ে শুধু বাঁচার আশায় নিজেকে অসতী বলেও আখ্যায়িত করতো অথচ নিষ্ঠুর সমাজ ব্যবস্থা এদের ছাড়ত না।

স্বামী বিদেশে প্রাণত্যাগ করলে, স্বামীর কাপড়-চোপড় চিতায় দিয়ে ঐ সঙ্গেই স্ত্রীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে পোড়ানো হতো। কেউ পারে নাই এ প্রথা রোধ করতে। সম্রাট আকবর যার প্রতাপে সমগ্র ভারত কাঁপত, হিন্দু সম্প্রদায় যাকে ভয় ও ভক্তিতে দিল্লীশ্বর উপাধি দিয়েছিল; তিনিও এ কুপ্রথা ভারত থেকে তুলে দিতে পারেন নি। সর্বশেষ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে সতীদাহ প্রথাকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে আইন প্রণয়ন করেন এবং হিন্দু বিধবা নারীদের রক্ষা করেন। কোনো নিষ্ঠুর ধর্মযাজক যে এমন কু-প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন যার ফলে লক্ষ লক্ষ নারী আত্মাহুতি দিয়েছে, এদের করুণ আবেদনকে ঘৃণাভরে অবজ্ঞা করে দগ্ধিভূত করেছে। ধর্মের কুসংস্কার শুধু সমাজেই নয়, সমাজের মহান ব্যক্তিদেরও অন্ধ করে ফেলে। সমাজকে এরূপ নৃশংসতা, বর্বরতা ও মহাপাপের হাত থেকে উদ্ধার করেছে একমাত্র ইসলাম।[১]

ইসলামের নবী তথা সমগ্র মানুষের নবী হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)এ জন্যেই অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করেন নি। মুনাফেকের সকরুণ নিবেদনকে ও সহানুভূতির সঙ্গে শ্রবণ করেন নি। সত্যের জন্য তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তরবারী ধরতে হয়েছে। তাই মুসলমানগণ আজ মুক্ত। মুসলীম রমণীগণ আজ স্বাধীন। এভাবেই ইসলাম নারীদেরকে তাদের মানসিক অধিকার প্রদান করে তাদেরকে সঠিক মর্যাদা প্রদান করেছে।

[১] অধ্যাপক নাজির আহমেদ ও ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, পূর্বোক্ত, পৃ.২০১

Dhaka University Institutional Repository

নারীর শিক্ষার অধিকার

ইসলামের আকীদা, বিশ্বাস এবং সংস্কৃতিতে শিক্ষা ও জ্ঞানের চর্চার গুরুত্ব অত্যাধিক। কুরআন মজীদের প্রথম আয়াত হলো শিক্ষা সম্বন্ধে। সামাজিক জীবনে নারীর আর একটি অধিকারের প্রশ্ন আছে-সেটা হলো শিক্ষা। নারীদের শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। নারীরা যদি শিক্ষিতা না হয়, তাহলে তাদের ঔরস থেকে শিক্ষিত, ভদ্র, উদার, সৎ ও মহৎ সন্তান আশা করা যায় না। যৌন বিজ্ঞান না শিখলে সে নারী স্বামীকে খুশি করতে পারে না। অপবিত্রতার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। ছেলেমেয়েকে সুশিক্ষা দিতে পারবে না। দাম্পত্য জীবনে শান্তিও নিয়ে আসতে পারবে না। গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষা না করলে সংসারে উন্নতি করতে পারবে না; সংসারকে মধুময় করে তুলতে পারবে না। ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞান শিক্ষারও যে প্রয়োজন নেই তা নয়। জ্ঞান পুরুষকে যেমন উন্নত ও মহৎ করে, নারীকেও তেমনি আলোকিত ও সুন্দর করে। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, প্রেম-প্রীতি শিক্ষারই অবদান। শিক্ষা বিহীন নারী কি ভাবে পূণ্যের বিকাশ করে? কিভাবে আল্লাহ, রাসূল ও সৃষ্টজীবের সঙ্গে পরিচিত হয় ও ঘনিষ্ট প্রেম গড়ে তোলে? তাই পুরুষের ন্যায় নারীরও শিক্ষার প্রয়োজন প্রয়োজন।

যে যুগে আরবদের গতিবিধি আরব উপত্যকায় সীমাবদ্ধ ছিল, তখনও হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) আরবদেরকে জ্ঞানার্জনের জন্য সুদূর চীনদেশে যেতে বলেছেন।

শিক্ষা পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট নয়। জ্ঞান চর্চা করা নারী-পুরুষ সকলের জন্য প্রয়োজন।

নবী (সাঃ) বলেছেনঃ "প্রত্যেক মুসলমানের (নর-নারীর) উপর জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরয।"[১]

উক্ত হাদীস হতে প্রতীয়মান হয় যে, নারীকেও পুরুষের পাশাপাশি শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তবে একটা প্রশ্ন তবুও থেকে যায় যে, কোনো ধরনের শিক্ষা নারীর জন্য অতীব প্রয়োজন? আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষা, না ধর্মীয় শিক্ষা, না গার্হস্থ্য জীবনের শিক্ষা? এর জবাব হলো সুশিক্ষা, তা যে কোনো দেশের বা যে কোনো জাতিরই হোক না কেন? শিক্ষার জন্য সুদূর চীনদেশে যাবার নির্দেশ হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) দিয়েছেন এবং একথাও বলেছেনঃ "তুমি জ্ঞান বিজ্ঞানকে গ্রহণ কর এবং যেখান হতেই তুমি তাকে গ্রহণ করো না কেনো তাতে তোমার কোনো ক্ষতি নাই।"[২]

---

[১] ইমাম ইবনে মাজাহ, সুনান, পূর্বোক্ত, পৃ.৮১

[2] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, পূর্বোক্ত, পৃ.৩২১

Dhaka University Institutional Repository

কাজেই ইসলামী মূল্যবোধ ও আদর্শ বিরোধী না হলে ইউরোপীয় বা অন্য যে কোনো দেশের শিক্ষাগ্রহণ করা চলবে না একথা বলা সঙ্গত হবে না। রেল, বাস, ট্রাক, উড়োজাহাজ, ঘড়ি, সাইকেল, সাবান, বাসন, তেল, বিদ্যুৎ, ইঞ্জিন, পাখা, রেডিও, বাল্ব, প্রেস, মেশিন, কলম সবই যখন ব্যবহার করা চলে তখন সে সব তৈরীর বিদ্যা অর্জন করা চলে না এমন গোঁড়ামির কথা হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) ও বলেন নি। আমরাও বলতে চাইনা। এ প্রসঙ্গ আবূ সাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ "তোমরা নিশ্চয়ই অনুসরণ করবে পূর্ববর্তীদের বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে, যদিও তারা যেয়ে থাকে কোনো গুইসাপের গর্তে, তোমরাও যাবে তাতে। আমরা বললাম, হে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পূর্ববর্তীরা ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ কী? হযরত রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, নয়তো কে?"[1]

জ্ঞান সীমাবদ্ধ নয়, অসীম। তাই একে আহরণ করতে হলে মহামনীষী ও বিজ্ঞানীদের পুস্তক, সংস্কৃতি ও সভ্যতা গ্রহণ করা দোষণীয় নয়। যে জ্ঞান মহান সৃষ্টিকর্তার সন্ধান দেয়, যে জ্ঞান সমাজ, দেশ ও জাতির বৃহত্তম কল্যাণে আসে, যে জ্ঞান হৃদয় আলোকিত হয়, সেই জ্ঞানই অর্জন করা নারী-পুরুষের জন্য ফরয।

পবিত্র কুরআন-হাদীসে ইলমের বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। কুরআন মজীদে আল্লাহপাক বলেন, আল্লাহ তা'আলার বান্দাগণের মধ্যে কেবল আলিমগণই তাঁহাকে ভয় করে থাকে।[2]

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ "যাহাদের ইলম আছে, আর যাহাদের ইলম নাই তারা কি সমান?"[3]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ প্রমাণ করে ইসলামে নারীকে শিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট তাগিদ দেওয়া হয়েছে। একজন শিক্ষিতা নারীর মতামত যে একজন শিক্ষিতা পুরুষের মতই ইসলামে গুরুত্বপূর্ণ তা নিচের বর্ণনা থেকে বুঝা যায়।

মোহরানার পরিমাণ বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করে হযরত উমর (রাঃ) এক সময় মসজিদে ঘোষণা করেছিলেন যে, মোহরানার পরিমাণ হ্রাস করতে হবে।

নামাজের পর এক মহিলা তার নিকট এসে তাঁকে বললেন, হযরত উমর (রাঃ) যা বলেছেন ঠিক নয়। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তিনি উল্লেখ করলেন যে আল্লাহ তাআলা মোহরানার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে

---

[1] ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমা'ঈল, *সহীহুল বুখারী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪

[2] আল-কুরআন, সূরা ফাতির, আয়াতঃ ২৮

[3] আল-কুরআন, সূরা যুমার, আয়াতঃ ৯

Dhaka University Institutional Repository

দেননি। তিনি কুরআন মজীদের আয়াত পাঠ করে শোনালেন, "তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির করো এবং তাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়ে থাক, তবুও উহা থেকে কিছুই ফেরৎ গ্রহণ করো না। তোমরা কি তাদের বিরুদ্ধে কোনো অপবাদ দিয়ে এবং পাপাচারণ করে তার কিছু ফেরত গ্রহণ করবে?"[১]

হযরত উমর (রাঃ) নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং বললেন যে, তাঁরই ভুল হয়েছে এবং মহিলা যা বলেছে তা-ই সঠিক।[2]

মোটকথা ইসলামে নারী শিক্ষাকে মর্যাদার সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। শিক্ষিত নারীর মতামতকেও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হত। আদর্শ ইসলামী পরিবারের নারীর দায়িত্ব বহুবিধ। পরিবারের দায়িত্ব ও কর্তব্য ছাড়াও ইসলামের প্রচার এবং বাস্তবায়নের বিরাট দায়িত্বভার যে প্রতিটি নর-নারীর উপর অর্পিত রয়েছে, ইহা বলাই বাহুল্য। এমতাবস্থায় ইসলামী জ্ঞান অর্জন যে নারীর জন্য কতটুকু প্রয়োজন, তা সহজেই অনুমেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "আল্লাহ তাআলার যিকির (স্মরণ) ও ইহার নিকটস্থ বস্তুসমূহে এবং আলিম (ধর্ম জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তি) ও ধর্মীয় জ্ঞানঅন্বেষণকারী ব্যতীত গোটাদুনিয়া ও দুনিয়াতে যতকিছু আছে, সকলই অভিশপ্ত (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার নি'আমত হতে বঞ্চিত)।"[৩]

ইসলামী জ্ঞান মুসলমানের জীবনের চালিকাশক্তি। যে পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর চরিত্র এবং জ্ঞান যত উন্নত, সে পরিবারের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ ততটা সুন্দর ও মনোরম হবে। সুতরাং পরিবারের পার্থিব ও অপার্থিব সার্বিক মঙ্গলের নিমিত্তে নারীর ইসলামী শিক্ষা অর্জন করা এবং তদানুযায়ী পরিবারকে পরিচালনা করা নিতান্ত আবশ্যক।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর সময়ে জ্ঞান-চর্চার যে সব মজলিস অনুষ্ঠিত হত, মহিলারা সেসবের অদূরে পর্দার অন্তরালে উপস্থিত থেকে তা থেকে যথেষ্ট উপকার লাভ করতেন। তাঁরা হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ভাষণ শোনার জন্য স্বতন্ত্রভাবে একত্রিত হতেন। ইসলাম সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনই ছিলো এসব শিক্ষা সমাবেশে তাঁদের উপস্থিতির মূখ্য উদ্দেশ্য। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেও মহিলাদের দ্বীন-ইসলাম শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ চিন্তা বিবেচনা করতেন ও সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

---

[1] আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াতঃ ২০

[2] Al-Qurtubi Al-Zami, vol-5, p.99 and Shaltaur Al-Qur'an Wal-Mar'ah, p.386.

[3] ইমাম তিরমিযি, সুনান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৮

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ করতেন। কোনো সময় যদি তিনি মনে করতেন যে, মহিলারা তাঁর কোনো কথা ঠিকমত শুনতে পারেনি, তাহলে তাদের নিকটে উপস্থিত হয়ে সে কথার পুনরাবৃত্তি করতেন।[1]

কুরআন মজীদে অন্তত ৭৫০ জায়গায় ইসলামের অনুসারী ব্যক্তিদের, কুরআন মজীদের বিধান অনুসরণকারীদের পড়াশোনা করতে, জ্ঞানার্জন করতে, গভীরভাবে অনুধাবন করতে এবং নানান বিষয়ের ওপর চিন্তা-ভাবনা করতে বলা হয়েছে। কিন্তু কোথাও বলা হয়নি জ্ঞানার্জন করার যোগ্য শুধুমাত্র পুরুষরাই। এসব নির্দেশ নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং কুরআন মজীদের আয়াতের মর্মার্থানুযায়ী, নারী-পুরুষ উভয়েই জ্ঞানার্জনের অধিকারী। আর সেকথা হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)ও জানিয়েছেন অত্যন্ত দ্বিধাহীনভাবেঃ "জ্ঞান ইমানদারের হারানো মানিক। যেখানেই পাবে তুলে নেবে।[2]

এভাবেই ইসলাম নারীকে ইসলামী আইনের বিধান তথা দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের সুযোগ দিয়ে শিক্ষার ব্যাপারে নারীকে বঞ্চিত করেনি তার অধিকার থেকে।

ইসলামে নারীর সামাজিক অধিকার ও মর্যাদা

সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামে নারীর মর্যাদা কেমন, তা অনুমান করা যায় এভাবে সমাজ জীবনে বিপরীত লিঙ্গ পুরুষকে গুরুত্ব সহকারে নারী সম্পর্কে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সমাজ জীবনে তাদের সাথে "সদ্ভাবে" চলতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরুষদের উপর দায়িত্ব চেপে দেওয়া হয়েছে, সমাজ জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। পবিত্র কালামে ইরশাদ হচ্ছে, "নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যার মধ্যে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।"[3]

মো'আশারাত শব্দের অর্থ-মিলেমিশে জীবন যাপন করা, সে অর্থে উক্ত আয়াতে একদিকে আল্লাহ তায়ালা পুরুষদেরকে নারীদের সাথে মিলেমিশে চলার জন্য পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যদিকে সদ্ভাবে চলার শর্তারোপ করেছেন। উক্ত আয়াতে ম'রূপ'-এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূবকর জাস্‌সাস রাযী

---

[1] আহমদ কুস্তালাবী, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৫৪

[2] প্রাগুক্ত

[3] আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াতঃ ১৯

হানাফী (রঃ) নাফকাহ্ তথা পারিবারিক ব্যয়, মোহর, ন্যায়পরায়ণতার উল্লেখ করেছেন- কর্কশ ভাষা, স্ত্রী থেকে বিমুখতা এবং অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে কষ্ট দিবে না। অকারণে তার সামনে রুষ্টতা প্রদর্শন, বদ মেজাযসহ এরূপ অন্যান্য কর্মসমূহ থেকে বিরত থাকবে।[1]

উক্ত ব্যাখ্যার আলোকে মিলেমিশে সদ্ভাবে জীবন যাপন করার অর্থ হল, কোমলমতি নারীর সাথে কোমলতার সাথে আলাপ করতে হবে। মহব্বত ও ভালবাসার সাথে চলাফেরা করতে হবে। আলাপ চারিতায় যেন মিষ্টতা প্রদর্শিত হয়, শাসন ও কঠোরতা যেন না হয়।

এমনি ভাবে প্রত্যেক কাজে যা জীবন সঙ্গীনীর অংশের জিনিস হয়, যেন তাতে অন্যের প্রতি সাধারণ আকর্ষণও না থাকে। কারণ এতে সে এমন ভেঙ্গে পড়ে যে, পৃথিবীর সকল আনন্দ তার জন্য কষ্টে রূপান্তরিত হয়।

আল-কুরআন সমাজ জীবন সম্পর্কে শুধু এ বলেই শেষ করেনি যে, "নারীদের সাথে সমাজ জীবনে সদ্ব্যবহার করা পুরুষদের জন্য আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব।" বরং তাদের সাথে ক্ষতির যত পথ রয়েছে সবগুলোকে বন্ধ করার জন্য তালাক প্রাপ্তা নারীর ব্যাপারে পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা দিয়েছে- আর তোমরা তাদেরকে জ্বালাতন ও বাড়াবড়ির উদ্দেশ্যে আটকে রেখো না।[2]

উদ্দেশ্য এই যে, বিবাহরে সম্পর্ক যেমন পূর্বে জ্ঞাত হয়ে গেছে রহমত ও মায়ামমতার সম্পর্ক। আত্মার প্রশান্তির সম্পর্ক। হৃদয়ের টানের সম্পর্ক। এ সম্পর্কের সাথে ক্ষতির কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং এই সম্পর্কের জোড়া যখনই ভেঙ্গে যাবে তাতে যেন ক্ষতির আশংকা না থাকে। ইসলামী শরীয়াতের দৃষ্টিতে পুরুষ কর্তৃক স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়া, তার সাথে সামাজিক জীবনে সীমাতিক্রম ও জুলুম করা, তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং বেখেয়াল ও বেপরোয়াভাব প্রদর্শন করা নাজায়েয ও নিষিদ্ধ।

সমাজ জীবনে সৃষ্টিগতভাবে এমন কিছু মানুষের সাথে সম্পর্কে গড়ে উঠে, যাদের সাথে দাম্পত্য জীবনের পূর্বে তার সাথে বিভিন্নভাবে সম্পর্ক হয়েছিল। যার কারণে তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে বাধ্য। মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদী, চাচা-চাচী, ফুফা-ফুফু, নানা-নানী ইত্যাদি সম্পর্ক একটি

---

[1] আবূ বকর জাস্সাস, *আহ্কামুল কুরআন*, ২য় খন্ড, কায়রো ১৩৯৮ হিজরি, পৃষ্ঠা-১০১

[2] আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াতঃ ২৩১

Dhaka University Institutional Repository

বংশের বেষ্টনীর মধ্যে থাকে। বিয়ের পর নারী যেন উক্ত আপন আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে ইসলাম সেদিকেও নজর রেখেছে।

বাহ্‌রুর রায়েক গ্রন্থে রয়েছে- "বিশুদ্ধ ফাতাওয়া হচ্ছে, স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ক্রমে অথবা অনুমতি ছাড়া প্রত্যেকে জুমু'আর দিন আপন মা-বাবার সাথে সাক্ষাত করতে পারবে। এমনি ভাবে বছরে একবার আত্মীয়-স্বজনের সাথে মিলিত হতে পারবে।"[১]

শরহে বেকায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে, "প্রত্যেক জুমু'আয় স্ত্রীকে তার মা-বাবার সাথে এবং মা-বাবাকে তার সাথে সাক্ষাত করার ব্যাপারে স্বামী প্রতিবন্ধক হতে পারবে না। এ ছাড়া মাহরাম আত্মীয়-স্বজনের সাথেও বছরে একবার সাক্ষাত করার পথে স্বামী বাধা দিতে পারবে না।"[২]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহ দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী আইন যেভাবে নারীকে অধিকার দিয়েছে-আপন মাতা-পিতা ও মাহরাম আত্মীয় স্বজনের সাথে জন্মগত চাহিদা পূরণে সাক্ষাত করার জন্য এবং তার সামাজিক অধিকার বাস্তবায়নে স্বামীকে বাধা না দিতে। তদ্রূপ তার মাতা-পিতা ও মাহরাম আত্মীয়-স্বজনকেও অধিকার প্রদান করেছে-তাদের প্রিয় তনয়া, আদরের দুলালীকে দেখার জন্যে তার স্বামীর গৃহে যেতে। তাদের উক্ত সামাজিক অধিকার আদায়ে স্বামী কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। এমনকি মাতা-পিতা কাফির হলেও না।

উক্ত অধিকারের ভিত্তিতে যখন আবূ সুফিয়ান কাফির থাকাকালীন সময়ে কোনো এক কাজে মদীনায় এসেছে। তখন নবী রমণী উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবীবা (রাঃ) এর নিকট সাক্ষাৎ করতে এসেছিল। কেননা, আবূ সুফিয়ান হলো উম্মে হাবীবা (রাঃ) এর পিতা।

ইসলামের প্রতিটি শাখায় যেহেতু নেকী ও তাক্‌ওয়ার উপর ভিত্তি, সেহেতু সামাজিক অধিকারের স্বাধীনতার পাশাপাশি এদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, স্বাধীনতা যেন বন্ধনহীন রূপ ধারণ না করে এবং তা দ্বারা সমাজ জীবনে যেন ফ্যাসাদ সৃষ্টি না হয়।

ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে আছে, "সেখানেই নারীদের জন্য ঘরের বাইরে যাওয়ার আমরা বৈধতা সাব্যস্ত করেছি, উক্ত বৈধতার জন্য শর্ত হলো, তারা সাজ-সজ্জা করতে পারবে না এবং এমন আকৃতি অবলম্বন করতে পারবে না, যা পুরুষের দৃষ্টি ও হৃদয়ের মনোযোগের জন্য আহ্বানকারী হয়।"[১]

---

[1] আমিন আস্ শাহির, *ফাতাওয়া শামী*, ২য় খন্ড, কায়রো ১৪০১ হিজরি, পৃষ্ঠা-১০৫৩

[2] প্রাগুক্ত, পৃ.১০৫৫

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সামাজিক অধিকার বঞ্চিত নারীকে ইসলাম ধর্মই তার যথাযথ সামাজিক অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করে তাদের সামাজিক অবস্থানের উন্নয়ন ঘটেছে।[1]

জীবন ব্যবস্থা ও আইনের অভিন্নতা

প্রাচীন কালের ধর্মসমূহ নারী ও পুরুষকে অভিন্ন মর্যাদা দিতে প্রস্তুত ছিলো না। তাতে উভয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আইন রচিত হয়েছে। প্রত্যেক লিঙ্গের লোকদের জন্য দেওয়া হয়েছে আলাদা-আলাদা জীবন ব্যবস্থা। কিন্তু ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যে সমান ভাবে অনুসরণীয় জীবন বিধান বিধিবদ্ধ করেছে।

মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন স্ত্রীলোক যে-ই হোক আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ দিয়ে থাকলে সেই ব্যাপারে এদের কারুরই কোনো এখতিয়ার থাকে না। যে লোকই আল্লাহ তাআলার ও তার হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর নাফরমানী করবে, সে-ই সুস্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত হবে।[2]

কুরআন মজীদে আরও ঘোষিত হয়েছেঃ যে লোক পুরুষ কিংবা নারী কোনো সৎকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট হবে না।[3]

এক কথায় বলা যায়, নারী ও পুরুষের জন্যে একই জীবন বিধান বিধিবদ্ধ হয়েছে। কারোর জন্যে স্বতন্ত্র বা ভিন্নতর কোনো ব্যবস্থা দেওয়া হয়নি ইসলামে। মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ও করা হয়নি, যদিও মান-মর্যাদার দিক দিয়ে সাধারণভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে বা স্তরে ভাগ করা হয়েছে মানুষকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নারী পুরুষ উভয়ে একই আদর্শের অনুসারী একই পথের পথিক। এই জিহাদের মুজাহিদ যদিও প্রকৃতি ও স্বরূপের দিক দিয়ে নারী পুরুষের কর্মক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন হয়।

কিন্তু ক্ষেত্র ও কর্মের পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ের কাজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সর্বোতভাবে এক ও অভিন্ন। ব্যক্তিগত ও খুঁটিনাটি ব্যাপার ছাড়া সামগ্রিক বিষয়াদির যে কয়েকটি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে

---

[1] আমিন আস্ শাহির, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১০৯৫

[2] আল-কুরআন, সূরা আহযাব, আয়াত: ৩৬

[3] আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত: ১২৪

Dhaka University Institutional Repository

পার্থক্য রয়েছে, তার সংখ্যা মাত্র ৬-৭টি। তবে প্রায় সর্ব বিষয়েই ইসলাম বিশেষ করে জীবন ব্যবস্থা ও আইনের দিক থেকে নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে প্রায় এক ও অভিন্ন।[১]

কর্মক্ষেত্রে নারী

নারী সমাজে কর্মতৎপরতা কেবলমাত্র বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞান অর্জনেও চিন্তা গবেষণার ক্ষেত্র পর্যন্ত ই সীমাবদ্ধ থাকবে, ইসলাম এমন কথা বলেনি। বাস্তব কাজে যথার্থ ভূমিকা পালনের জন্যেও ইসলাম এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র তাদের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী যেমন জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা লাভে অগ্রসর হতে পারে, তেমনি কৃষ্টি–কালচার ও ব্যবসায়ের কাজে অংশগ্রহণ করায়ও তারা সম্পূর্ণ অধিকারী। জীবিকার জন্যে বিভিন্নকাজ করার, শিল্প কারখানা স্থাপন, পরিচালনা বা তাতে কাজ করারও অধিকার রয়েছে নারীদের। সেই সঙ্গে সমাজ ও জাতির বহুবিধ সামষ্টিক কাজ আঞ্জাম দেওয়া ও তাদের জন্যে কিছুমাত্র নিষিদ্ধ নয়। বস্তুত অনুমতি এক কথা আর বাস্তবে তা চর্চা করা একান্তই জরুরী হওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। নারী এসব কাজে ঝাপিয়ে পড়ুক, ইসলামে তা কাম্য নয়। নারীদের মধ্যেও এ ধরনের কাজে অংশগ্রহণের আগ্রহ-উৎসাহ থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে কাউকে নিরুৎসাহিত করা ইসলামের রীতি নয়। সে উৎসাহ উদ্দীপনা নির্মূল করতে চেষ্টাও করেনি ইসলাম।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) একবার জিহাদে গমনকারী লোকদেরকে সামুদ্রিক সফর করার বিরাট বিরাট সওয়াব ও মর্যাদার কথা বললে উম্মে হারাম নাম্মী এক মহিলা সাহাবী বললেনঃ 'হে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করুন, আমি যেন এই জিহাদী সফরে শরীক হতে পারি। রাসূলে করীম তা-ই করলেন। অথচ এটা জানা কথা যে, জিহাদে গমন নারীদের জন্যে ফরয করা হয়নি ইসলামে। এ থেকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মেজাজ প্রকৃতি স্পষ্টত ফুটে উঠে। সামাজিক সামষ্টিক কাজ থেকে নারীরা বিচ্ছিন্ন থাকুক তা ইসলামে আদৌ কাম্য নয়।

নারীদের জন্য স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রের মধ্যেই তাদেরকে চিরজীবন সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে, তার বাইরে তারা উঁকি মেরেও তাকাবে না, ইসলামে তা-ও কোনো পছন্দনীয় ব্যাপার নয়। তাই বলে, বাইরের কাজে কর্মে অংশগ্রহণ করা নারীদের নিষেধ করা না হলেও বরং তার অনুমতি দেওয়া

[1] আবদুল ওয়াহাব যুহরী, *ইসলাম কা নেযামে হায়াত*, লাহোর, ১৯৫৯, পৃ.২৮৭

Dhaka University Institutional Repository

সত্ত্বেও সাধারণ ভাবে তাদের জন্য তা পছন্দ করা হয়নি। তবে তার অর্থ এ-ও নয় যে, নারীরা ঘরের বাইরে কখনই যাবে না এবং বাইরের দরকারী কাজও তারা করবে না।

একজন মহিলা তালাকপ্রাপ্তা হয়ে ইদ্দত পালন কালে ঘরের বাইরে গিয়ে নিজের বাগানের খেজুর গাছের ডালা বিক্রী করার অনুমতি চাইলে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) জবাবে বললেনঃ ক্ষেতে যাও, অতঃপর নিজের খেজুরগাছ কাটো (আর বিক্রী করো)। এই টাকা দ্বারা সম্ভবত তুমি দান-খয়রাত অথবা অন্য কোনো ভাল কাজ করতে পারবে। (আর এভাবে তা তোমার পরকালীন কল্যাণ লাভের ও নিমিত্ত হবে।)[১]

একথা বলে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত জাবির (রা) এর খালাম্মাকে মানবতার কল্যাণমূলক কাজ করার জন্যে উৎসাহ দিলেন। উক্ত হাদীস থেকে এও জানা যায় সৎ ও কল্যাণমূলক কাজের উদ্দেশ্যে নারীরা ঘরের বাইরে যেতে পারে। প্রাথমিক কালের মুসলিম মহিলারা প্রয়োজনের তাগিদে ঘরের বাইরে, হাটে-বাজারে ও ক্ষেতে-খামারেও চলে যেতেন। এই ব্যাপারে বিশেষ ধরনের কোনো নিষেধ ছিলো না।

পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পর হযরত উমর (রাঃ) হযরত সওদা (রাঃ) কে ঘরের বাইরে দেখতে পেয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। হযরত সওদা (রাঃ) এই ব্যাপারটি হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট প্রকাশ করেন। কিছুক্ষণ পরই হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রতি ওহী নাজিল হয়। তখন তিনি হযরত সওদা (রাঃ) কে ডেকে বললেনঃ হ্যাঁ, প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি তোমাদের জন্যে রয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।"[২]

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর সময়কার মুসলিম মহিলাদের কর্মতৎপরতা দেখে একথা বলিষ্ঠ ভাবেই বলা যেতে পারে যে, মুসলিম মহিলারা কাজের প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে পারেন। ইসলামী সমাজে এ ব্যাপারে কোনো প্রতিবন্ধকতার অবকাশ নেই। প্রাথমিক যুগের ইসলামী সমাজে মহিলারা চাষাবাদের কাজও করতেন, গৃহপালিত জন্তুপালনের কাজও করতেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর কন্যা হযরত আস্‌মা (রাঃ) ছিলেন হযরত জুবাইর (রাঃ) এর স্ত্রী। তিনি নিজেই তাঁর

---

[1] ইমাম আবূ দাউদ, সুনান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১৭

[2] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদে আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ.২০০

Dhaka University Institutional Repository

ঘোড়াকে খাবার দিতেন, পানি পান করাতেন। এ ছাড়া ঘরের যাবতীয় কাজ ও তাঁকেই করতে হত। তিনি নিজে বাড়ি থেকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত জমি থেকে খেজুরের বীজ তুলে আনতেন।

কীলাহ্ নাম্নী এক মহিলা হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেনঃ

আমি একজন স্ত্রীলোক। আমি ক্রয়-বিক্রয় অর্থাৎ ব্যবসা করি। পরে সে মহিলা হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট ব্যবসায় সংক্রান্ত কয়েকটি মাসআলাও জিজ্ঞেস করেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বেগম নিজে ঘরে বসে শিল্পকর্ম করতেন এবং তা বিক্রী করে ঘর সংসারের খরচাদি চালাতেন। একদিন তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেনঃ "আমি একজন কারিগর মেয়েলোক। আমি তৈরী করা দ্রব্য বিক্রী করি। এছাড়া আমার স্বামী এবং আমার সন্তানদের জীবিকার অন্য কোনো উপায় নেই।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ "এভাবে উপার্জন করে তুমি তোমার ঘর-সংসারের প্রয়োজন পূরণ করছ। এতে তুমি বিরাট সওয়াবের অধিকারীনী হবে।"[১]

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উপার্জনের জন্য কাজ করা ও সে জন্যে ঘরের বাইরে যাওয়া নারীদের জন্য নিষিদ্ধ নয়। তবে তা যে সীমার মধ্যে থেকে করতে হবে, একথা খুলে বলার প্রয়োজন পড়ে না।

মহিলাদের স্বতন্ত্র সংগঠন করার অধিকার

শিশু সন্তানের লালন-পালনের ব্যাপারে নারীদের যোগ্যতা যখন পুরুষের তুলনায় বেশী এবং এ কারণে পুরুষদের উপর তাদের অগ্রাধিকারও দেওয়া হয়েছে। তখন সমাজের সে-সব ক্ষেত্রে তাদের সেবামূলক কর্মক্ষমতা অধিক অবদান রাখতে সক্ষম এবং সে-সব ক্ষেত্রে এই নারীসুলভ ও সেবা শুশ্রুষামূলক কার্যাবলী অপরিহার্য বিবেচিত হবে, সেই সবক্ষেত্রে তাদেরকেই অগ্রসর করা হবে, এ-ই তো স্বাভাবিক। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, এ উদ্দেশ্যে তাদের ব্যক্তিগত চেষ্টা সাধনার পাশাপাশি সামষ্টিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানোর অনুমতি তাদের জন্যে থাকতে হবে। ইসলামী শরীয়াত এ ব্যাপারে কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না। এ কারণে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের

---

[1] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদে আহমদ*, পূর্বোক্ত, পৃ.২৩৩

Dhaka University Institutional Repository

আসলে মহিলাদের কোনো স্বতন্ত্র সংগঠন ছিলো কিনা, এ প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর। কেননা সামাজিক সংগঠন সংস্থা গড়বার কারণ থাকলেই তা গড়ে ওঠে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, বিভিন্ন দ্বীনী ও সামাজিক প্রয়োজনে স্ত্রীলোকেরা সমবেত হয়েছেন। অনেক সময় তারা মিলিত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন এবং নিজেদের ধ্যান-ধারণা ও বাস্তব সমস্যাগুলো হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর সমীপে পেশ করেছেন। তিনিও সেসব বিষয়ের সমাধান তাদের বলে দিয়েছেন।

এসব ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে যে, বহুসংখ্যক মহিলা একত্রিত হয়ে সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর সমীপে উপস্থিত হলেও তাঁরা সকলেই এক সঙ্গে কথা বলেন নি, নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে নেত্রী পদে বাছাই করে তার মাধ্যমে কথা বলেছেন। সেই মহিলা নেত্রী যা কিছু বলেছেন, তাতে তিনি নিশ্চই সকলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, যেমন বর্তমানে কোনো সংগঠন-সংস্থার নেতা সাধারণত করে থাকেন।

একদা হযরত জায়েদ (রাঃ) এর কন্যা হযরত আসমা (রাঃ) নেত্রী হিসেবে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেনঃ আমার পশ্চাতে মুসলিম মহিলাদের যে দল রয়েছে আমি তাদেরই প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত হয়েছি, তাঁদের সকলেই আমার সাথে কথা বলেছেন এবং আমি যে মত, পোষণ করি, তাঁরাও সেই মতই পোষণ করছেন।

দ্বীন-ইসলামের নীতি ও আদর্শের দৃষ্টিতে বিবেচনা করা হলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে যে, মহিলাদের স্বতন্ত্র সংগঠন সংস্থা গড়ে তোলার অধিকার রয়েছে। নারীরা পুরুষের থেকে আলাদাভাবে জামা'আতের সাথে নামায পড়তে পারে।

তাইমা বিন্‌তে সালমা বলেছেনঃ হযরত আয়শা (রাঃ) মাগরিবের ফরয নামাযের ইমামতি করেছেন। তিনি মহিলাদের সঙ্গে কাতারে দাঁড়িয়েছেন এবং উচ্চস্বরে কেরাআত পাঠ করেছেন।[১]

অন্য এক হাদীস গ্রন্থে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছেঃ

হযরত আয়েশা (রাঃ) নামাযের আযান দিতেন, ইকামত বলতেন, মহিলাদের ইমামতি করতেন এবং তাদের মাঝখানে দাঁড়াতেন।[২]

---

[1] ইমাম মুনযিরী, *বিররুল ওয়ালিদাইন*, বৈরুত ১৪২৩ *হিজরি*, পৃ.২৯৫

[2] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, পূর্বোক্ত, পৃ.৮৮

Dhaka University Institutional Repository

জামা'আতের সাথে নামায মুসলিম উম্মতের সংগঠন-সংস্থার একটা ক্ষুদ্র নমুনা। এ কারণে নামাযের ইমামতিকে 'ক্ষুদ্র পরিসর নেতৃত্ব' বলা হয়। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, মহিলাদের ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত ও শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে তাদের নিজস্ব সংগঠন ও সংস্থাকে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সামষ্টিক পর্যায়ের কার্যাবলী সমাধান করার পূর্ণ স্বাধীনতা ও সুযোগ ইসলামে দেওয়া হয়েছে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী

পুরুষের মতোই ইসলামে নারীর রাজনৈতিক অধিকার ও মর্যাদা রয়েছে। বাক স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, ভোটাধিকার, পরামর্শ দেয়া, প্রতিবাদ জানানো, কোনো কাজ সম্পাদনের জন্য সংগঠিত হওয়া ইত্যাদি সকল ধরনের কাজ করার অধিকার ইসলাম নারীকে দিয়ে থাকে। ইসলামের মূলনীতি হলো, মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞানে, কর্মে, দক্ষতায়, নীতি, দর্শন ও শৃঙ্খলায় যিনি সর্বোত্তম হবেন তিনিই হবেন নেতা। আর আল্লাহ তা'আলা সর্বোত্তম ব্যক্তি নির্ধারণের যোগ্যতা বা গুণ হিসেবে নারী বা পুরুষ হওয়ার কথা বলেন নি। বরং জ্ঞানে ও কর্মে শ্রেষ্ঠ হওয়ার কথাই বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'মুমিনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়, মজলিস প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান করে দিয়ো, আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দেবেন। আর যখন বলা হয়, উঠে যাও, তোমরা উঠে যেয়ো। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।'[১]

আল-কুর'আনে ঘোষিত এমন অসংখ্য আয়াতে উল্লেখিত শ্রেণী ও কার্যাবলিতে নারীদের অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়টি অস্বীকার করা হয়নি। এমনিভাবে শূরা বা পারস্পারিক পরামর্শ ও উলিল আমর বা নেতৃত্বশীল ব্যক্তি সম্পর্কেও কুর'আনের আয়াতসমূহে সাধারণ ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। এখন কোনো ব্যক্তি যদি বলেন যে, এ সকল আয়াত পুরুষের জন্য নাযিল হয়েছে তাহলে তাকে এটাও বলতে হবে যে – সালাত, সাওম, যাকাত, হজ, ইহসান, আদল প্রভৃতি হুকুম আহকামও শুধু পুরুষের জন্য নাযিল হয়েছে। অথচ প্রকৃত বিষয় তা নয়। কেননা এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে,

[১] আল-কুরআন, সূরা মুজাদালা, আয়াত: ১১

Dhaka University Institutional Repository

সালাত-সাওমের সকল হুকুম সমানভাবে নর-নারীর জন্য নাযিল হয়েছে। তাই নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম করার কোনো যুক্তি নেই।

হাদীসেও এ ধারণার পক্ষে জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায়। আব্দুল্লাহ ইবন রাফি (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কোনো রাজনৈতিক ও সামাজিক কাজে লোকদের সমবেত হওয়ার জন্য 'ইয়া আইয়্যুহান্নাস' বা 'হে মানবমণ্ডলি' বলে সম্বোধন করতেন তখন উম্মু সালমা (রা) সে সকল সমাবেশে অংশ গ্রহণ করতেন। লোকেরা এ ব্যাপারে প্রশ্ন তুললে তিনি জবাবে বলতেন, আমিও মানবমণ্ডলির অন্তর্ভূক্ত। কেননা এখানে নারী-পুরুষে কোনো পার্থক্য করা হয়নি।[১]

আবি বাকরা বলেন, উটের যুদ্ধের সময় আল্লাহ আমাকে মহানবী (সা) এর একটি হাদীসের মাধ্যমে উপকৃত করেছেন। তা হলো, মহানবী (সা) যখন শুনতে পেলেন যে, পারসিকরা খো করজের কন্যাকে তাদের শাসক নির্বাচিত করেছে তখন তিনি বলেছিলেন, যে জাতি একজন নারীকে ক্ষমতায় বসায় সে জাতি কখনো উন্নতি করতে পারে না।[২] অথচ ঐতিহাসিকগণ একমত যে, আবি বাকরা (রা) উটের যুদ্ধে আয়শা (রা) এর নেতৃত্বাধীন বাহিনীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ঐতিহাসিকগণ এ কথাও বলেন, তিনি যুদ্ধের পরও আলী (রা)এর শাসন মেনে নিতে অস্বীকার করেন এবং আত্মগোপন করেন। আবি বাকরা বর্ণিত হাদীসটিকে সঠিক বলে ধরে নিলে তার অর্থ দাঁড়ায় একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী মহানবী (সা) এর বরাত দিয়ে বলেছেন যে, ইসলাম নারীর নেতৃত্ব প্রত্যাখ্যান করে এবং তা সত্ত্বেও তিনি একজন নারীর নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছেন এবং জীবনের শেষ দিনগুলো পর্যন্ত সে নারীর প্রতি তাঁর সমর্থন অব্যাহত রেখেছেন। কিন্তু এ সুস্পষ্ট বৈপরীত্বের ঘটনা আবি বাকরা (রা) এর মতো সাহাবীর পক্ষে ঘটা কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। অথচ আবি বাকরা বর্ণিত হাদীসটি যেমন সত্য তেমনি তিনি যে আয়শা (রা) এর নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছেন তাও সত্য। তাঁর বর্ণিত হাদীসটি সত্য এ কারণে যে, নারী যদি স্বৈরাচারী শাসনকাজ পরিচালনা করেন তবে অবশ্যই তার নেতৃত্ব প্রত্যাখ্যানযোগ্য। কারণ পারস্য রাজের কন্যা রানী বিলকিস ইসলাম গ্রহণের পূর্বে স্বৈরাচারী শাসন পরিচালনা করতেন বলেই তাঁর সম্পর্কে নবী (সা) উক্ত বক্তব্য পেশ করেছেন।

আশরাফ আলী থানবী (র) এ সম্পর্কে বলেছেন, হাদীসটি নারীকর্তৃক পরিচালিত স্বৈরাচারী শাসন সম্পর্কিত, পরামর্শভিত্তিক শাসনের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়। ইসলাম গ্রহণের পর বিলকিস তার সাবা

[১] মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি, *সহীহ মুসলিম*, পূর্বোক্ত, পৃ.২৩১

[২] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৯৮

Dhaka University Institutional Repository

এলাকার উপর শাসনভার পরিত্যাগ করেছেন এমন কোনো উক্তি কুর'আনে কোথাও পাওয়া যায় নি। রানী বিলকিস মুশরিকী জিন্দেগী পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণের পর তিনি পরামর্শের ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী খিলাফতের শাসন পরিচালনা করেন। বিলকিস তার শাসন পদ্ধতির বর্ণনা দিচ্ছেন এভাবে, 'রানী বিলকিস বললো, হে পরিষদবর্গ! আমার এ সমস্যায় তোমাদের অভিমত দাও। আমি তোমাদের উপস্থিতি ছাড়া কোনো ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করি না।'[১] এমন বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে বিলকিসের মতো ক্ষেত্রে যখন একজন নারী ইসলাম অনুমোদিত পরামর্শ সভা কিংবা আইন সভার সাহায্যে শাসনকাজ পরিচালনা করে তখন তেমন অবস্থায় নারী নেতৃত্ব অনুমোদন না করার কোনো শক্তিশালী যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

তবে বাস্তবতা হলো, নারীর শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেয়ার এ অধিকার বাস্তবায়ন করা কঠিন। কেননা বর্তমান প্রেক্ষাপটে একজন জনপ্রতিনিধিকে দিনের অধিকাংশ সময় বাড়ির বাইরে থাকতে হয়। জনপ্রতিনিধি নারী হলে তার পরিবার ও সন্তানের কল্যাণে তিনি ভূমিকা রাখতে পারবেন না। দলীয় বিরোধ ও বিতর্ক তার পারিবারিক সংহতি ও ঐক্যের পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়াবে। জনপ্রতিনিধিত্বের দায়িত্বটি এমন যে, তাতে অবকাশ বা ছুটি কাটানোর কোনো সুযোগ থাকে না। অথচ মানবিক দায়িত্ব পালনের জন্যই নারী মাতৃত্বের অভিজ্ঞতা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন না আবার মাতৃত্বকালীন সময়ে তার পক্ষে কোনোক্রমেই প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন সম্ভব হবে না। ফলে তাকে কোনো একটিতে ছাড় অবশ্যই দিতে হবে। এবং তা অবশ্যই প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব। পরিণামে গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত হবে বা স্বাভাবিক কাজের ধারা ব্যাহত হবে। চূড়ান্ত বিবেচনায় যা জাতীয় উন্নতির পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা হিসেবে চিহ্নিত হবে। মূলত এ জাতীয় বাস্তব সমস্যা থাকার কারণেই যোগ্যতা থাকার পরও বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে সেনাবাহিনীর সদস্য, বিচারপতি ও সরকারি কর্মচারীদের কার্যকালীন সময়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সাংবিধানিকভাবে নিষিদ্ধ রাখা হয়। এতে তাদের সম্মান যেমন কমে না তেমনি এর মাধ্যমে তাদের মনুষ্যত্বকে অসম্মান বা হেয়ও করা হয় না। তাই সুযোগ থাকার পরও প্রাসঙ্গিক দায়িত্বসমূহ পালনের ক্ষেত্রে অসুবিধা হওয়ার কারণে নারীদেরকে নেতৃত্বে বরণ না করাই ইসলামের স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি। আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো নারীর নবী হিসেবে আগমণ না করাও এ বিষয়টিই সমর্থন করে।

---

[১] আল-কুরআন, সূরা নামল, আয়াতঃ ৩২

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত ইসলাম নারী জাতিকে এতই মর্যাদা ও সম্মান দান করেছে যে, আল–কুর'আনে সুরা 'নিসা ও মারয়্যাম' নামে দু'খানা সুরার নামকরণ করা হয়েছে। কিন্তু আজকের নারী সমাজ ইসলাম প্রদত্ত মর্যাদা ভুলে গিয়ে নারীমুক্তি আন্দোলনের নামে নিজেদেরকে বাজারের পণ্যে পরিণত করেছে। সুতরাং জীবনের সকলক্ষেত্রে ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই প্রকৃত নারী মুক্তি তথা নারী মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তাই বলবো যে, "Islam was probably the greatest champion of women's rights the world has ever seen.[১]

উত্তরাধিকারে পার্থক্য এবং নারীর স্থান

ইসলামে নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া হয়নি। একথাটি বলার জন্য সমালোচকরা উত্তরাধিকারের বিষয়টি উল্লেখ করে। কন্যা উত্তরাধিকার সূত্রে পুত্রের অর্ধেক। সমালোচকরা এ যুক্তিটিই বেশির ভাগ উল্লেখ করে থাকে। এমন কি সাধারণতঃ সূরা-নিসার একটি আয়াতের অংশবিশেষ উল্লেখ করে থাকে। তা হলোঃ এক পুত্রের অংশ দু'কন্যার সমান।[2] আয়াতে এই অংশটির পুরা আয়াত এবং উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় অন্যান্য আয়াতের সংগে একত্রে দেখাই সংগত হবে। সবগুলো আয়াত একসঙ্গে দেখলে মতামতটি অধিকতর বস্তুনিষ্ঠ হবে এবং বোঝা যাবে যে, নারীর কোন ক্ষেত্রে বেশী এবং কোন ক্ষেত্রে কম পেয়ে থাকে।

প্রাক-ইসলামী যুগে নারীদের পৈত্রিক বা কোনো সম্পত্তি উত্তরাধিকারের বিধান ছিলো না। পক্ষান্তরে তাদেরকেই অন্যরা উত্তরাধিকার সূত্রে ভাগ বাটোয়ারা করে নিত। উদাহরণ স্বরূপ পুত্রেরাই বৈমাত্রিক মাতাদের স্বামীর উত্তরাধিকারী হতো।

বিত্তশালী আরবগণ বিভিন্ন শ্রেণীর এবং স্তরের সংরক্ষণ করতো। কোনো বিত্তবান বহু সংখ্যক স্ত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করলে সন্তানেরা বিমাতাদেরকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিত এবং যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতো। এ সমস্ত কুপ্রথার বিলোপ করে নারীকে সম্পত্তির অধিকার ইসলামই প্রথম দিয়েছে।

[১] Dr. H. Korimov Andrey, *Women Rights in Islam,* London, 2003, p.234

[2] আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াতঃ ১১

Dhaka University Institutional Repository

আল কোরআনে বলা হয়েছেঃ পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং নারীরও অংশ আছে তা অল্পই বা বেশীই হোক। তা এক নির্ধারিত অংশ।[১]

ইসামের আর্বিভাবের পূর্বে নারীর আত্মীয়-স্বজনদের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারের বিধান ছিলো না। ইসলামই সর্বপ্রথম আইন সংগত অধিকার প্রদান করে। তবে, কে কতটুকু সম্পত্তির অধিকারী হবে অবস্থা ভেদে উহার পার্থক্য হয়।

এখন উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় আয়াত গুলিতে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن
كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ
وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
آبَآؤُكُمْ وَأَبنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا- وَلَكُمْ
نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ
أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ-

"আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন: এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। যদি কেবল কন্যাই থাকে আর তারা হয় দুইজনের বেশি তাহলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিনভাগের দুইভাগ। যদি কেবল একজন কন্যাই থাকে তাহলে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক। মৃতের সন্তান থাকলে তার মাতাপিতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয়ভাগের একভাগ, মৃত ব্যক্তি সন্তানহীন হলে এবং মাতাপিতাই তার উত্তরাধিকারী হলে তার মায়ের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিনভাগের একভাগ। মৃতের ভাইবোন থাকলে মায়ের জন্য ছয়ভাগের একভাগ। এ সকল অংশ বণ্টিত হবে মৃতের ওসিয়াত পুরণ ও ঋণ পরিশোধ করার পর। তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে কে তোমার বেশি উপকারী তোমরা তা জান না। মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনের এ বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাবিজ্ঞানী। তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক

[১] আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াতঃ ৭

Dhaka University Institutional Repository

অংশ তোমাদের জন্য, যদি তোমাদের মৃত স্ত্রীদের কোন সন্তান না থাকে। যদি তাদের সন্তান থাকে তাহলে তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির চারভাগের একভাগ। এ সকল অংশ বণ্টিত হবে মৃতের ওসিয়াত পুরণ ও ঋণ পরিশোধ করার পর। তোমরা যদি সন্তানহীন মৃত্যুবরণ কর তাহলে তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির চারভাগের একভাগ তোমাদের স্ত্রীদের জন্য। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তাহলে তোমাদের স্ত্রীদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির আটভাগের এক ভাগ। এ সকল অংশ বণ্টিত হবে তোমরা যা ওসিয়াত করবে তা পুরণ ও তোমাদের ঋণ পরিশোধের পর। যদি মাতাপিতা ও সন্তানহীন কোন পুরুষ বা নারীর উত্তরাধিকারী থাকে তার বৈপিত্রেয় এক ভাই বা বোন, তাহলে তাদের প্রত্যেকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয়ভাগের একভাগ পাবে। তাদের সংখ্যা এরবেশি হলে তারা সমানভাবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিনভাগের একভাগ সম্পত্তি লাভ করবে। এ সকল অংশ বণ্টিত হবে মৃতের ওসিয়াত পুরণ ও ঋণ পরিশোধ করার পর, যদি ওসিয়াত ও ঋণ কারো জন্য ক্ষতিকর না হয়। সম্পত্তি বণ্টনের এ বিধান আল্লাহর নিকট থেকে নির্দেশ বিশেষ। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাবিজ্ঞানী।[১]

উপর্যুক্ত বর্ণনা হতে দেখা যায় যে নারীর উত্তরাধিকার কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষ অপেক্ষা বেশী হয়, কখনও সমান হয়, কখনও কম হয়।

উক্ত আয়াতের বর্ণনায় নারীর অবস্থা দেখা যাকঃ

১। পুরুষের অংশ বেশীঃ পিতার মৃত্যুর পর পুত্র পাবে ২ ভাগ এবং কন্যা পাবে ১ ভাগ।

২। নারীর সমান অংশ প্রাপ্তিঃ এক ব্যক্তি মারা গেলে, তার উত্তরাধিকারী হলো তার পুত্র, কন্যা এবং পিতা-মাতা। এক্ষেত্রে পুত্রের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ পাবে মা এক ষষ্ঠাংশ পাবে বাবা। এক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষ (পিতা-মাতা) সন্তানের সম্পত্তির সমান অংশই পাচ্ছে।

৩। নারীর সমান উত্তরাধিকারঃ ভাই-বোন যদি কোনো দূরবর্তী আত্মীয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় তবে, ভাই এবং বোন (পুরুষ এবং নারী) উভয়েই এক ষষ্ঠাংশ হিসাবে সমান অংশই পাবে; কেউ বেশী নয়-কেউ কমও নয়।

---

[1] আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াতঃ ১১-১২

Dhaka University Institutional Repository

৪। নারীর বেশী অংশের উত্তরাধিকার: যদি কোনো ব্যক্তি কন্যা এবং পিতা রেখে মারা যায় তবে কন্যা পাবে অর্ধেক এবং পিতা পাবে এক ষষ্ঠাংশ।

কী পরিমাণ সম্পত্তি একজন উত্তরাধিকার সূত্রে পেল তা দ্বারা নারী এবং পুরুষের পারস্পরিক মর্যাদা নির্ণয় হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অংশ পেয়ে থাকে, কখনও কখনও কম।

উত্তরাধিকার সূত্রে তাদেরকে বেশী দেওয়া হয় যাদের আর্থিক দায়িত্ব বেশী। ভাই আর বোনের কথাই ধরা যাক। ভাই পরিবারের সকল নারী এমনকি ভগ্নীর ভরণ-পোষণের জন্য দায়। সে বিয়ে করলে স্ত্রীকে মোহরানা দেয় এবং তার সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

ভগ্নীর বিয়ে হলে সে মোহরানা পায় এবং তার ভরণ পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে তার স্বামী। পিতার মৃত্যুর পর বয়স্ক ভ্রাতা এবং অবিবাহিত বোন রইল। বোন পিতার সম্পত্তি যা পাবে ভাই তার দ্বিগুণ পাবে এটা সত্য। কিন্তু বোন অর্ধেক পেলেও তার ভরণ পোষণের দায়িত্ব ভাইয়ের উপর। ভাই এ কথা বলতে পারবে না যে আমি তোমার দ্বিগুণ সম্পত্তি পেয়েছি বটে; কিন্তু আমাকে আমার ৫টি সন্তানকে খাওয়াতে হয়, মাকে, ফুফুকে দেখতে হয় সেহেতু আমি তোমার ভরণ পোষণের জন্য দায়ী নই। তুমি তোমার সম্পত্তি হতে নিজের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করো।

সূরা নিসার আয়াত নং ১১, ১২ এবং ১৭৬ দ্বারা উত্তরাধিকারের নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিস্তারিত বিষয়গুলো হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) ফয়সালা করে দিয়েছেন।

হাদীসে বর্ণিত আছে, "হযরত সা'দ ইবনে আবি রাবি'র (রাঃ) স্ত্রী তাঁর কন্যাকে নিয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট এলেন। তিনি বললেন, ওহে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! এ দু'টি হযরত সা''দ ইবনে রাবি'র (রা) কন্যা। তাদের পিতা আল্লাহ তাআলার রাস্তায় অহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তাদের পিতৃব্য সা'দ ইবনে রাবি'র (রাঃ) সব টাকা পয়সা নিয়ে গেছেন। তাদেরকে কিছুই দেননি। টাকার অভাবে তাদের বিয়েও হচ্ছে না। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, 'আল্লাহ তাআলা নিশ্চয়ই এ বিষয়ে আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন।[1] এর পরেই উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয়।

[1] আবু য়ুসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, উর্দু সংস্করণ, করাচী ১৩৯৮ হিজরি, পৃ.২৩৮

Dhaka University Institutional Repository

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) সা'দের কন্যাদ্বয়ের পিতৃব্যকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে বললেন। সা'দের সম্পত্তির তিন ভাগের দুইভাগ দুই কন্যাকে দিয়ে দাও এবং তাদের মাতাকে দাও আটভাগের একভাগ আর বাকীটুকু তোমার।[1]

ইসলামে ভ্রাতাকে ভ্রাতার সম্পত্তির ক্ষেত্রবিশেষে উত্তরাধিকারী করেছে। সা'দ ইবনে আবি রাবি (রাঃ) যদি কোনো সম্পত্তি না রেখে মারা যেতেন তবে তাঁর ভ্রাতাকে তাঁর কন্যাদ্বয় এবং তাঁর বিধবা স্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হতো যে পর্যন্ত না তাদের অন্যত্র বিবাহ ঠিক হতো।

সুতরাং ইসলামী অর্থনৈতিক কাঠামোয় নারীর প্রাপ্ত সম্পদ, মোহরানা এবং ভরণ-পোষণের সুযোগ সুবিধাসহ মোট আর্থিক প্রাপ্তি থেকে আর্থিক ও সাংসারিক দায়দায়িত্ব (যে সব দায়বদ্ধতা নারীর ওপর বর্তায় না) বাদ দিলে নর-নারীর সামগ্রিক জীবনের যে অর্থনৈতিক চিত্র পরিস্ফুট হয়, তাতে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে-ইসলামে পুরুষের চেয়ে নারীর সুযোগ সুবিধা অনেক বেশী।

আর একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি অন্যভাবে বুঝা যেতে পারেঃ

ধরা যাক দুজন যাত্রী দেশের এক প্রান্ত থেকে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা শুরু করল। একই তহবিল থেকে একজনকে পাথেয় দেয়া হলো ৫০০/- টাকা, অপরজনকে দেওয়া হলো ২৫০/- টাকা, রিজার্ভ ফান্ড হিসাবে ১৫০/- টাকা এবং একটি ফ্রি টিকিট। যদি টিকিটের মূল্য ৪০০/- টাকা হয় তাহলে প্রথম যাত্রীর অন্যান্য খরচ বাবদ থাকবে (৫০০-৪০০)=১০০/- টাকা এবং অপর জনের থাকে (২৫০+১৫০)=৪০০/- টাকা। ফ্রি টিকিটের অর্থ যদি সংসারে অর্থনৈতিক দায়কে ধরা হয়, তাহলে একথা প্রমাণিত সত্য যে, "ইসলাম নারীকে সংসারের অর্থনৈতিক দায়মুক্তি দিয়ে তার স্বভাব ও প্রকৃতিকে হেফাযত করেছে এবং মোহরানার ব্যবস্থা করে সকল নারীকে বিশেষত নিঃস্ব নারীকেও দিয়েছে অর্থনৈতিক অঙ্গীকার।[2]

ইসলামে নারীর এইরকম আর্থিক অধিকার দিয়েছে প্রায় দেড় হাজার বছর আগেই।

প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, স্নেহ ও মমতা দিয়েই এ সংসার জীবন। এর যে কোনো একটির অভাব ঘটলেই সংসার হয় বিষময়। নারী যদি পুরুষের মত অধিকার না পায়, সংসার জীবনে যদি ক্রীতদাসীর মতো স্বামীর নিকট ব্যবহার পায় হবে এ দুনিয়া তার নিকট দোযখ হয়ে দাঁড়ায়। একই

[1] ইমাম তিরমিযি, সুনান, পূর্বোক্ত, পৃ.৪১৪

[2] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

পিতার সন্তান হয়ে কন্যা চিরজীবন সম্পত্তি, স্নেহ ও মমতা হতে বঞ্চিত হবে ইসলাম তা স্বীকার করেনা। পিতার চোখে ছেলে ও মেয়ে একই। এটাই ইসলামের শিক্ষা। এ ভাবে ইসলাম নারীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্তিতে ও অধিকার প্রদান করেছে।

নারীর মালিকানা লাভের অধিকার

সর্বপ্রকারের অর্থনৈতিক লেনদেনে যেরূপ অধিকার ইসলাম পুরুষকে দিয়েছে, সেরূপ অধিকার নারীকে ও দিয়েছে। নারী তার সকল সম্পদে দখল ও হস্তক্ষেপ করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। সম্পদ অধিকারে রাখা এবং সক্রিয়ভাবে উপার্জনে অংশ গ্রহণের অধিকার ইসলাম নারীকেও দিয়েছে।

ইসলাম নারীদেরকে সম্পদের অধিকার দিয়েছে। ইসলামের উত্তরাধিকার আইন এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অনেক ধর্মই মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদে উত্তরাধিকারী হতে নারীদেরকে বঞ্চিত করেছে। কিন্তু ইসলাম নিকট আত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তাদের সুনির্দিষ্ট অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছে। কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

মাতাপিতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদে পুরুষের অংশ আছে; মাতাপিতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদে নারীরও অংশ আছে; কম হোক বা বেশি, নির্ধারিত অংশ।[১]

আহ্ওয়ালুস শাখছিয়্যাহ ফিল আহকামে উল্লেখ আছে- "স্ত্রী যদি বুদ্ধিমান বালেগা হয়, তবে তার সম্পদে কারো অধিকার নেই। বরং সে নিজেই উক্ত সম্পদে দখল ও হস্তক্ষেপের মালিক। তার ক্ষমতা আছে, তার কিছু সম্পদ অথবা পূর্ণ সম্পদের উপর কাউকে উকিল বানিয়ে দেওয়া তদ্রুপ কোনো অভিভাবক তার মোহরের উপর উকিল বানানো ছাড়া হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।"[২]

---

[1] আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াতঃ ৭

[2] আবূ য়ূসুফ, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৮৭

Dhaka University Institutional Repository

ফতওয়ায়ে আলমগীরীতে আছে, "পিতার ক্ষমতা নেই মেয়ের মোহর অন্য কাউকে হেবা তথা দান করে দেওয়ার। এটা হচ্ছে সকল আলেমগণের অভিমত।"[১]

বাদায়ী গ্রন্থে রয়েছেঃ "হ্যাঁ! নারীর নিজের ক্ষমতা রয়েছে আপন খুশীতে জবরদস্তি ছাড়া নিজের মোহর কম করে দেওয়া অথবা ক্ষমা করে দেয়ার।"

হিদায়া গ্রন্থে আছেঃ যদি নারী স্বীয় মোহরের কিয়দাংশ মাফ করে দেয়, তবে তা শুদ্ধ হবে।

ফতওয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ আছেঃ "মাফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য তার সন্তুষ্টি থাকা জরুরী। যদি জবর দস্তি কারণে মাফ করে, তাহলে মাফ সহীহ ও বিশুদ্ধ হবে না।"[২]

যেহেতু প্রত্যেক নারীর তার মোহরের মালিকানা আছে। তাই তার ক্ষমতা আছে যে কোনো ভাবে তার মোহরে হস্তক্ষেপ করার। তাতে কারো হস্তক্ষেপের অধিকার নেই। এটা হলো ইসলামী আইনের মাস্‌আলা।

এর উপর ভিত্তি করে নারীর পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, তার সম্পদে সব ধরনের বৈধ হস্তক্ষেপকে বাস্তবায়ন করার। তাই তার ক্ষমতা আছে তার মোহরের টাকা দিয়ে যে কোনো কিছু খরিদ করার, স্বীয় মোহর দিয়ে যা ইচ্ছা খরিদ করবে বা স্বামী অভিভাবক বা অন্য যে কাউকে দান করে দিবে।[৩]

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর যুগে প্রতিটি নারী তার মালিকানা অধিকার বুঝত। নিজেই নিজের সম্পদে সবধরনের হস্তক্ষেপ করতো এতে স্বামী বা অন্য কোনো আত্মীয় স্বজনের দখল থাকত না।

একদা হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করে, "আমি যদি আবূ সালমার বাচ্চাদেরকে সদ্‌কা দেই তাহলে সওয়াব পাব কি? কেননা তারা আমার সন্তান। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ, তাদেরকে সদকা দান কর। তাতে সওয়াব পাবে।"[৪]

---

[1] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৮

[2] প্রাগুক্ত

[3] প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯০

[4] ইমাম বুখারী, *সহীহ*, পূর্বোক্ত, পৃ.৫১৭

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং নারীদের এই অধিকার (তাদের আপন সম্পদের উপর পূর্ণ ক্ষমতা ও মালিকানার মধ্যে কারো দখল নেই। বরং সে নিজেই নিজের সম্পদে পূর্ণ ক্ষমতা বান) ইসলামী আইনের বিশেষত্ব সমূহের একটি।

ইসলাম নারীদেরকে অর্থউপার্জনের অধিকার দিয়েছে। অর্জিত ধন নিজের দখলে রাখার অধিকারও তাদের আছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেনঃ "পুরুষদের জন্যও তাদের উপার্জনের নির্দিষ্ট অংশ রহিয়াছে এবং নারীদের জন্যও তাদের উপার্জনের নির্দিষ্ট অংশ রহিয়াছে।"[1]

সুতরাং আমরা উপর্যুক্ত আলোচনা হতে উপলব্ধি করতে পারছি যে, ইসলাম নারীকে অর্থ উপার্জন ও সম্পদের মালিকানা নিজের অধিকারে রাখার সুযোগ প্রদান করেছে।

শালীনতা ও সম্ভ্রম সংরক্ষণের অধিকার

অন্ধকার যুগের সামাজিক পরিবেশের একটি চিত্র তুলে ধরার জন্য কুরআন মজীদে যে সব প্রয়োজনীয় আয়াত বর্ণিত হয়েছে, এসব আয়াতে অন্ধকার যুগের বিভিন্ন বদভ্যাস, কুসংস্কার ও অশ্লীলতার নিন্দা ও সমালোচনা করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে প্রচলিত নোংরামীর জন্য তাদের তিরস্কার ও ভৎর্সনা করা হয়েছে। সাথে সাথে এমন সব আইন বিধি ও প্রণয়ন করা হয়েছে যার বাস্তবায়ন করে ঐসব অপরাধ প্রবনতা, নোংরামী ও অশ্লীলতা থেকে তারা মুক্তি পেতে পারে।

পর্দা প্রথার অর্থ নারীজাতির মর্যাদা রক্ষা। এ প্রথা বহুকাল থেকেই চলে আসছে। বেদও পুরাণএর কিছু বর্ণনা দেখলে মনে হয় ব্যভিচারে সমগ্রদেশ গ্রাস করেছিল। মুনি-ঋষিদের স্ত্রীগণও রক্ষা পায়নি।

পুরাণে আছেঃ "দীর্ঘতমা মুনিও নিজ স্ত্রীকে অপরের ভোগ্যা নারী হিসেবে উপস্থাপন করে সতীত্বের নযির স্থাপন করেন।"[2]

বেদে আছেঃ "মুনি সংহিতার মতে, পুত্র দ্বাদশ প্রকারের। তার মধ্যে স্ত্রীলোকের অবিবাহিতা অবস্থায় যে সন্তান জন্ম লাভ করতে তাকে বলা হতো 'কালীন'। গর্ভবতী কুমারীর বিবাহের পর জাত সন্তান

---

[1] আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াতঃ ৩২

[2] ব্রহ্মপুরাণ, অধ্যায় ১৮, শে-াক ১২, কলকাতা ১৯৯৫ পৃ.২৩০

Dhaka University Institutional Repository

'সহোচ'। বিধবার পুনরায় বিবাহেরর পর জাত সন্তন 'পৌণভব'। ব্রাহ্মণাদি উচ্চতর জাতির ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জাত সন্তান 'শৌদ্র'।"[১]

পর্দা প্রথা যদি মানা হতো তা হলে ব্রাহ্মণ, মুনি-ঋষি তাদের স্ত্রীগণ কিভাবে অন্যের দ্বারা ধর্ষিতা হয়ে গর্ভবতী হতেন? পর্দার মাথায় কুঠারাঘাত হেনে শুধু হিন্দুরাই নয়, খ্রীষ্টান, ইহুদি ও মুসলমানগণও অবাদ মেলামেলার সুযোগ নিচ্ছে। হযরত রাসূলুল্লাহ (স)এর আবির্ভাবের পূর্বে আরবের নারীগণ ইচ্ছামতো ধর্ষিতা হতো। এরা তখন মুসলমান ছিলো না, ছিলো পৌওলিক, খ্রীস্টান, ইহুদি। সে অন্ধকারে যুগে নারীর অবস্থা ছিলো শোষিতা, নিপীড়িতা ও নির্যাতিতা।

ইসলাম নারীকে পূর্ণ মানবিক মর্যাদার উচ্চতম পর্যায়ে এনে দিয়েছে। ইসলাম নারীকে শিক্ষাদীক্ষায় ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে এমনকি অধ্যাত্মিকভাবে ও উচ্চ মর্যাদা দান করেছে। পূর্বে যেখানে নারীকে মানুষ বলে স্বীকৃতি দিতে ও সবাই প্রস্তুত ছিলো না, সেখানে ইসলামেই শুধু তাকে পূর্ণ মানুষ বলে ঘোষণা করেছে এবং তাকে সেবা করা ও শ্রদ্ধা করাকে "আল্লাহর ইবাদতের সমতুল্য" বলে ঘোষণা করেছে।

মানব-প্রকৃতি, বিশেষত নারী প্রকৃতিতে যে লজ্জাশীলতা আছে, এর সংরক্ষণ অতীব জরুরী। পরস্পর দেখা সাক্ষাতের ব্যাপার ইসলাম নির্ধারিত সীমালংঘন না করাই এর প্রকৃষ্ট উপায়। আসলে ইসলামে আনুগত্যের ভিত্তি হলো ঈমান।

মানুষ সৃষ্টির সেরা। সুতরাং তার বৈশিষ্ট্য রক্ষা কল্পে ইসলাম মানুষের মান-সম্মান ও তার বৈবাহিক সম্পর্ক রক্ষা করে এবং এ জন্যই তার যৌন উত্তেজনাকে সীমিত রাখার নির্দেশ দেয়। ইসলাম যৌন বাসনাকে সংযত করে, নষ্ট করে না। আবার ইতর প্রাণীর ন্যায় মনের আনন্দে বিচরণ করে যেখানে সেখানে যৌন বাসনা চরিতার্থ করার অনুমতিও প্রদান করে না; বরং সুনির্দিষ্ট বিধি নিষেধ দ্বারা ইসলাম যৌন বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। এই বিধি নিষেধ মেনে চললে সমাজে কোনো প্রকার যৌন সমস্যার উদ্ভব সম্ভব নয়। কারণ, যৌন বাসনা অসংযত ভাবে উওেজিত হয়ে উঠতে পারে এমন যাবতীয় বিষয়ই ইসলামে নিবিদ্ধ হয়েছে। আর তাই নারীর সম্ভ্রম ও শালীনতা রক্ষার্থে হযরত

---

[১] সুবল চন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ.৩০৯

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ "নারীরা আড়ালে থাকার বস্তু। আড়াল হতে নারী বের হলেই শয়তান তার প্রতি উঁকি মারে।"[১]

এর ব্যাখ্যায় বলা যায়, নারী যদি পর্দা মেনে না চলে তবে তাকে বিপথ গামী হতে উস্কানী যোগায় তার প্রদর্শিত লোভনীয় অঙ্গগুলো। আর তখনই পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে নারীর ওপর। যা তার ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

নারী শালীনতা সংরক্ষণে ইসলামী ব্যবস্থা

হিজাব সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার নির্দেশঃ নারী শালীনতা সংরক্ষণ কালে দৃষ্টি সংযত, গুপ্তাঙ্গের হিফাজত এবং নারী সৌন্দর্য প্রদর্শনে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)কে সম্বোধন করে কুরআন মজীদে মহান আল্লাহ মহান আল্লাহ বলেনঃ

قُلْ لِلْمُؤْ مِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذَالِكَ اَزْكَى لَهُمْ ط اِنَّ اللهَ خَبِيْر بِمَا يَصْنَعُوْنَ- وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَيُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ وَلاَيُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْاَبَائِهِنَّ اَوْاَبَاءِ اِلاَّمَاظَهَرَمِنْهَا بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْاَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْبَنِى اِخْوَانِهِنَّ اَوْبَنِىْ اَخَوَاتِهِنَّ اَوْنِسَائِهِنَّ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِالتَّبِعِيْنَ غَيْرَ اُوْلِى الاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِالطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَيَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَايُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْا اِلَى اللهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

"মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; এটিই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে আল্লাহ তার সব খবরই রাখেন। মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; তারা যেন সাধারণত যা প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে;

---

[১] ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৬৯

Dhaka University Institutional Repository

তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে ফিরে এসো, তাহলে তোমরা সফল হতে পারবে।"[১]

এভাবে মহান আল্লাহ নারী জাতি ও পুরুষ জাতি উভয়কেই তাদের দৃষ্টি অবনমিত করে রাখতে ও তাদের গুপ্ত অঙ্গের হিফাজত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু নারীর জন্য এটুকুই যথেষ্ট নয় বলে তাদেরকে আরও অতিরিক্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তা হলো, তারা যেন নিজেদের যীনাত (সৌন্দর্য) প্রদর্শন না করে, তবে যা এমনিতেই প্রকাশ হয়ে পড়ে, সেটা ভিন্ন কথা। তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন চাদর দ্বারা ঢেকে রাখে এবং পথ চলাকালে তারা যেন খুব সাবধানতা অবলম্বন করে। পদধ্বনিতে যেন তাদের অপ্রকাশিত সৌন্দর্য প্রকাশ না হয়ে পড়ে।

ইসলামে নারীর সতীত্বের মর্যাদা

কুরআন মাজীদ যেহেতু আল্লাহ তায়ালার আখেরী ও পূর্ণ সংবিধান, তাই এর মধ্যে বিশ্বজাহানের সকল দেশ ও কালের মানবজাতির জান-মাল ও ইজ্জত আবরু হেফাজতের পূর্ণ বিধান রয়েছে।

ইজ্জত-আবরু রক্ষার ব্যাপারে কুরআন মজীদ যেসব কাজকে অপরাধ সাব্যস্ত করেছে, সেগুলোকে ফিক্হের পরিভাষায় হদ্দ বা দণ্ডবিধি বলে।[2] নারীদের সাথে ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদ কুরআন মজীদ ঘোষিত হদ্দ বা দণ্ডবিধির অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদ প্রতিরোধের জন্য বিস্তারিত দণ্ডবিধি প্রদান করেছেন। ইজ্জত আবরু রক্ষার ব্যাপারে কুরআন মজীদ নারীকে এত উচ্চ স্থান দিয়েছে যে, তার ইজ্জত রক্ষার জন্যই মূলত এ হদ্দ জারী করা হয়েছে। এ ব্যাপারে পুরুষের যে অপবিত্র চাহিদা নারীর উপর প্রভাব ফেলতে পারে, তা বন্ধের জন্য এবং নারীর পবিত্রতা ও আব্রু যথার্থভাবে সংরক্ষণের জন্য কার্যকর নির্দেশনা প্রদান করেছে। কুরআন মজীদ ও আল–হাদীসের ঘোষণার আলোকে এখানে পর্যায়ক্রমে নারীর সতীত্ব রক্ষায় ইসলাম প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ উল্লেখ করা হলো।

---

[1] আল-কুরআন, সূরা নূর, আয়াত: ৩০-৩১

[2] আহমদ কুন্তালাবী, পূর্বোক্ত, পৃ.১২৩

Dhaka University Institutional Repository

১। প্রথম নির্দেশনা

যদি কোনো পুরুষ নারীর আবরুকে ধ্বংশ করে বা তার সতীত্বের উপর হস্তক্ষেপ করে ও নারীকে বাধ্যতামূলক অপকর্মে লিপ্ত করে। এমতাবস্থায় পুরুষকে পাথর নিক্ষেপ করা হবে অথবা একশত বেত্রাঘাত করা হবে। যেহেতু নারী নিরপরাধ তাই তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। হ্যাঁ! যদি নারী-পুরুষের উভয়ের সম্মতি থাকে, তবে উভয়কে দণ্ডবিধি প্রদান করা হবে, যেহেতু তারা উভয়েই সমান অপরাধী।

সর্বপ্রথম উক্ত ব্যভিচারের অপরাধের ভয়াবহতার দিক লক্ষ্য রেখে আল্ কুরআনে তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-

وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً

"আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ।"[১]

উক্ত আয়াতে এই নির্দেশ নেই যে, ব্যভিচার করো না। বরং নির্দেশ হচ্ছে, তার কাছেও যেয়ো না। অর্থাৎ সে সমস্ত কাজের নিকট ও যেয়ো না, যেগুলো ব্যভিচারের কাছাকাছি এবং ব্যভিচার পর্যন্ত তোমাকে পৌছে দিবে।

এবার বাকী রইল ব্যভিচারের বিষয়। সে ব্যাপারে নির্দেশ হচ্ছে, তা অশ্লীল কাজ ও পরিষ্কার মন্দ পথ। অশ্লীলতার ব্যাপারে নির্দেশ হচ্ছে,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

"আপনি বলুনঃ 'নিশ্চয় আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশীলতা, সকল পাপাচার, সমস্ত অন্যায় বিদ্রোহ এবং কোন কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক করা, যার শরীক করার পক্ষে তিনি কোন দলীল নাযিল করেননি এবং তিনি আরো হারাম করেছেন আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলা, যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই।"[২]

---

[1] আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াতঃ ৩২

[২] আল-কুরআন, সূরা আরাফ, আয়াতঃ ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ অশ্লীল বিষয় আল্লাহ তায়ালা হারাম করেছে। যেহেতু ব্যভিচার অশ্লীল, তাই আল্লাহ তায়ালার নিকট তা হারাম।

অশ্লীলতা সম্পর্কে অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে- তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন।[1]

অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছা হল, যেন সমাজে অশ্লীলতা প্রকাশ না পায় ও তার বান্দারা অশ্লীল কাজে লিপ্ত না হতে পারে। অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে সীমাতিক্রম করা।

অতএব ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া মানে আল্লাহ তাআলার সীমালংঘন করা ও তার নির্ধারিত সীমাতিক্রম করা। এটা আল্লাহ তাআলার নিকট জঘন্য অপরাধ। তাই "আল্লাহ তায়ালার সীমা" সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে- "এই হলো আল্লাহ তাআলা কর্তৃক বেঁধে দেওয়া সীমানা। অতএব এর কাছেও যেও না।[2] অন্য আয়াতে হাঁ এবং না উভয় দিকের ফলাফল পরিষ্কার বর্ণনা করে কুরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছে, "এগুলো আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত সীমা, যে কেউ আল্লাহ ও হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর আদেশ মত চলে, তিনি তাকে জান্নাত সমূহে প্রবেশ করাবেন। যেগুলোর তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবেশ হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হলো বিরাট সাফল্য। কেউ কেউ আল্লাহ ও হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর অবাধ্যতা করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে। তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।[3]

অতএব ব্যভিচার হতে সংরক্ষণের নির্দেশনা সমূহ হতে প্রথম নির্দেশনা হচ্ছে কুরআন মজীদে তা হারাম হওয়ার বিষয় বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, এ কাজ অশ্লীল ও হারাম। আল্লাহ তাআলার সীমা লংঘন করা। যার ফলাফল হলো জাহান্নামের বেদনা দায়ক শাস্তি।

---

[1] আল-কুরআন, সূরা নহল, আয়াত: ৯০

[2] আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত: ৮৭

[3] আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত: ১৩-১৪

Dhaka University Institutional Repository

২। দ্বিতীয় নির্দেশনা

সতীত্ব রক্ষার দ্বিতীয় নির্দেশনা হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ভাষায়, ব্যভিচারের গুনাহ শিরকের গুনাহের সমান। যিনা শিরকের সমান। শিরকের পর বড় গুনাহ হলো যিনা। শিরকের পর তার চেয়ে বড় পাপ আর নেই যে, এমন রেহমে বীর্যপাত করা যা তার জন্য হালাল ছিলো না।[১]

যিনার কারণে আল্লাহ তাআলার লজ্জা আসে। আল্লাহ তাআলার শপথ! কোনো নারী বা পুরুষ যিনা করার ব্যাপারে আল্লাহর চেয়ে অধিক আত্মসম্ভ্রমবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি কেউ নেই। আল্লাহর কসম! তিনি সম্পর্কে আমি যা জানি তা তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা হাসি কমিয়ে দিয়ে বেশি কাঁদতে।[2]

যিনাকারী মুখ জাহান্নামের অগ্নিদ্বারা জ্বালানো হবে। যিনাকারীদের মুখ জাহান্নামের আগুনে ভস্মিভূত করা হবে। অগ্নিতে তাদের মুখ জ্বলে উঠবে।[৩]

ব্যভিচার ও ব্যভিচারিণীর চামড়া কেঁচি দ্বারা কাটা হবে। আমি মিরাজ রাজনীতে দেখেছি, কতিপয় লোকের চামড়া কেঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছে। আমি জিবরাঈল (আঃ) কে জিজ্ঞেস করে অবহিত হলাম যে, এরা সে সকল নারী-পুরুষ, যারা যিনার জন্য সাজ-সজ্জা করতো।[৪]

উপর্যুক্ত হাদীস সমূহ হতে এ শিক্ষাই পাই যে আখেরাতের কঠিন শাস্তির ভয় দেখিয়ে ইসলাম নারীর সতীত্ব রক্ষার প্রয়াস চালিয়েছে। অন্যদিকে ব্যভিচারী মানুষ নয়; পশুর চেয়ে ও অধম। এজন্য ইহাকে দণ্ডনীয় অপরাধ সাব্যস্ত করে কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেনঃ

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَتَاْخُذْ كُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِى دِيْنِ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْ مِنِيْنَ-

"ব্যভিচারী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষকে একশত কশাঘাত করবে। আল্লাহর বিধান কার্যকর করায় তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদের প্রভাবিত না করে যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখিরাতে বিশ্বাসী হয়ে থাকো। মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।"[১]

---

[১] বদরুদ্দীন আইনী, পূর্বোক্ত, পৃ.৩১৪

[2] ইমাম বুখারী, *সহীহ*, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৫৪

[3] ইমাম তিবরিযী ইবন তাবরানী, *সগীর*, বৈরুত, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৩ইং, খ.২, পৃ.১৪০৯

[4] ইমাম বায়হাকী, বায়হাকী, খ.৮, পূর্বোক্ত, পৃ.২৪৭

Dhaka University Institutional Repository

নারী ও পুরুষ উভয়েই অবিবাহিতা অবস্থায় ব্যভিচার করলে প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করার নির্দেশ এই আয়াতে প্রদান করা হয়েছে। ব্যভিচার স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, বল প্রয়োগে বা উভয়ের সম্মতিক্রমে, যে প্রকারেই হউক না কেন, দয়ার বশীভূত হয়ে বা অন্য কোনো কারণে এই শাস্তি কমানো যাবে না।

ইসলামে শাস্তির বিধান প্রতিরোধমূলক। এজন্যই লোকজনের উপস্থিতিতে শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তারা উহা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে। ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হয়ে পড়ে এবং এমন জঘন্য কাজে কখনও লিপ্ত না হয়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, অবিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার করলে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে এক বছরের জন্য নির্বাসন ও আইনগত দণ্ড অর্থাৎ একশত বেত্রাঘাত নির্দেশ দিয়েছেন।[2]

অবিবাহিত ব্যক্তির এই দণ্ডের উদ্দেশ্য হল, বেত্রাঘাত দ্বারা দৈহিক শাস্তি ও জনসমক্ষে অপরাধীকে লজ্জা প্রদান এবং নির্বাসন দ্বারা প্রিয় বস্তু হতে তাকে দূরে সরিয়ে রাখা, যাতে সে মানসিক শাস্তিও ভোগ করে। দৃষ্টান্ত ও প্রতিরোধমূলক শাস্তি এরূপ হয়ে থাকে।[3]

"গামিদ বংশের জনৈকা নারী যখন হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট এসে ব্যভিচার করেছে বলে স্বীকার করল, তখন তিনি তার জন্য বক্ষ পর্যন্ত গভীর এক গর্ত খনন করালেন এবং তৎপর (তাকে গর্তে নামিয়ে) লোকজনকে তার উপর প্রস্তর নিক্ষেপের আদেশ দিলেন। অনন্তর তারা প্রস্তর নিক্ষেপের দ্বারা হত্যা করে ফেলল।[4]

যদি চারজন স্বাধীন মুসলমান পুরুষ কোনো পুরুষ বা নারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের সাক্ষ্য প্রদান করে এবং স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সে ব্যভিচার কার্য করেছে বলে চাক্ষুষ প্রমাণ দেয়, তবে বিচারক তার উপর প্রস্তারাঘাতে মৃত্যু দণ্ডের আদেশ প্রদান করবেন।

কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ "যাহারা সতী-সাধ্বী নারীদের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর তারা স্বপক্ষে চারিজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তাহাদেরকে আশি

---

[1] আল-কুরআন, সূরা নূর, আয়াতঃ ২

[2] ইমাম বুখারী, সহীহ, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৫৩

[3] শাহ্ ওলীউল্লাহ (র), পূর্বোক্ত, পৃ.২১

[4] ইমাম আবূ য়ূসুফ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৬১-৪৬২।

Dhaka University Institutional Repository

বেত্রাঘাত কর এবং ভবিষ্যতে কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিও না। আর এমন লোকেরাই দুষ্কর্মশীল, পাপী। যদি তৎপর তারা তওবা করে ও নিজেদের কার্য সংশোধন করে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[1]

যৌন অপরাধ দমনের উদ্দেশ্যে ব্যভিচারের জন্য কঠিন শাস্তি বিধিবদ্ধ হয়েছে যেন সমাজে কেহই এই জঘন্য পাপ করতে সাহসী না হয়। আবার কেউ যেন মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি না করে, সেজন্য ইসলাম ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ প্রদানকারীদের ও শাস্তির বিধান রেখেছে। এভাবেই ইসলামে নারীর সতীত্ব রক্ষার ব্যবস্থা করেছে।

৩। তৃতীয় নির্দেশনা

সতীত্ব রক্ষার তৃতীয় নির্দেশনা হল, গায়েরে মাহ্রামের সাথে অবাধ মেলামেশা থেকে বারণ করা হয়েছে। এ ধরনের অবাধ মেলামেশাই অধিকাংশ যিনার কারণ। তাই ইসলাম নারীর সতীত্বের হেফাজতের জন্য আইনগত আবশ্যক করে দিয়েছে যে, গায়েরে মাহরাম নারী-পুরুষ অবাধভাবে মেলামেশা করতে পারবে না। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে এ ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যে গুলোতে অবাধ মেলামেশা থেকে বারণ করা হয়েছে। এরূপ কয়েকটি হাদীস নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ "গায়েরে মাহরামের নিকট প্রবেশ করা সম্পর্কে হযরত উক্‌বা বিন আমের (রাঃ) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন-গায়রে মাহরাম নারীর নিকট প্রবেশ করা থেকে বিরত থেকো।[2]

শুধু তাই নয় গায়েরে মাহ্রাম মহিলার ঘরে শয়ন হতেও বারণ করা হয়েছে। হযরত জাবের (রাঃ) সূত্রে বণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, কোনো ব্যক্তির গায়েরে মাহ্রাম বালেগা মহিলার ঘরে স্বামী বা মাহ্রাম বিহীন রাত্রি যাপন করা উচিত নয়।[3]

যৌন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকল্পে ইসলাম নারীর সাথে অপর পুরুষের নির্জন সাক্ষাৎকার একেবারে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

---

[1] আল-কুরআন, সূরা নূর, আয়াত: ৪-৫

[2] ইমাম বুখারী, সহীহ, পূর্বোক্ত, পৃ.২০০

[3] ইমাম মুসলিম, সহীহ, পূর্বোক্ত, পৃ.৭২২

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ওমর (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, "হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন,-"যখন কোনো পুরুষ কোনো মহিলার সাথে এক স্থানে বসে, তখন সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি শয়তান থাকে।"[১]

উপর্যুক্ত হাদীসে বুঝানো হয়েছে গায়রে মাহরাম নারী ও পুরুষ একাকীত্বে বসতে পারবে না। কারণ একাকীত্বের সুযোগে তারা শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে খারাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে।

ইসলাম স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের সাথে অবাধ মেলামেশা করতে বারণ করেছে। হযরত উক্‌বা ইবন আমের (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ "সাবধান, নির্জনে মহিলাগণের নিকট যেও না। একজন আনসার জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহ তাআলার রাসূল, দেবর সম্বন্ধে আপনি কী বলবেন? তিনি উত্তরে বলেনঃ সে তো মৃত্যু তুল্য।"[২]

উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য নারীর এ সকল লোককে এমন ভাবে ভয় করা উচিত, যেমন মৃত্যুকে ভয় করে। হযরত মোহাদ্দেসে দেহলভী (রাঃ) এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তার "লুমআত" গ্রন্থে লিখেছেন, "নিকট আত্মীয়দের ব্যাপারে ভয় বেশি এবং তাদের পক্ষ থেকে ফিৎনায় পতিত হওয়ার সম্ভাবনা ও বেশি। কেননা তাদের একাকীত্ব গ্রহণ ও মেলামেশা করা দোষনীয় মনে করা হয় না।"[৩]

সুগন্ধি ব্যবহার করে যখন নারী গায়রে মাহরামের মজলিসে যায় তখন সে ব্যভিচারিণীর হুকুমের আওতাভুক্ত হয়। কারণ তার এ কাজ গায়রে মাহরেমকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে এবং এতে অল্প পরিমাণ হলেও আগ্রহ তৈরির উদ্দেশ্যে নারীই নিজেকে সুগন্ধিযুক্ত অবস্থায় পেশ করেন। এর মানে হল, নারী নিজেকে অন্য পুরুষের নিকট আকর্ষণীয় বা আগ্রহের বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করার অর্থ পুরুষের ভেতরের পাশবিকতাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা। এ কারণেই এ জাতীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। হাদীসে আছেঃ "নারী যখন আতর ও সুগন্ধি ব্যবহার করে এমন মজলিসে অংশ গ্রহণ করে, সেখানে গায়েরে মাহরামাও আছে, তবে সে ব্যভিচাররিণীর অন্তর্ভূক্ত।"[৪]

এখানে আল্লাহর নবী (স) নারীকে উগ্র প্রসাধনী বা সুগন্ধি ব্যবহারে করে কোনো পুরুষ মহলে যেতে নিষেধ করেছেন কারণ এতে নারীর প্রতি পুরুষ যৌন আবেদন অনুভব করতে পারে।

---

[1] ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, পৃ.২৩৪

[2] প্রাগুক্ত

[3] আবদুল হক দেহলভী, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৬৪

[4] ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, পূর্বোক্ত, পৃ.৬২৫

Dhaka University Institutional Repository

নারীকে স্বামী ব্যতীত অপর পুরুষের পক্ষে স্পর্শ করা ও ইসলামে নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ যার সাথে তার কোনো বৈধ সম্পর্ক নাই, এমন কোনো নারীর হস্তযদি কেহ স্পর্শ করে তবে কিয়ামত দিবসে তার হাতের উপর জ্বলন্ত অগ্নি রাখা হবে।[1]

নির্জন সাক্ষাত বা গায়রে মাহরামকে স্পর্শ ইসলামে নিষিদ্ধ। কোনো ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে পুরুষ না থাকলে সেখানে যাওয়া উচিত নয়। এ ব্যাপারে কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ذَالِكُمْ خَيْر لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ- فَاِنْ لَمْ تَجِدُوْا فِيْهَا اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَاَزْكٰى لَكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْم- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاع لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ مَاتُبْدُوْنَ وَمَاتَكْتُمُوْنَ-

হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া আর কারো ঘরে ঘরের অধিবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ কর না। এটাই তোমাদের জন্য ভালো, যদি তোমরা মনে রাখ। যদি তোমরা ঘরে কাউকে না পাও তাহলে সেখানে প্রবেশ কর না যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়। যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ফিরে যাও; তাহলে ফিরে যাবে। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। যে ঘরে কেউ বাস করে না এবং যেখানে তোমাদের জন্য দ্রব্য সামগ্রী রয়েছে সেখানে প্রবেশে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর।"[2]

এভাবে গায়েরে মাহরামের সাথে নির্জন সাক্ষাতকে নিরুৎসাহিত করে নারীর সতীত্বকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছে ইসলাম।

৪। চতুর্থ নির্দেশনা

নারীর সতীত্ব রক্ষার চতুর্থ নির্দেশনা অবলম্বন করা হয়েছে, যা নারীদের জন্য পর্দপ্রথা ও দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখা আবশ্যক করেছে। কারণ, এ ব্যাপারে ফিৎনার প্রথম হলো বেপর্দা ও দৃষ্টিপাত। কারণ গায়রে মাহরাম (যাদের সাথে বিবাহ হারাম নহে) নারী পুরুষের পরস্পর দর্শনে উভয়ের জন্য অনাচারের

---

[1] ইবন হাজার আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, তারিখ বিহীন, খ.৯, পৃ.৩২৩

[2] আল-কুরআন, সূরা নূর, আয়াত: ২৭-২৯

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টি হতে পারে। অনাচার হওয়া স্বভাবিক এবং দর্শন হতে উহার সূত্রপাত ঘটে। তাই ইসলামে দৃষ্টি সংযত করার নির্দেশ দিয়ে প্রথমেই ইহার পথ রুদ্ধ করা হয়েছে। কুদৃষ্টিতে দর্শনকে চক্ষুর ব্যভিচার বলে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু চলাফেরা করার সময় কারো উপর দৃষ্টি না পড়া সম্ভব নহে। সুতরাং প্রথম দৃষ্টি মাফ আর দ্বিতীয় দৃষ্টি হিসাব-নিকাশ যোগ্য।

এ প্রসঙ্গে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ "হে আলী! প্রথম দৃষ্টির পর দ্বিতীয়বার তাকাবে না। প্রথম দৃষ্টি ক্ষমা করা হবে। কিন্তু দ্বিতীয়বার তাকালে ইহা ক্ষমা করা হবে না।"[১]

সুতরাং কোনো মহিলার উপর যদি হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে তবে প্রথম দৃষ্টিকে শরীয়াতে উপেক্ষা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়বার দৃষ্টি নিক্ষেপ নিষিদ্ধ হয়েছে।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি কোনো আজনবী (যার সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ নহে, এমন অপরিচিতা) নারীর প্রতি যৌন লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, কিয়ামত দিবস তার চোখে উত্তপ্ত গলিত শীশা ঢালা হবে।"[২]

আবশ্যকতার সময়ে আইনের শিথিলতাই ন্যায় বিচার দাবি করে। তাই চিকিৎসার জন্য বা মোকদ্দমার বাদী-বিবাদী অথবা সাক্ষীরূপে দেখা আবশ্যক হলে এই দেখাতে দোষ নাই। কোনো নারী আগুনে পড়েছে, পানিতে ডুবছে অথবা কারো সতীত্ব নষ্ট হচ্ছে এমতাবস্থায় কেবল দেখাই নয় বরং স্পর্শ করতে হলেও তাকে উদ্ধার করার নির্দেশ শরীয়াতে আছে।

দৃষ্টি আবনত সম্পর্কে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হচ্ছেঃ "মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা রয়েছে। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার উড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে।"[৩]

উক্ত আয়াতে দৃষ্টি নত করার নির্দেশ রয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে, নারী পুরুষ সর্বদা দৃষ্টি অবনত রাখবে, বরং উদ্দেশ্য হল, সে সমস্ত বস্তুসমূহ থেকে দৃষ্টিনত রাখবে, যেগুলোর দিকে মুসলমানের

---

[1] ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৪৯

[2] ইবনে হাজার, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৩২

[3] আল-কুরআন, সূরা, আয়াত: ৩০-৩১

Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টিপাত করা হারাম। আল্লামা ইমাম আবূ বকর জাস্সাস রাযী (রঃ) লিখেছেনঃ "উক্ত নির্দেশ দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, আমাদের উপর যে বস্তুসমূহের দিকে দৃষ্টি হারাম করা হয়েছে, সেগুলো থেকে দৃষ্টি অবনতের নির্দেশ রয়েছে। এ কারণে যে, সম্বোধিত ব্যক্তিরা উক্ত উদ্দেশ্যের ব্যাপারে জ্ঞাত আছে। তাই এ বস্তু সমূহের উল্লেখ করেননি।"[১]

পর্দা সম্পর্কে কুরআন মজীদে নির্দেশ হচ্ছে- "হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হয়। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"[২]

আল্লামা ইমাম আবূ বকর রাযী হানাফী (রঃ) উক্ত আয়াতের আলোকে লিখেছেনঃ অর্থাৎ উক্ত আয়াত হতে বুঝা যায়, যুবতী মেয়েদেরকে বেগানা পুরুষ হতে নিজের চেহারা ঢাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, (ঘর থেকে) বের হওয়ার সময় পর্দানশীল ও সতী নারীগণ তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবেন না। যাতে লম্পটরা তাদের প্রতি লালসিত না হতে পারে।[৩]

সুতরাং নারীর প্রতি ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে-নারীগণ বের হওয়ার সময় চাদর জামা ও ওড়না ব্যবহার করবে যাকে পর্দা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

৫। পঞ্চম নির্দেশনা

সতীত্ব রক্ষার পঞ্চম নির্দেশনা অবলম্বন করা হয়েছে নারীদের পোশাকের ব্যাপারে বিশেষ নিয়মাবলী প্রবর্তন করে। দেহের যে অংশ আবৃত করা ফরয (অবশ্য কর্তব্য), ইসলামের পরিভাষায় ইহাকে সতর বলে। তাফসীরে কাবীরে উল্লেখ আছে-ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব নারীরা একে অপরের সম্মুখে নিঃসংকোচে উলঙ্গ হয়ে কাবা শরীফে তওয়াফ করতো। স্নান ও মলত্যাগের সময় তারা উলঙ্গ থাকত। নারীরা এমন ভাবে পোশাক পরিধান করতো যাতে তাদের বক্ষ, বাহু, ও কোমরের কিয়দাংশ অনাবৃত থাকে। আজকাল নারীদের অবস্থা মোটেই উহা হতে ভিন্ন নয়। ইসলাম এ নগ্নতা নিষিদ্ধ করেছে এবং নারী-পুরুষের সতর নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

---

[১] ইবনে হাজার, পূর্বোক্ত, পৃ.৩১৪

[2] আল-কুরআন, সূরা আহযাব, আয়াতঃ ৫৯

[3] ইবনে হাজার, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৭২

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ "হে আদম সন্তান! তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করা ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদের পরিচ্ছদ দিয়াছি।"[১]

এই আয়াতের মর্ম অনুসারে নারী-পুরুষ উভয়ের দেহ আবৃত করা আবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়েছে। এই প্রসঙ্গে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ কোনো পুরুষ কোনো পুরুষকে এবং কোনো নারী কোনো নারীকে যেন উলঙ্গ অবস্থায় না দেখে।[২]

অপর এক হাদীসে আছে তোমরা কেহ যখন স্বীয় স্ত্রীর নিকট গমন কর, সে যেন তখনও তার সতর আবৃত রাখে এবং গাধার ন্যায় একেবারে উলঙ্গ হয়ে না পড়ে।[৩]

এই নির্দেশাবলীর সঙ্গে সঙ্গে নারী পুরুষের সতর ও পৃথক ভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

ক) পুরুষের সতরঃ নাভী হতে হাঁটুর মধ্যবর্তী অংশ পুরুষের সতর। কেবল স্ত্রী ব্যতীত অপর কেহই এই অংশ দেখতে পারবে না।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ "হাঁটুর উপর হতে নাভীর নীচে যা আছে, উহা ঢাকবার অংশ।" [৪]

সুতরাং নারীর ন্যায় পুরুষেরও শরীরের ঐ অংশ আবৃত করে রাখতে হবে।

খ) নারীর সতরঃ মুখমণ্ডল এবং কব্জী পর্যন্ত হাত ব্যতীত সমস্ত শরীরই নারীর সতর। স্বামী ব্যতীত পিতা, ভ্রাতা ইত্যাদি সকল পুরুষের নিকটই এই সতর খোলা রাখা নিষিদ্ধ।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ "বালিকা সাবালিকা হলে তার দেহের কেবল মুখমণ্ডল ও কব্জী পর্যন্ত হস্তদ্বয় ব্যতীত কোনো অংশই দৃষ্টিগোচর হওয়া সঙ্গত নয়।"[৫]

উক্ত হাদীসের মূল হল, চেহারা ও কব্জীদ্বয় ছাড়া নারীর পূর্ণশরীর সতর, অর্থাৎ তা ঢাকা ওয়াজিব। স্বামী ছাড়া সে কারো সামনে সতর উন্মোচন করতে পারবে না এবং তার দিকেও কেউ দৃষ্টিপাত করতে পারবে না এবং বৈধ হবে না। এক নারীর জন্য অন্য নারীর সতর দেখাও জায়েয নাই।

---

[1] আল-কুরআন, ৭, আয়াতঃ ২৬।

[2] ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, পূর্বোক্ত, পৃ.৬৫৪

[3] ইমাম ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৪২

[4] প্রাগুক্ত

[5] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (সা) পাতলা কাপড় ব্যবহার করার ব্যাপারে হাদীসে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, "আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ সেই সকল নারীর উপর, যারা কাপড় পরিধান করেও উলঙ্গ থাকে।"[১]

যারা এমন মিহি বস্ত্র পরিধান করে যে, যার ভিতর দিয়ে দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখা যায়, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে এ কথা বলা হয়েছে।

"একদা হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর শ্যালিকা হযরত আসমা (রাঃ) এমন পাতলা পোশাক পড়ে এলেন, যার দ্বারা শরীর আবৃত হয় না। বরং কাপড়ের নিম্ন ভাগের শরীর উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুখ ফিরিয়ে নিলেন ও তাঁকে সতর ঢাকার মাসআলা বলে দিলেন।"[২]

নারীর জন্য এমন পাতলা কাপড় পরিধান করা জায়েজ নেই, যা দ্বারা সতর আবৃত হয় না।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেনঃ "যে সকল নারী কাপড় পরিধান করেও উলঙ্গ থাকে, অন্যদের নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে ও নিজেরাও অন্যদের প্রতিআকৃষ্ট হয় এবং বড় উটের মত মাথা নেড়ে অহংকার করে চলে, তারা কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না।"[৩]

আরব জাহেলিয়াতের নারীগণ ওড়নার ব্যাপারে অনেক অসর্তক ছিল। তারা ওড়নাকে পিছনের দিকে ফেলে দিত। তাদের জামার বক্ষের অংশ প্রসস্ত থাকত। যার কারণে তাদের ব্যাপারে কুরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছে- "তারা যেন তাদের মাথার উড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে।"[৪]

উক্ত আয়াতের আলোকে আল্লামা যামাখশারী (রহ) তাফসীরে কাশ্শাফে লিখেনঃ তাদের বক্ষের অংশ প্রশস্ত থাকত। যার ফলে তাদের গ্রীবা, বক্ষ ও বক্ষের চারপাশ উন্মুক্ত থাকত। তারা ওড়না ফিছনে ফেলে দিত। ফলে তাদের গর্দানসমূহ, বক্ষসমূহ ও তার চারপাশ খোলা থাকত। এ কারণে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন ওড়না সম্মুখের দিকে ঝুলিয়ে দেয়। যাতে সবকিছু ঢাকা থাকে।[৫]

---

[১] ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৬৩

[2] মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খতীব, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, পূর্বোক্ত, পৃ.৭৩

[৩] ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৭৯

[4] আল-কুরআন, সূরা নূর, আয়াতঃ ৩১

[5] যামাখশারী, *তাফসীরে কাশশাফ*, বৈরুত ১৪২৪ হিজরি, পৃ.৩২২

হযরত উমর (রাঃ) বলেনঃ নারীদেরকে এমন আট-সাট কাপড় পরিধান করতে দিও না যাতে শরীরের গঠন পরিস্ফুট হয়ে পড়ে। কারণ এতে করে পুরুষ মানুষ নারীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দিবে এবং তাদের মধ্যে কামভাব জাগ্রত হবে যা নারীর জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে।[1]

জাহেলিয়াত যুগের নারীরা অলংকার পরিধান করে ফিৎনার উপকরণ সমূহ সাথে নিয়ে পুরুষ মঞ্চের সৌন্দর্য বর্ধিত করতো। জামার কাট-সাট এত নিপুন হত যে, শরীরের আকৃতি ও গঠন দর্শকের দৃষ্টি তাদের দিকে কেড়ে নিত।

ইসলাম ধর্মে উগ্রতার কোনো স্থান নেই। মহিলাদের চলার সময় সে যেন শরীর দুলিয়ে, পা হেলিয়ে না চলে যাতে যা তার সৌন্দর্য গোপন রাখে যে গুলো প্রকাশ হয় সে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

পোশাক সম্পর্কে একটি মূল কথা অবশ্যই সকলকে স্মরণ রাখতে হবে। সে মূল কথাটি বলা হয়েছে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ হে আদম সন্তন, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের জন্যে এমন পোশাক নাযিল করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থানকে আবৃত করে এবং ভূষণও। আর তাকওয়ার পোশাক, সে তো অতি উত্তম-কল্যাণকর। এ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাসমূহের মধ্যে একটি। সম্ভবত লোকেরা এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে।[2]

প্রথমত আয়াতে গোটা জাতিকে-সমস্ত আদম সন্তানদের সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষই এর মধ্যে শামিল অর্থাৎ পরবর্তী কথা সমস্ত মানুষের পক্ষেই অবশ্য পালনীয়।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা পোশাক ও ভূষণ নাযিল করেছেন। পোশাক এমন যা মানুষের স্ত্রী-পুরুষ সকলের লজ্জাস্থানসমূহকে পূর্ণ মাত্রায় আবৃত করে, তার কোনো অংশই অনাবৃত-উলঙ্গ থাকে না, আল্লাহ তাআলা শুধু পোশাকই নাযিল করেন নি সেই সঙ্গে তিনি ভূষণ-শোভাও মানুষের জন্যে নাযিল করেছেন। অন্য কথায়, একটা পোশাক পরাই আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে যথেষ্ট নয়, যবুথবুভাবে দেহাবয়ব আবৃত করলেই চলবে না, সে সঙ্গে তাকে ভূষণ-শোভা বৃদ্ধিকারকও হতে হবে।

ইসলাম ধর্মের আর্বিভাব হয়েছিল, যেন মানব বংশকে সঠিক মর্যাদা পর্যন্ত পৌছানো যায়। যে নারীকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মনে করা হত, যৌন চাহিদার কড়ি হিসেবে ব্যবহার করা হত ও সমাজে যাদের ইজ্জত

---

[1] ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৫৪

[2] আল-কুরআন, সূরা আরাফ, আয়াতঃ ২৬

Dhaka University Institutional Repository

আবরু ছিলো না, তাদের জান-মাল ও ইজ্জত অবরু পূর্ণ সংরক্ষণ করা। ইসলাম একই নির্দেশে বর্বর যুগের সকল সৌন্দর্য প্রদর্শনকে হারাম করে দিয়েছে। তাদেরকে পর্দাকরার নির্দেশ দিয়েছে।

৬। ষষ্ঠ নির্দেশনা

অনুমতি প্রার্থনার মাসআলাকে সতীত্ব রক্ষার ষষ্ঠ নির্দেশনা হিসেবে অবলম্বন করা হয়েছে। বালেগ পুরুষকে মহিলাদের ঘরে বিনা অনুমতি ও অবহিত করা ব্যতীত প্রবেশ করা থেকে বারণ করা হয়েছে। যাতে হঠাৎ মহিলাদের ঘরে ঢুকে তাদেরকে এমন অবস্থায় দেখতে না পায়, যা লজ্জা ও সম্ভ্রমের খেলাপ। যেমন মাথায় কাপড় অথবা ওড়না ফেলে মাথায় তৈল দিচ্ছে বা আপন সাজ-সজ্জায় মশগুল আছে বা নিত্য পরিহিত কাপড় রেখে সাধারণ কাপড় পরে গোসলের প্রস্তুতি নিচ্ছে বা স্বামীর সাথে অন্তরঙ্গ মহূর্তে আছে বা ঘরে একা বা বেপরোয়াভাবে নিদ্রা যাচ্ছে অথবা খোলামেলাভাবে সন্তানকে দুগ্ধদান করছে ইত্যাদি। সূরা নূর-এর মধ্যে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আহকাম রয়েছে। যেমন একস্থানে ইরশাদ হচ্ছে- "হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্যগৃহে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না কর এবং সালাম প্রদান না কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।"[1]

উক্ত আয়াতে সে সকল লোকের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যারা সে গৃহের অধিবাসী নয়। অর্থাৎ, যদি কোনো ব্যক্তি অন্যের ঘরে প্রবেশ করতে চায়, তবে তার জন্য জরুরী, সে যেন অনুমতি প্রার্থনা ও সালাম প্রদান করা ছাড়া প্রবেশ না করে।

বস্তুত আয়াতটিতে মুসলিম-নারী পুরুষের পরস্পরের ঘরে প্রবেশ করার প্রসঙ্গে এক স্থায়ী নিয়ম পেশ করা হয়েছে। মেয়েলোক নিজের ঘরের অভ্যন্তরে সব সময় পূর্ণাঙ্গ আচ্ছাদিত করে থাকা মেয়েদের পক্ষে সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় মুহারম বা গায়েরে মুহারম কোনো পুরুষেরই প্রবেশ করা মোটেই সমীচীন নয়। জানান না দিয়ে মেয়েদের অপ্রস্তুত অবস্থায় গৃহে প্রবেশ করলে নারী দেহের যৌনাঙ্গের প্রতি নজর পড়ে কামভাব জাগ্রত হয়ে নারী-পুরুষের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠে গোটা পরিবারকে তছনছ করে দিতে পারে। তাই ভিন্ন পুরুষের নজর থেকে বাঁচার জন্যই এ ব্যবস্থা ইসলামে পেশ করা হয়েছে।

---

[1] আল-কুরআন, সূরা নূর, আয়াত: ২৭

Dhaka University Institutional Repository

জাহেলিয়াতের যুগে এমন হতো যে, কারো ঘরের দুয়ারে গিয়ে আওয়াজ দিয়েই টপ্ করে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতো, মেয়েদেরকে সামলে নেবারও কোনো সময় দেওয়া হত না। ফলে কখনো ঘরের মধ্যে পুরুষকে একই শয্যায় কাপড় মুড়ি দেওয়া অবস্থায় দেখতে পেত, মেয়েদেরকে দেখত অসংবৃত বস্ত্রে।

এ জন্য কুরআন মজীদে নির্দেশ দেওয়া হয়েছেঃ "সেই ঘরে যদি কোনো লোক না পাও তবে তাতে তোমরা প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না তোমাদেরকে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে। আর যদি তোমাদেরকে ফিরে যেতে বলা হয়, তাহলে অবশ্যই ফিরে যাবে। এ হচ্ছে তোমাদের জন্যে অধিক পবিত্রতর নীতি। তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা পূর্ণ মাত্রায় অবহিত রয়েছেন।"[১]

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী ও হুযায়ফা (রাঃ) বলেছেনঃ মুহারম মেয়েলোকদের কাছে যেতে হলেও প্রথমে অনুমতি চাইতে হবে।

কারো বাড়ির সামনে গিয়ে প্রবেশ করার অনুমতির জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হলে দরজার ঠিক সোমাসুজি দাঁড়ানও সমীচীন নয়। দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে নজর করতেও চেষ্টা করবে না।[2]

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছেঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রাঃ) বলেনঃ "হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কারো বাড়ি বা ঘরের দরজায় এসে দাড়াতেন, তখন অবশ্যই দরজার দিকে মুখ করে সোজা হেয় দাঁড়াতেন না। বরং দরজার ডান কিংবা বাম পাশে সরে দাড়াতেন এবং সালাম করতেন।"[৩]

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ "কেউ যদি তোমার অনুমতি ছাড়াই তোমার ঘরে মধ্যে উঁকি মেরে তাকায়, আর তুমি যদি পাথর মেরে চোখ ফুটিয়ে দাও তাহলে তাতে তোমরা কোনো দোষ হবে না।"[৪]

অনুমতি না পাওয়া গেলে কিংবা ঘরে কোনো পুরুষ লোক উপস্থিত নেই বলে যদি ঘর থেকে চলে যেতে বলা হয় তাহলে অনুমতি প্রার্থনাকারীকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে। তার সেখানে আর দাঁড়ানো

---

[1] আল-কুরআন, সূরা নূর, আয়াত: ২৭

[2] মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খতীব, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, পূর্বোক্ত, পৃ.১২৩

[3] ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৫৩

[4] ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, পূর্বোক্ত, পৃ.৮৮

Dhaka University Institutional Repository

এবং কাতর কণ্ঠে অনুমতি চাইতে থাকা সম্পূর্ণ গর্হিত কাজ। ইসলাম এরূপ কাজের অনুমতি দেয়নি। শুধু নারীর সম্ভ্রম রক্ষা ও হিফাজতের নিমিত্ত।

সে সব লোক যারা ঘরে থাকে এ পর্যন্ত তাদের অনুমতি চাওয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হল। এ পর্যায়ে দেখা যাক শরয়ী বাঁদী এবং নাবালেগ বাচ্চাদের ফজর নামাজের পূর্বে, দ্বিপ্রহরের সময় এবং ইশার পর বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে পারবে না। এছাড়া অন্য যে কোনো সময় আসতে পারবে। এমন কেন? তার কারণ দর্শানো হয়েছে যে, এ তিনটি সময় পর্দা করার সময়। ইরশাদ হচ্ছে- "হে মুমিনগণ! তোমাদের দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্ত-বয়স্ক হয়নি তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে। ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা বস্ত্র খুলে রাখ এবং ইশার নামাজের পর। এ তিন সময় তোমাদের দেহ খোলার সময়। এ সময়ের পর তোমাদের ও তাদের জন্য কোনো দোষ নেই। তোমাদের একে অপরের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয়। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ বিবৃত করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[১]

অর্থাৎ ফজরের নামাজের আগে তাদের নিকট বিনা অনুমতিতে যেয়ো না। হতে পারে, সেই প্রিয় মুহূর্তে এমন এক গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে রয়েছে যে, অজান্তে তাদের সতর খোলা রয়েছে। এ অবস্থা দ্বিপ্রহরে ও হতে পারে যখন সবাই খানা আহার করে বিশ্রাম করে এবং অল্প কিছুক্ষণের অলসতার নিদ্রায় শুয়ে পড়ে। ইশার পর সাধারণতঃ রাত্রকালীন পোশাক পরে সবাই আপন-আপন স্থানে বেপরোয়াভাবে ঘুমিয়ে পড়ে। তাই সে সময়গুলোতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে যে, অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করো না।

পরিবারের অবশিষ্ট লোকদের বিধান হল, যখন আসবে যেন হঠাৎ প্রবেশ না করে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেনঃ "তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা যখন বয়োপ্রাপ্ত হয়, তারাও যেন তোদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় অনুমতি প্রার্থনা করে। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর আয়াত সমূহ তোমাদের নিকট বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[২]

---

[1] আল-কুরআন, সূরা নূর, আয়াতঃ ৫৮।

[2] আল-কুরআন, সূরা নূর, আয়াতঃ ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, যখন ঘরে বসবাসকারী বাচ্চারাও বয়োপ্রাপ্ত হবে এবং জাতিগত অনুভূতি ও যৌন চাহিদার সাথে পরিচয় লাভ করবে, তখন তাদের জন্যও অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে।

"মোদ্দাকথা হল, নিজ ঘরে অবস্থানকারীরাও তথায় যেতে হলে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেন হঠাৎ ঢুকে না পড়ে। হ্যাঁ! আপন ঘর ও অন্য ঘরের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আছে যে, অনুমতি প্রার্থনা আপন ঘরের জন্য মুস্তাহাব, যেন অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে। যাতে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে না হয়। কিন্তু অন্যের ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি চাওয়া শুধু মুস্তাহাব নয়, বরং ওয়াজিব।"[১]

বাকী রইল, প্রথমে অনুমতি চাওয়া বা সালাম দেওয়া। তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও যদি অনুমতি পাওয়া না যায়, তবেই এরূপ করতে হবে। হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) একবার হযরত উমর ফারুকের দাওয়াত পেয়ে তাঁর ঘরের দরজায় এসে উপস্থিত হলেন এবং তিনবার সালাম করার পরও কোনো জবাব না পাওয়ার কারণে তিনি ফিরে চলে গেলেন।

পরে সাক্ষাত হলে হযরত উমর ফারুক বললেনঃ তোমাকে দাওয়াত দেওয়া সত্ত্বেও তুমি আমার ঘরে আসলে না কেন? তিনি বললেনঃ আমিতো এসেছিলাম, আপনার দরজায় দাঁড়িয়ে তিনবার সালামও করেছিলাম। কিন্তু কারো কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে আমি ফিরে চলে এসেছি। কেননা হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেছেনঃ তোমাদের কেউ কারো ঘরে যাওয়ার জন্যে তিনবার অনুমতি চেয়েও না পেলে সে যেন ফিরে যায়।[২]

এর ব্যাখ্যায় ইমাম হাসান বসরী বলেছেনঃ তিনবার সালাম করার মধ্যে প্রথমবার হলো তার আগমন সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া দ্বিতীয়বার সালাম প্রবেশের অনুমতি লাভের জন্যে এবং তৃতীয়বার হচ্ছে ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা। কেননা প্রবেশের অনুমতি লাভের জন্যে এবং ঘরের ভেতর থেকে কারো জবাব না আসা সত্যই প্রমাণ করে যে, ঘরে সালামের জওয়াব দেয়ার মত কোনো পুরুষ নেই।

পুরুষ উপস্থিত নেই-এমন ঘরের মেয়েদের কাছ থেকে যদি কোনো সাধারণ দরকারী জিনিস পেতে হয়; কিংবা একান্তই জরুরী কোনো কথা, কোনো সংবাদ জানতে হয়, তা হলে পর্দার বাইরে দাঁড়িয়েই তা চাইতে হবে, জিজ্ঞেস করতে হবে।

---

1 আল্লামা আব্দুস সামাদ রাহমানী, পূর্বোক্ত, পৃ.-৫৭

2 ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, পূর্বোক্ত, পৃ.৭৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমে সালাম করবে। উক্ত অভিমতের সাথে হযরত কিলদা বিন জুম্বল (রাঃ) একমত প্রকাশ করে বর্ণনা করেছেনঃ "আমি হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর দরবারে হাজির হয়ে না সালাম দিলাম, না অনুমতি নিলাম। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, ফিরে গিয়ে বলঃ আসসালামু আলাইকুম প্রবেশ করার কি অনুমতি আছে?"[১]

৭। সপ্তম নির্দেশনা

সতীত্ব রক্ষার জন্য সপ্তম নির্দেশনা অবলম্বন করা হয়েছে যে, প্রয়োজনে বাইরে গেলে জাহেলিয়াত যুগের মহিলাদের মত বাইরে যেয়োনা। অন্যথা ঘরে থাক। আর যেতেই যদি হয় তবে ইজ্জত আব্রু রক্ষার্থে হিজাবের সাথে যেতে হবে।

ইরশাদ হচ্ছেঃ "এবং তোমরা তোমাদের ঘরের অভ্যন্তরে মজবুত হয়ে স্থিতি গ্রহণ করো-স্থায়ীভাবে বসবাস করো এবং তোমরা প্রথম কালের জাহিলিয়াতের নারীদের মত নিজেদের রূপ সৌন্দর্য ও যৌবনদীপ্ত দেহাঙ্গ দেখিয়ে বেড়িও না।"[২]

আয়াতের প্রথম অংশে মেয়েলোকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন নিজেদের ঘরেই স্থায়ীভাবে দৃঢ়তা সহকারে বসবাস করে। আর দ্বিতীয়াংশে বলা হয়েছে ঘরের বাইরে গিয়ে জাহিলী যুগের নারীদের মত লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে ভিন পুরুষদের সামনে হেসে গলে ঢলে পড় না, নিজেদের রূপ সৌন্দর্য ও যৌবনদীপ্ত দেহের ক্লান্তি দেখিয়ে বেড়িও না, আয়াতের প্রথমাংশে ঘর সম্পর্কে আর দ্বিতীয়াংশ ঘরের বাইরের সাথে সংশ্লিষ্ট।

আয়াতে ঘরে অবস্থান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করা হয়নি, নিষেধ করা হয়েছে জাহেলী যুগের নারীদের মত নির্লজ্জভাবে চলাফেরা করতে।

কুরআন মজীদের উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলিম মহিলাদের সম্বোধন করে বলেছেনঃ তোমাদেরকে তোমাদের প্রয়োজনের দরুন ঘরের বাইরে যেতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে।[১]

---

[1] প্রাগুক্ত, পৃ.-৪৮৭

[2] আল-কুরআন, সূরা আহযাব, আয়াতঃ ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা আলূসীর ভাষায় বলা যায়ঃ মেয়েদেরকে ঘরে অবস্থান করতে নির্দেশ করা হয়েছে, কেননা এরই দ্বারা তাদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সাধারণ মেয়েদের উপর প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এর সঠিক অর্থ এই যে তারা বেশির ভাগ সময়ও সাধারণত ঘরেই অবস্থান করবে এবং তারা খুব বেশি বাইরে গমনকারিণী, খুব বেশি লোকজনের ভিড়ে প্রবেশকারিণী, এবং হাটে-ঘাটে, দোকানে বিপণীতে ও লোকজনের ঘরে ঘরে যাতায়াতকারিণী হবে না।

উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে "তাবাররুজ" করো না। এ তাবাররুজ শব্দের ব্যাখ্যায় আল্লামা জামালুদ্দীন আল-কাসেমী লিখেছেনঃ

'তাবাররুজ' মানে-হাস্যলাস্য ও লীলায়িত ভঙ্গীতে চলা, রূপ-সৌন্দর্যের প্রদর্শণী করা, ভিন্ পুরুষের মনে যৌন স্পৃহা জাগিয়ে তোলা, খুব পাতলা ফিনফিনে কাপড় পরা-যা মেয়েদের শরীর আবৃও করে না, গলদেশ, কণ্ঠহার ও কানের দুল-বালার চাকচিক্য জাহির করা এবং এ ধরনেরই অন্যান্য কাজ।

মুবরাদ বলেনঃ মেয়েলোকের যে রূপ-সৌন্দর্য ঢেকে রাখা কর্তব্য, তাকে জাহির করাই হচ্ছে 'তাবাররুজ'।[1]

এ প্রসঙ্গে আল্লামা শাওকানী লিখেছেনঃ জাহিলিয়াতের যুগে মেয়েরা তাদের দেহের অশ্লীল অঙ্গসমূহ উন্মুক্ত ও অনাবৃত করে চলত। এমন কি এক একজন মেয়েলোক তার স্বামী ও প্রণয়ীকে নিয়ে একসঙ্গে বসত। প্রণয়ী তার বস্ত্রের উপরিভাগ নিয়ে সুখ ভোগ করতো আর স্বামী পরিতৃপ্ত হত তার দেহের বস্ত্রাবৃত নিম্নভাগ ব্যবহার করে। আবার কখনো কখনো একজন অপর জনের কাছ থেকে তার জন্যে নির্দিষ্ট অংশ অদল বদল করে নিতেও চাইত।[2]

এসব উদ্ধৃতি থেকে জাহেলিয়াতের নারী চরিত্র ও তদানীন্তন সমাজের বাস্তব ও প্রকৃত চিত্র উদঘাটিত ও উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে। মেয়েরা ঘর থেকে বেরুতে পারে। আয়াতে তা নিষেধ করা হয়নি, নিষেধ করা হয়েছে বাইরে গিয়ে এসব কাজ করতে, যা উপরের উদ্ধৃতিসমূহ থেকে প্রতিভাত হচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে এই হচ্ছে জাহিলিয়াত-জাহিলিয়াতের "তাবাররুজ" যার সাথে এ যুগের সভ্যতা সংস্কৃতিসম্পন্না নারী সমাজের পূর্ণ মিল ও সাদৃশ্য স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে হাটে বাজারে, দোকানে-বিপণীতে পথে-পার্কে, হোটেল-রেস্তোরায় ও ক্লাবে-মিটিং এ। আর কুরআন মজীদে উপর্যুক্ত

---

[1] মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, পূর্বোক্ত, পৃ.২৮০

[2] ইবনে হাজার আসকালানী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৯

Dhaka University Institutional Repository

আয়াতাংশে এসব কাজকেই নিষেধ করা হয়েছে, চিরতরে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। যদিও হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) মেয়েদের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। পক্ষান্তরে একথাও বলেছেনঃ "তাদের জন্য তাদের গৃহে অবস্থানই মঙ্গলজনক।"[১]

নামাযের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ইবাদতের জন্যও নারীদেরকে জামাআতে শামিল হওয়ার নিমিত্তে উৎসাহিত করা হয় নাই।

হযরত উম্মে হুমায়দ সাইয়িদা (রাঃ) বলেঃ হে আল্লাহ রাসূল! আপনার সাথে নামাজ পড়তে আমার মন চায়। তিনি বললেনঃ আমি জানি। কিন্তু তোমার নিজের কামরায় নামাজ পড়া অপেক্ষা এক নিভৃতস্থানে নামায পড়া তোমার জন্য উৎকৃষ্ট। তোমার মহল্লার মসজিদে নামায পড়া অপেক্ষা তোমার বাড়িতে নামায পড়া উৎকৃষ্ট এবং জামে'মসজিদে নামায হতে তোমার মহল্লার মসজিদে নামাজ পড়া উৎকৃষ্ট।[২]

অপর এক হাদীসে আছে- "নারীর স্বীয় কামরায় নামাজ অপেক্ষা নিভৃত কক্ষে নামায উৎকৃষ্ট।[৩] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরও বলেনঃ "গৃহের কোণই নারীদের জন্য উত্তম মসজিদ।"[৪]

এর অর্থ হলো গৃহের কোণে নামায পড়লেই নারীদের জন্য মসজিদে জামায়াতে নামাজ পড়ার সওয়াব মিলবে। অর্থাৎ নারীর মসজিদে গিয়ে নামায পড়ার অনুমতি থাকলেও পর্দার খাতিরে তাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছ। এভাবে ঘরের বাইরে না যেয়ে বা প্রয়োজনে গেলেও তার সীমা নির্ধারণ করে দিয়ে ইসলাম নারীর আবরু ও সম্ভ্রম রক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা করেছে।

নারীদের ইজ্জত আবরু ও সতীত্ব রক্ষার নিমিত্তে আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ হচ্ছে- "তারা নিজের গৃহে থাকবে। পাপের বাসনা নিয়ে বাহিরে যাবে না, যেমনটি ছিলো জাহেলী যুগে" উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য মোটেই এই নয় যে, হাত-পা বেধে ঘরে বসে থাকবে এবং বাইরে যেতে পারবে না।

---

[১] ইমাম বুখারী, *সহীহ*, পূর্বোক্ত, পৃ.৬৩৫

[2] ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল মুসনাদ*, পূর্বোক্ত, পৃ.৭৬-৭৭

[3] ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৫৪

[4] ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদে আহমদ*, পূর্বোক্ত, পৃ.-২৯৮

Dhaka University Institutional Repository

তাফসীরে মাযহারীতে আছেঃ সারকথা হল, "গৃহভ্যন্তরে অবস্থান করবে" এর উদ্দেশ্য কখনো এই নয় যে, হজ্জ করার জন্য মক্কা শরীফে যাবে না। মাতা-পিতার সাথে সাক্ষাতের জন্য তাদের নিকট যাবে না এবং স্বীয় প্রয়োজন পূরণ বাইরে যাবে না। কিন্তু জরুরী হল, প্রত্যেক কাজ সে সীমাসমূহের মধ্যেই হবে, সেগুলোর সাথে যেগুলোকে সীমিত করা হয়েছে। যেমন হজ্জের সফর অবশ্যই করবে, কিন্তু মাহরাম ছাড়া নয়।[1]

আলোচ্য আয়াত হতে বুঝা যায়, নারী গৃহেই অবস্থান করবে এবং ইহাই তার কর্মক্ষেত্র। কিন্তু অনিবার্য কারণে সে গৃহের বের হতে পারবে। তবে বিনা প্রয়োজনে রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্য বের হতে পারবে না। দরকার বশতঃ গৃহের বের হতে হলে নারীর অবশ্য পালনীয় বিষয় এইঃ

১। দূরের রাস্তা হলে কোনো মুহরিম পুরুষকে সঙ্গে নিতে হবে।

২। সাজসজ্জা ও সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করা এবং অলংকারাদির ঝন-ঝনানি শব্দ শোনানো যাবে না।

৩। এমন মিহি পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা যাবে না যার মধ্য দিয়ে দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখা যায় এবং গোটা দেহে চাদর তথা বোরখা দিয়ে ঢেকে নিতে হবে।

৪। পরিধেয় বস্ত্র এমন আট-সাট হবে না যেন দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিলক্ষিত হয়।

৫। কারো সাথে কথা বলতে হলে কোমল কণ্ঠে লালিত্য ও নমনীয়তার সাথে কথা বলবে না।

৬। অমুসলমান ও পুরুষের পোশাক পরিধান করতে পারবে না।

৭। আল্লাহ তাআলা ভীতি ও লজ্জা শরম সর্বদা অন্তরে থাকতে হবে।

৮। প্রয়োজন শেষ হলে অনতিবিলম্বে নিজগৃহে ফিরে আসতে হবে।

যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা দমন ও নারীর শালীনতা সংরক্ষণের ইসলামী বিধান অতিসংক্ষেপে উপরে বর্ণিত হল। পূর্ববিকারহীন উন্মুক্ত মন ও সুস্থ প্রকৃতি অতিসহজেই বুঝতে পারবে, এটি দার্শনিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং গোটা মানবতার কল্যাণে অবশ্য পালনীয়। ইসলাম যৌন বাসনাকে বিনষ্ট করতে চায় না; বরং একে সুসংযত মধ্যপন্থায় এনে মানব বংশ এবং সভ্যতা রক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রদান করে। আজকাল নারীদের স্কুল কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। কারণ সামাজিক,

[1] মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, পূর্বোক্ত, পৃ.২৮৭

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাদি বুঝে জীবন সংগ্রামে তাদেরকে অংশগ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় তাদেরকে প্রতিবেশী জাতি সমূহের পেছনে পড়ে থাকতে হবে। এই অজুহাতে কেউ কেউ হয়তবা নারী শালীনতার ইসলামী বিধান কিছুটা শিথিল করা আবশ্যক মনে করতে পারে। মেয়েদের উপযোগী শিক্ষা অবশ্যই তাদেরকে দিতে হবে, ইহা কেউই অস্বীকার করে না। কিন্তু ইসলামী বিধান রক্ষা করে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা অনায়াশেই করা যায়। তাদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। এতে নারী পুরুষ অবাধ মেলামেশার পথ ও রুদ্ধ হয়। সময় ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আইনের কঠোরতা কিছুটা লাঘব করা যেতে পারে। তবে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকেই এর আবশ্যকতা যাচাই করতে হবে। আইনের কঠোরতা কেবল তখনই লাঘব করা যেতে পারে যখন আইনের আসল উদ্দেশ্য এতে বিনষ্ট না হয়ে পড়ে। দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতা রক্ষা, অপরিমিত যৌনবাসনা দমন এবং যৌন উশৃঙ্খলতা প্রতিরোধকল্পেই ইসলাম নৈকিত শিক্ষা এবং প্রতিরোধ ও শাস্তিমুলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে।

অধুনা ও অমুসলিম সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং জাহেলিয়াত গোটা দুনিয়া আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। অনৈসলামী জীবন পদ্ধতি, ইসলাম বিরোধী মতবাদ ও ধ্যান-ধারণা জগতের সাংস্কৃতিক আবহাওয়া বিষাক্ত করে তুলেছে। অশ্লীল ও নগ্ন ছবি, নৃত্য-গীত, প্রেমিক প্রেমিকার অবাধ মিলন এবং প্রেম নিবেদনের দৃশ্য এখন সমাজে প্রায় সকলের নিকটই সহনীয় ও উপভোগ্য হয়ে পড়েছে। নারী হরণ ও নারী ধর্ষণের ন্যায় অপরাধ উত্তরোওর বৃদ্ধিই পাচ্ছে।[১]

আর পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার বদৌলতে বিবাহ একটি সেকেলে প্রথা, নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা নির্দোষ ও প্রশংসনীয় এবং ব্যভিচার এক প্রকার চিত্ত বিনোদন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব পালন অসহনীয় বন্ধন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ এবং স্ত্রী হওয়াটা বিপদ ও স্বামীর আনুগত্য বর্বরযুগের দাসত্ব বলে পরিগণিত হয়েছে। সন্তান জন্মদানে সাধারণত অনীহার সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রেমিক প্রেমিকা সেজে থাকাই জীবনের পরম সার্থকতা বলে মনে করা হচ্ছে।

অবস্থা যখন এমন সঙ্গীন হয়ে পড়েছে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা দমন ও নারী শালীনতা সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা ইসলাম প্রদান করেছে, পরিস্থিতি এতে কিছুটা শিথিলতার অনুমতি দেয় বেল আমরা মনে করিনা; বরং অধিকতর কড়াকড়িই দাবি করে বলে আমার বিশ্বাস।

---

১ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, পূর্বোক্ত, পৃ.২৮৬

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বেই বলা হয়েছে, যৌন বাসনা একটি সহজাত প্রবৃত্তি। ইসলাম একে সংযত করে কল্যাণমূলক কাজে লাগাতে চায়; বিনষ্ট করতে চায় না। এ উদ্দেশ্যে সাধনের জন্যই ইসলাম বিবাহ প্রথা চালু করেছে এবং যৌন নোংরামী বন্ধ করেছে।[১]

সর্বোপরি আমরা বলতে পারি ইসলাম পর্দাপ্রথা চালুর মাধ্যমে নারীর শালীনতা ও সম্ভ্রম রক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

---

[১] মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, পূর্বোক্ত, পৃ.২৮৯

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়ঃ বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের কারণ ও প্রকৃতি

নারী নির্যাতন

বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাসমূহের মধ্যে নারী নির্যাতন অন্যতম। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই এ দেশে নারী পরিবারে ও সমাজে নানা ধরনের নিপীড়নের শিকার হয়ে আসছে। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় নারী নির্যাতনের অস্তিত্ব শুরু থেকেই ছিলো। দৈহিক দিক থেকে নারীরা পুরুষদের অপেক্ষা দুর্বল এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে পুরুষের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় পুরুষ সমাজ নারী সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তারের এবং নানাভাবে তাদের উপর নিপীড়ন চালিয়ে আসছিলো। মাতৃজাতির প্রতি অবজ্ঞা এবং তাদের সম্পর্কে ভুল ধারণার কারণে নারী নির্যাতনের ঘটনা নিয়ম রক্ষার মতই বাংলাদেশে ঘটত। তবে তখন একে সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হতো না। অতি সম্প্রতি নারী নির্যাতনকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। মানবাধিকার খর্ব, বৈষম্য, দমন, অসহায়তা ইত্যাদি বাংলাদেশের নারীদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ। এর মতই নারী জীবনের অনিবার্য অনুসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে অমানবিক, লোমহর্ষক, ভয়ঙ্কর ও কুৎসিত নানা রকম নির্যাতন। বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের এ হার প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিদিন ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া সূত্রে নারী নির্যাতনের যে সকল সংবাদ জানা যায় তা আতঙ্কিত হওয়ার মত এবং পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য। স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সরকার নারী নির্যাতনে নানা বিধান ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে, বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শেষে প্রচলিত আইনে নারী নির্যাতনমূলক অপরাধ দমন অসম্ভব হওয়ায় স্বতন্ত্র নারী নির্যাতন আইন প্রণয়ন করেছে। ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮৪ সালের নারী নির্যাতন নিবর্তকমূলক আইন (শাস্তিযোগ্য) ও বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন (সংশোধিত অর্ডিন্যান্স), ১৯৮৫ সালের সংশোধিত মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ ১৯৬১ ও পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৯২ সালের সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশ, ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এবং ২০০৯ সালের যৌন হয়রানি রোধক হাইকোর্টের রায় বাংলাদেশের নারী নির্যাতন হ্রাসে কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। এ সকল বিশেষ আইনের সাথে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে প্রণীত নারী অধিকার রক্ষা ও নির্যাতন বিরোধী আন্তর্জাতিক আইন। কিন্তু নারী নির্যাতনের বিভীষিকা আগের মতই বাংলাদেশের নারীসমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। এমনি প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের নারী নির্যাতন নিরসনে দেশের বর্তমান সমাজ কাঠামো বহাল থাকা অবস্থায় ইসলামী আইনের প্রয়োগ নতুনভাবে মূল্যায়নের

Dhaka University Institutional Repository

দাবি রাখে। কারণ আইয়ামে জাহিলিয়া যুগে নারী জাতি যখন বর্তমানে বাংলাদেশে যে পরিমাণ নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তারচেয়ে বহুগুণ বেশি ভয়ঙ্কর ও অমানবিক নিপীড়নের শিকার হয়েছিলো তখন ইসলামী মূল্যবোধ ও আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে তাদেরকে নির্যাতন থেকে কেবল রক্ষাই করা হয়নি বরং অধিষ্ঠিত করা হয়েছিলো সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে। পৃথিবীর সকল সন্তানের জান্নাত ছিলো নারীর পায়ের নিচ, সব স্বামীর শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি ছিলো নারীর স্বীকৃতি, পৃথিবীর সব পিতার সন্তান কামনার শীর্ষে ছিলো নারী। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মে নারী পরিণত হয়েছিলো আভিজাত্য ও মর্যাদায় ভাস্বর এক অনন্য চরিত্র। বর্তমান বিশ্বে নারী মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় নানা আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা সৃষ্টির জন্য ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করা হয়। নারীদের শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশও যুক্ত হয়েছে এ ধারায়। সকল ক্ষেত্রে নারীকে অগ্রাধিকার দেয়ার বিধান রেখে বাংলাদেশে নারী আইন প্রণীত হয়েছে। একজন পুরুষ স্নাতক উত্তীর্ণ না হলে বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য আবেদনও করতে পারে না। কিন্তু মাধ্যমিক উত্তীর্ণ নারী আবেদন করতে পারে। পুরুষের লেখাপড়া কোনো স্তরেই এককভাবে অবৈতনিক নয়। কিন্তু নারীর শিক্ষা দ্বাদশ পর্যন্ত অবৈতনিক। নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য দেশে নানা রকম উপবৃত্তি চালু রয়েছে। নারীকে দেয়া হচ্ছে লেখাপড়ার বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের সুবিধা। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং সকল ক্ষেত্রেই নারীরা সাধারণভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। দেশের সরকারি দল ও বিরোধী দলের নেত্রী দুজনই নারী হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে নারী নির্যাতন একেবারেই কমেনি। ইসলামী রাষ্ট্র হলে এমনিতেই এ অবস্থা বদলে যেতো। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক কাঠামো বহাল রেখে ইসলামের বিধানের আলোকে কীভাবে নারীকে নির্যাতন থেকে রক্ষা করা যায় এ পর্যায়ে সে কর্মকৌশল নির্ণয় করা হবে।

নারী হলো স্ত্রীলোক; রমনী; মহিলা।[১] নির্যাতন হলো পীড়ন; উৎপীড়ন; নিগ্রহ; অত্যাচার; প্রহার; প্রতিহিংসা।[২] প্যাসিফিক এশিয়ান উইম্যানস ফোরামে নারী নির্যাতন বিষয়ক আলোচনায় নিপীড়ন বা ভায়োলেন্সের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে, "কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর যখন অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠী

---

[১] ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা ১৯৯২, পৃ. ৬৭৮

[২] প্রাগুক্ত, পৃ.৬৯৫

Dhaka University Institutional Repository

হুমকি বা বল প্রয়োগ করে তাকে নির্যাতন বলে।[১] নারী নির্যাতন বলতে তাই যে কোনো বয়সের যে কোনো সম্পর্কের নারীকে নিগ্রহ, অত্যাচার ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা বুঝায়। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো molestation/persecution of a woman.[২] Women's Oppression[৩] Crutelty to Women.[৪] তবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রণীত সকল সংবিধান, দেশে-বিদেশে নারী মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষায় সকল গোষ্ঠী ও আন্দোলনে নারী নির্যাতন বুঝাতে সাধারণভাবে Violence against Women পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয়েছে।[৫]

সাধারণভাবে নারী নির্যাতন বলতে পুরুষ কর্তৃক নারীদেরকে কোনো না কোনো প্রকারে কষ্ট দেয়াকে বুঝায়। ব্যাপক অর্থে নারী নির্যাতন বলতে নারীদের উপর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক যে কোনো ধরনের নিপীড়ন ও নির্যাতনকে বোঝায়, নারীর যে কোনো অধিকার খর্ব বা হরণ করা এবং কোনো নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো বিষয় চাপিয়ে দেয়া বা কোনো ব্যক্তি গোষ্ঠীর ইচ্ছানুসারে কাজ করতে বাধ্য করাও নারী নির্যাতনের অন্তর্গত। সর্বজনীন নারী অধিকারের সুস্পষ্ট লংঘনমূলক অপরাধ নারী নির্যাতন। ধারণাগতভাবে এটি আবার নারীর প্রতি সহিংসতা, নিপীড়ন এবং নারীর সাথে অপব্যবহার ইত্যাদিও বুঝায়। এটি সমাজে মহিলাদের প্রতি অমানবিক ও অনৈতিক আচরণের মধ্যেও প্রকাশ পায়। এর একটি সহজ সংজ্ঞা হলো, ".... all forms of cruelty and repression on women of all ages.[৬]

---

[১] প্যাসিফিক এশিয়ান উইমেনস ফোরামের নারী নির্যাতন বিষয়ক আলোচনায় প্রদত্ত নিপীড়ন বা ভায়োলেন্সের সংজ্ঞা। ড. মোঃ নুরুল ইসলাম উদ্বৃত, *বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা*, ঢাকা: তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, আগস্ট ২০০৬, পৃ.৩৩১

[২] Bengali-English Dictionary, Dhaka 1998, p.357

[৩] ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ইফাবা, ঢাকা ২০০৪ পৃ.৫২৩

[৪] ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা*, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৩০

[৫] সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *সামাজিক সমস্যা ও বিশ্লেষণ কৌশল*, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ.২৩৬; ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা*, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৩০; জাতীসংঘ প্রণীত সকল বিধি-উপবিধিতে শব্দটির সাধারণ ব্যবহার থেকেও এ সম্পর্কে জানা যায়।

[৬] Dr. Mohammad Abdur Rob and Mostaq Mohammad, *Violence against city women*, The Independent, 10 September 1999, Dhaka

Dhaka University Institutional Repository

এভাবেও বলা যায়, "These forms of violence frequently occur in private in the home and police and other criminal justice agencies have been reluctant to define such violence as criminal or to respond to such family matter."[১]

কারো কারো মতে, "পুরুষ শাসিত সংস্কৃতিতে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে নারীর প্রতি পুরুষের সহিংসতা হলো নারী নির্যাতন।[২] একই দৃষ্টিভঙ্গিতে সি. বানচ অনুরূপ বক্তব্য দেন। তাঁর কথায়, "নারী নির্যাতন – তা যে ধরনেরই হোক না কেনো – কোনো বিক্ষিপ্ত বিষয় নয় এবং যৌনতা সম্পর্কিতও নয়। এই নির্যাতনের একটা সুনির্দিষ্ট সামাজিক উদ্দেশ্য আছে এবং তা হচ্ছে নারীর জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে রাখা।[৩]

১৯৯৫ সালে বেজিং-এ অনুষ্ঠিত নারী বিষয়ক চতুর্থ বিশ্ব সম্মেলনের Platform for Action (PFA)-এ নারী নির্যাতনকে নির্দিষ্ট করে বলা হয় তা হলো, "....any action of gender violence that results in or is likely to result in physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion of arbitrary deprivation of liberty whether occurring in public or private life.[৪]

২০০২ সালে ঢাকায় আয়োজিত 'Sub-Regional Expert Group Meeting on Eliminating Violence Against Women' শীর্ষক সম্মেলনে নেপালের সেন্টার ফর উইম্যান এন্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের কান্ত্রি রিপোর্টে নারী নির্যাতন সম্পর্কে বলা হয়, নারী নির্যাতন শুধু কোনো ব্যক্তির উপর আক্রমণাত্মক বিশেষ কিছু নয় বরং নারীর বিরুদ্ধে মানসিক অথব

[১] Edllar, Quoted by Abdul Halim, *The Enforcement of Human Rights*, Dhaka 1995, p.50

[২] Prigfe, Ibid

[৩] সি. বানচ, "দুর্বিসহ স্থিতাবস্থা : নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা, উদ্ধৃত: ইউনিসেফ, *বাংলাদেশের শিশু ও তাদের অধিকার*, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ.৬০

[৪] Quoted by Syed Mehdi Momin, *Violence against women and children : searching for causes*, Weekend Independent, 12 February 1999, Dhaka p.4

Dhaka University Institutional Repository

শারীরিক অথবা স্বাধীনভাবে চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণ।[১] রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নারীরা যখন অন্যের দ্বারা জোরপূর্বক বঞ্চনার সম্মুখীন হয় এবং শারীরিক, যৌন ও মানসিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়, সে পরিস্থিতিকে নারী নির্যাতন বলে।[২]

১৯৯৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত বিশেষ প্রতিবেদনে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বা নির্যাতনকে সংজ্ঞায়িত করে বলা হয়েছে, নারী নির্যাতন হলো শারীরিক, মানসিক, জোরপূর্বক যৌন সম্পর্ক এবং মানবাধিকার লংঘনমূলক ব্যবস্থা।[৩]

নারী নির্যাতন এমন একটি লিঙ্গীয় অপরাধমূলক কাজ যার ফলে নারীর লিঙ্গীয় অথবা মানসিক ক্ষতি হয় অথবা ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া এ ধরনের দুষ্কর্ম ঘটানোর হুমকি দেয়া, নানা রকম জোর-জবরদস্তি করা চলাচলের বিঘ্ন ঘটানো নির্যাতনের সংজ্ঞায় পড়ে। এ অপরাধমূলক কর্ম যেখানেই সম্পন্ন হোক না কেনো (যেমন গৃহাভ্যন্তরে অথবা প্রকাশ্য রাজপথে) তা নারী নির্যাতন হিসেবেই গণ্য হবে। এ সংজ্ঞানুযায়ী শারীরিক, মানসিক, লিঙ্গীয় নির্যাতন যেমন যৌতুক অনাদায়ে নির্যাতন, ধর্ষণ, নারীর পাচার ও লিঙ্গীয় শোষণ, স্ত্রীকে মারধোর করা, নারী ও কন্যা শিশু ধর্ষণ ও শারীরিক অত্যাচার, যৌন হয়রানী করা ও পতিতা বৃত্তিতে নিয়োজিত করা ইত্যাদি অপরাধমূলক কাজ হিসেবে চিহ্নিত হবে।

নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, জাতিসংঘ ১৯৭৫ সাল থেকে বিশ্ব জুড়ে সব দেশের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধিদের এ বিষয় নিয়ে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন করেছে। প্রতিবছর এ বিষয়ের উপর আলোচনা, বিতর্ক

---

[১] "Violence against women is not just an assault against an individual but against women's personhood, mental or physical integrity or over freedom of movement on account of their gender."- Jyoti Talukder, *Violence Against Women in Nepal,* Country Report CWCD, Nepal, 1997, p.1

[২] Violence against women is well-defined as any act of gender based violence that results or is likely to result in physical, sexual, psychological harm or suffering to women including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life.-Ibid

[৩] "Gender violence is a violence against women that results in physical, mental, sexual coercion of human rights. - United Nation, *The Worlds Women Trends and Statistics, 1995*

Dhaka University Institutional Repository

ও সুপারিশ চলছে। ২০ বছর পর ১৯৯৪ সালে পৃথিবীর সব দেশের সরকারি–বেসরকারি প্রতিনিধিরা সকলে একমত হয়ে একটি অবশ্য পালনীয় দলিল তৈরি করেছেন। এটি হলো বেইজিং প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশন। এই দলিলের বিশ্লেষণ ও ঘোষণাটি নিম্নরূপ: "নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা হলো নারী ও পুরুষের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে বিরাজমান অসম ক্ষমতা সম্পর্কের একটি বহিঃপ্রকাশ, যা নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও নারীর বিরুদ্ধে পুরুষের বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। নারীর পরিপূর্ণ অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করেছে।[১]

বেইজিং ঘোষণা অনুযায়ী নারী নির্যাতন বলতে এমন যে কোনো কাজ অথবা আচরণকে বুঝায় যা নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত করা হয় এবং নারীর শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতি সাধন করে। এছাড়াও এ ধরনের কোনো ক্ষতি সাধনের হুমকি, জোরপূর্বক অথবা খামখেয়ালিভাবে সমাজ অথবা ব্যক্তিগত জীবনে নারীর স্বাধীনতা হরণকেও বুঝায়। নারী নির্যাতন বা নিগ্রহ বলতে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোকে বুঝিয়ে থাকে:

১। পরিবারের অভ্যন্তরে শারীরিক, যৌন অথবা মনস্তাত্ত্বিক নির্যাতন যেমন প্রহার, কন্যা শিশুর উপর যৌন নিগ্রহ, যৌতুক সংক্রান্ত নির্যাতন এবং অন্যান্য প্রথাগত যন্ত্রণাদায়ক রীতি, স্বামী ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির যৌনাচারণ এবং নারীকে কোনো কাজে অন্যায়ভাবে ব্যবহারের জন্য নির্যাতন;

২। সম্প্রদায়ের মধ্যে নারীর প্রতি শারীরিক, যৌন অথবা মনস্তাত্ত্বিক নির্যাতন যেমন ধর্ষণ, যৌন নিগ্রহ, যৌন হয়রানী এবং কর্মক্ষেত্রে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভীতিপ্রদর্শন, নারী অপহরণ এবং জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা;

৩। রাষ্ট্র কর্তৃক শারীরিক, যৌন এবং মনস্তাত্ত্বিক নিগ্রহ তা যেখানেই ঘটুক না কেনো। অতএব নারীর প্রতি সহিংস আচরণ বা নারী নির্যাতন বলতে সশস্ত্র সংঘর্ষের সময় হত্যা, পরিকল্পিত ধর্ষণ, যৌন দাসত্ব এবং জোরপূর্বক গর্ভধারণকে বুঝায়।[২]

বর্তমানে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের অবস্থান প্রান্তিক। এই প্রান্তিকতা সমাজ ব্যবস্থার স্তর বিন্যস্ত কাঠামো থেকে তৈরি হয়েছে। অপরপক্ষে, এই প্রান্তিকতার দুটি উপাদান অধস্তনতা এবং

---

[১] জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলন – বেইজিং, ঢাকা ১৯৯৫, ড. মোঃ নুরুল ইসলাম উদ্বৃত, *বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা*, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৩২

[২] বেইজিং প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশন ১৯৯৫, ড. মোঃ নুরুল ইসলাম উদ্বৃত, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৩২

Dhaka University Institutional Repository

নির্যাতন স্তর বিন্যস্ত কাঠামোজনিত কারণে শক্তিশালী হয়েছে। সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের অবস্থা প্রান্তিক। সে স্তর বিন্যস্ত কাঠামোর মধ্যে তাদের অবস্থা অধস্তন এবং এ অবস্থার কারণে তারা নির্যাতিত। অধস্তনতা এবং নির্যাতন পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে শোষণের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলে। এই সাংস্কৃতিক পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে শোষণের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলে। এই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে শোষণ অর্থনৈতিক শ্রেণী কাঠামো এবং পিতৃতন্ত্র পরস্পরকে প্রবিষ্ট করে তোলে। এর ফলে পুরুষরা নারীদের শ্রম লুণ্ঠন করে কিংবা নারীদের শ্রমের অর্থ ভোগ করে। এদিক থেকে নারীগণ ত্রিবিধভাবে শোষিত ক) তারা মানুষ হিসেবে পুরুষ কর্তৃক শোষিত, খ) তারা গৃহবধূ হিসেবে পুরুষ কর্তৃক শোষিত এবং গ) তারা বেতনভুক্ত হিসেবে শোষিত।[১]

নারী নির্যাতন সমস্যার ব্যাপকতা, গভীরতা ও ভয়াবহতার কথা চিন্তা করে ১৯৯০ সালের ৮ মার্চ থেকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস সারা বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই দিবসের প্রেক্ষিতেই আজকের নারী সমাজ তাদের অধিকার ও প্রাপ্তি সম্পর্কে সচেতন হতে শিখেছে। যদিও ধর্ষণ, হত্যা এবং নানা প্রকারের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এখন নিত্যদিনের ঘটনায় রূপান্তরিত হয়েছে। নারীর প্রতি নির্যাতনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা আর একই সাথে প্রশাসনের বিরূপ আচরণ। এ ক্ষেত্রে বলা যায়, ১৯৯৫ সালে পুলিশ কর্তৃক ইয়াসমিন ধর্ষণ ও হত্যার বিষয়টি সারা দেশের বিবেককে আঘাত করেছে। ১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাসে রাউজান থানা পুলিশের দ্বারা গার্মেন্টস কর্মী সীমা চৌধুরী ধর্ষিত হয়েছিলো। আবার এই মামলার বিচার চলাকালীন অবস্থায় সীমা চট্টগ্রাম জেলের তথাকথিত নিরাপদ হেফাজতে থাকাকালানী অবস্থায় ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ তারিখে রহস্যজনকভাবে মৃত্যবরণ করে।[২]

নারী নির্যাতনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় Status of Women প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

"Violence against women is alarmingly on the increase. The Bangladesh Bureau of Statistics, in a special report in 1993 revealed that death due to unnatural causes (suicides, murder, burn, snake bite, accident and

---

[১] বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর ও জরিনা রহমান খান, *বাংলাদেশে নারী নির্যাতন*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩, পৃ.৩

[২] সম্মিলিত নারী সমাজ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ৮ মার্চ ১৯৯৭, ড. মোঃ নুরুল ইসলাম উদ্বৃত, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৩৩

Dhaka University Institutional Repository

drowning) in almost three times higher for women that pregnancy related causes.[১]

নারী নির্যাতন স্থান-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন ধরন ও প্রকৃতির হয়ে থাকে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি হলো আঘাত করা বা অপব্যবহার, যৌতুকের জন্য দৈহিক ও মানসিক চাপ, মানসিক নিপীড়ন, অপহরণ, বউ পেটানো, যৌন নিপীড়ন বা অপব্যবহার, জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ, বিদেশে পাচার, অন্যায়ভাবে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদ এবং ধর্ষণ করতে গিয়ে জখম বা মৃত্যু ঘটানো ইত্যাদি অপরাধের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। নারী নির্যাতনের একটি সাধারণ ধরনগত শ্রেণীগত বিন্যাস এমন হতে পারে:[২]

১। স্বামী বা তার আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক বিবাহিত মহিলার উপর নিপীড়ন ও দৈহিক আঘাত;

২। মৌখিকভাবে নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন এবং খাদ্য ও অন্যান্য সুবিধা থেকে বঞ্চনা;

৩। উৎপীড়ন;

৪। এসিড নিক্ষেপ;

৫। অপহরণ ও পাচার;

৬। ইভটিজিং বা যৌন উৎপীড়ন ও হয়রানি;

৭। যৌন ব্যবসায় সরবরাহ ও নিয়োজিতকরণ;

৮। পতিতাবৃত্তিতে বাধ্যকরণ;

৯। পারিবারিক ঝগড়া বা ধর্ষণের জন্য মৃত্যু;

১০। সামাজিক নির্যাতন যেমন একঘরে করে রাখা;

১১। কর্মক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার ভোগ ও সুযোগ-সুবিধার বঞ্চনা;

---

[১] Government of Bangladesh, Planning Commission, 1998 Fifth Five Year Plan 1997-2002, Ministry of Planning, p.IX, 1-5

[২] Syed Mehdi Momin, ibid, p.4

Dhaka University Institutional Repository

১২। স্বাধীন প্রজনন অধিকারে নিয়ন্ত্রণ আরোপ এবং

১৩। ধর্ষণ।

বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের কারণ

বাংলাদেশে নানাবিধ কারণে নারী নির্যাতন হয়। নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে বাংলাদেশে যে সমাজ কাঠামো ও মানসিকতা তৈরি হয়েছে, তা অনেকাংশে নারী নির্যাতনের অনুকূল। এর সঙ্গে পিতৃতান্ত্রিকতা, শিক্ষা ও অর্থনীতিতে নারীর দুর্বল অবস্থান, মানবিক শিক্ষার অভাব, পরিবার কর্তার ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, দারিদ্র্য, যৌতুক প্রত্যাশা এবং সাংস্কৃতিক দৈন্যদশার মত সামাজিক বিষয়াদি একটি জটিল মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে এ দেশে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটিয়ে থাকে। নানাভাবে এ কারণগুলো বিশ্লেষণ করা যায়।

১। **সমাজব্যবস্থাগত কারণঃ** সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নারী অধঃস্তনতাকে নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সমাজে এতে পিতৃতান্ত্রিকতা নারীকে গৃহাভিমুখী করে এবং তার সামাজিক অবস্থান লিঙ্গভিত্তিক হীনমন্যতা, অসমতা ও অধঃস্তন অবস্থায় ফেলে জটিল মনস্তাত্ত্বিক বন্ধাত্বে আবদ্ধ করে রাখে বলে দাবি করা হয়। এভাবেই ঘটে নারীর সামাজিকীকরণ ও পুরুষ কর্তৃক নারী ভাগ্য বরণ। এ ধরনের সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশে নারী নির্যাতনের সমর্থন দায়ক অনেক কারণ বিদ্যমান, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হলোঃ রাজনীতির ক্ষেত্রে নারীর পশ্চাৎমুখী অবস্থান, লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজন, সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর প্রান্তিক অবস্থান ও সমাজ-সৃষ্ট নারী, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর কম সম্পৃক্ততা ও নারীর দরিদ্রতা, নারীকে পণ্য হিসেবে উপস্থাপন, শারীরিক গঠন কাঠামো ও দুর্বলতা, উৎপাদনশীল ভূমিকার চেয়ে অনুৎপাদনশীল ভূমিকাকে প্রাধান্য দেয়া, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর অবমূল্যায়ন এবং ধর্মের বিকৃত প্রয়োগ ও অপব্যবহার।[১]

২। **মনস্তাত্ত্বিক কারণঃ** নারী নির্যাতনে জড়িতদের ব্যক্তিত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ ব্যাখ্যায় দেখা যায় যে, তাদের ত্রুটিপূর্ণ সামাজিকীকরণ, মানসিক অসুস্থ্যতা ও বিকৃতি, ব্যক্তিত্বের ত্রুটিপূর্ণ ধরন-কাঠামো

---

[১] নূর নাহার, *নারী নির্যাতন : মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি*, দৈনিক যুগান্তর, ১৬ এপ্রিল ২০০১, পৃ.১০

Dhaka University Institutional Repository

এবং দুর্বল নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ নারী নির্যাতন সমস্যা সৃষ্টি ও বিস্তারে ক্রিয়াশীল হয়। জীবন অভিজ্ঞতায় নারীর প্রতি সহিংসতা হলো এক ধরনের শিক্ষণমূলক আচরণ। সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশে শূন্যতার যে ক্রটি থাকে কিংবা ব্যক্তিত্বের বিপর্যয়ের যে অবস্থা হয় এর ফল হলো নারী ও শিশু নির্যাতন। তিনি বিভিন্ন সমীক্ষায় নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে মুখ্য যেসব কারণগুলো খুঁজে পাওয়া যায় এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ক্রটিপূর্ণ সামাজিকীকরণ ও মানবীয় বিকাশে ক্রটিপূর্ণ অভিজ্ঞতা, শিক্ষার অভাব, মানবাধিকার ও মর্যাদাসহ শারীরিক শাস্তি বিষয়ে অজ্ঞতা, দুর্বল পারিবারিক সামঞ্জস্য স্থাপন, সামাজিক দূরদৃষ্টির অভাব, মানসিক অসুস্থতা এবং দুর্বল নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ।[১]

৩। **অর্থনৈতিক কারণঃ** বেকারত্ব বা কর্মসংস্থানহীনতা, দারিদ্র্য, কম মজুরী ও বিত্তহীনতার সাথে অনেক গবেষক নারী নির্যাতনের সম্পর্ক লক্ষ্য করেছেন।[২] এরূপ অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও দৈন্যদশায় নারীদের অধিক উপার্জনমূলক শ্রমদানে নিয়োজিত করতে, পিত্রালয় থেকে যৌতুক হিসেবে নগদ অর্থ বা ব্যবহার্য সামগ্রি আনতে এবং দারিদ্র্য সমস্যায় মানবীয় চাহিদা অবদমিত করতে নারী নির্যাতন হয়। অন্যদিকে বাজারমুখী অর্থনীতিতে ভোগবাদী মানসিকতার প্রভাবেও অনেকে বৈষয়িক প্রাপ্তির প্রত্যাশায় কিংবা অতি বৈষয়িক প্রাপ্তির উন্মাদনায় নারী নির্যাতন করে।

৪। **আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থার দুর্বল কার্যকারিতাঃ** সমাজে আইন-শৃঙ্খলার ক্রমাবনতি ও দুর্বল কার্যকারিতা এবং বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা নারী নির্যাতনমূলক ঘটনার সহজ পুনরাবৃত্তি ও ব্যাপকতা ঘটায়। এতে নারী নির্যাতনের হুমকি প্রতিহত হয় না। তদুপরি নির্যাতিতের পক্ষে নির্যাতন প্রমাণ করা অনেক সময় জটিল ও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। ফলে এমন অবস্থায় নির্যাতনকারী রেহাই পেয়ে যেতে পারে। আর এরূপ ঘটনাক্রম তাকে যেমন পুনঃনির্যাতনে উৎসাহ দিতে পারে তেমনি অন্যদেরও সাহস যোগাতে পারে।[৩]

৫। **শিক্ষা ও নৈতিকতার অবনতিঃ** সমাজে শিক্ষা ও নৈতিকতার অবনতি ঘটলে মানুষের মধ্যে নানা রকম বিচ্যুত আচরণ জন্ম নেয় ও বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে জীবনগঠনমুখী ও মানবতামুখী শিক্ষার বর্তমান

---

[১] দ্রষ্টব্যঃ Syed Mehdi Momin, ibid, p.12

[২] Carlson (1984), Jahan (1988), Sadeque (1986) দ্রষ্টব্যঃ Abdul Halim, *The Enforcement of Human Rights,* Dhaka 1995, p.3

[৩] Abdul Halim, ibid, p.14

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্কট নারী নির্যাতনের হারকে বাড়িয়ে তুলছে। অন্যদিকে ধর্মীয় আদর্শগত বাধ্যবাধকতা ও নৈতিকতায় মানব আচরণ কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় মানুষের মধ্যে নারী নির্যাতনমূলক দায়িত্বজ্ঞানহীন বর্বরোচিত আচরণ দানা বেধে উঠছে। বস্তুত শিক্ষার সঙ্কট ও নৈতিকতার অবনতি সমাজের ভিত্তিমূলকেই কাঁপিয়ে তুলতে পারে। এক্ষেত্রে মানবীয় বিচারবোধ গড়ে উঠে না বলে বর্বরতা–পাশবিকতায় মানুষ নিজেকে জড়িত করতে কুণ্ঠাবোধ করে না।[১]

৬। **সাংস্কৃতিক সঙ্কট:** বিদেশী সংস্কৃতির সামাজিক আত্মীকরণে অনগ্রসরতা, দেশজ সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতিহীনতায় বিদেশী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ এবং মুক্ত আকাশ সংস্কৃতিতে অবাধ যৌনাচার ও নানা রকম মারপিটের কল্পকাহিনীভিত্তিক সিনেমা–নাটকের সংস্পর্শ আমাদের দেশের মত উন্নয়নশীল দেশে একটি সাংস্কৃতিক সঙ্কট সৃষ্টি করে চলেছে। এরূপ সংস্কৃতির প্রভাবে নারী নির্যাতনমূলক বৈকল্যধর্মী আচরণ শিক্ষা হচ্ছে। ফলে বাস্তবে অনুরূপ আচরণ বাড়ছে।[২]

৭। **নারী স্বাধীনতার ধারণাগত সঙ্কট:** উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নে নারীর ভূমিকা ব্যাপকতর করার গুরুত্ব স্বীকৃত হওয়ার মধ্যে নারী স্বাধীনতা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং রাজনীতি–অর্থনীতিতে নারীর অবস্থা মজবুতকরণের প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে জোরদার হয়েছে। কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় পাশ্চাত্যধারার উগ্রতায় কোনো কোনো মহিলা নারী স্বাধীনতাকে নারীবাদী বৈপ্লবিক ভাবাদর্শে ব্যাপক ও বেপরোয়াভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করছে। এতে একটা সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে যা সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের রূপান্তর মাত্র, যা কি–না নারীর সাথে পুরুষকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দিতে চায়। এর পরিণতিতে শারীরিক শক্তি ও সামাজিক কর্তৃত্বগত ক্ষমতায় অনেক পুরুষ নারীর প্রতি মারমুখী হয়ে ওঠে ও নির্যাতনমূলক আচরণ করে বসে। ফলে সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে যে ভাঙ্গন তাতে নারী নির্যাতনের মত ব্যাধি বেড়ে যাচ্ছে।[৩]

৮। **যৌনাচার সামাজিক নিয়ন্ত্রণের শৈথিল্য:** যৌনাচারের সামাজিক বিধিবদ্ধতা ও নীতি–কাঠামো পাশ্চাত্যের আধুনিকতায় নতুন রূপ ধারণ করে চলেছে। এতে বেড়ে যাচ্ছে পরকীয়া প্রেম, লিভিং

---

[১] ibid

[২] আজাদুর রহমান চন্দন, *ধর্ষণ, খুন ও নারী নির্যাতন : প্রতিকারহীন না প্রতিকারযোগ্য বাস্তবতা*, উন্নয়ন পদক্ষেপ, স্টেপস টুওয়ার্ড ডেভেলপমেন্ট, ৪র্থ–১১শ সংখ্যা, এপ্রিল–জুন ১৯৯৮, ঢাকা, পৃ.৯

[৩] সৈয়দ শওকতুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ.২৪৪

Dhaka University Institutional Repository

টুগেদার এবং নারী–পুরুষের অবাধ মেলামেশা। এ ধরনের অবস্থার একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়ে দাম্পত্য জীবনে। তাতে স্বামী–স্ত্রীর সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ফলে নারী নির্যাতন সমস্যা বৃদ্ধি পায়।[১]

৯। **প্রেমে ব্যর্থতা:** প্রেম নিবেদনে ব্যর্থ হয়েও অনেকে অবিবাহিত মেয়েদের নানারকম উৎপীড়ন করে এবং ব্যর্থতার গ্লানি তীব্রতর হলে এসিড নিক্ষেপের মত ঘটনা ঘটায়। বাংলাদেশে এসিড নিক্ষেপের ঘটনাগুলোর প্রায় সবই প্রেমে ব্যর্থ হওয়ার জন্য আচরণগত অস্বাভাবিকতা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সম্পদ দখলের দুরভিসন্ধি কাজ করে।[২]

১০। **নারী পাচারকারী চক্রের দৌরাত্ম্য:** উন্নয়নশীল দেশে নারী পাচারকারী বিভিন্ন চক্র ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠছে এবং তাদের নেটওয়ার্ক প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও বিস্তৃত করেছে। দাম্পত্যকলহে বিধ্বস্ত কিংবা উচ্চাশা প্রত্যাশী গ্রামের সহজ–সরল মেয়েরা এ ধরনের নেটওয়ার্কে সহজেই আটকা পড়ে যায় ও পাচার হয়। নারী নির্যাতনের বর্তমান যে ভয়াবহ দিক নারী ও শিশু পচারের বৃদ্ধি ও প্রসারে নারী পাচারকারী আন্তর্জাতিক চক্রের ভূমিকা থাকে।[৩]

১১। **বাল্য বিবাহ ও বহুবিবাহ:** বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত রয়েছে। বাল্যবিবাহের ফলে স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে বয়সের সামঞ্জস্যহীনতা, দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, অপরিপক্ক মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব প্রভৃতি স্বামী–স্ত্রীর সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। যার ফলে নারী নির্যাতন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বহুবিবাহের কারণে স্বামীর একাধিক স্ত্রী গ্রহণের সুযোগ থাকে। এতে স্ত্রীদের প্রতি স্বামীর বৈষম্যমূলক আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি দাম্পত্য কলহের সৃষ্টি করে। এছাড়া স্ত্রীদের মধ্যে পারস্পারিক দ্বন্দ্ব ও ঝগড়া লেগেই থাকে। এগুলো শেষ পর্যন্ত ভয়ঙ্কর নারী নির্যাতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[৪]

১২। **যৌতুক প্রথা:** সাম্প্রতিককালে নারী নির্যাতন বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে যৌতুক প্রথাকে চিহ্নিত করা যায়। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর বিবাহ হচ্ছে যৌতুকের মাধ্যমে। যৌতুকের দাবি পূরণকে কেন্দ্র করে দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা যেমন নির্যাতিত হচ্ছে তেমনি উচ্চবিত্ত পরিবারগুলোতেও যৌতুকের পরিমাণের উপর স্বামীর পরিবারে মেয়েদের সম্মান ও মর্যাদা নির্ভর করছে। গ্রামের নিম্ন ও

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] প্রাগুক্ত

[৩] ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা*, ঢাকা ১৯৯০, পৃ.১৬৭

[৪] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে নারী নির্যাতনের প্রধান কারণ হচ্ছে যৌতুক প্রথা। যৌতুকের দাবিকে কেন্দ্র করে মানসিক ও দৈহিকভাবে নির্যাতন চালানোর ফলে মহিলাদের মধ্যে আত্মহত্যা এবং হত্যার হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।[১]

১৩। **লিঙ্গভিত্তিক অসমতা:** ভবিষ্যতের উপার্জনকারী হিসেবে আমাদের সমাজে পুত্র সন্তানকে বেশি এবং মেয়ে সন্তানকে কম মূল্য দেয়া হয়। মেয়েদের গড়ে তোলা হয় অনুগত ও সমর্থনকারী গৃহিনীর উপযোগী করে। এতে ভবিষ্যতে দাম্পত্য জীবনে তাদের প্রতি অবহেলা ও নির্যাতনের ক্ষেত্র তৈরি হয়। লিঙ্গ বৈষম্য সমাজে বিরাজ করায় নারী সকল সুযোগ–সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়, নিজেকে বিকশিত করার সুযোগ কম পায়। ফলে আত্মউন্নয়নের পরিবর্তে পুরুষ কর্তৃক বাধাগ্রস্ত হয়। যা প্রকারান্তরে নির্যাতনের দিকে ক্রমান্বয়ে ধাবিত করে।[২]

১৪। **সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি:** বাংলাদেশে অধিকাংশ পরিবারে স্ত্রীকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করার মানসিকতা দেখা যায়। স্ত্রী কেবল শয্যাসঙ্গিনী। সন্তান উৎপাদনের মাধ্যম এবং সেবিকা এর বেশি মর্যাদা তাকে দেয়া হয় না। এ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে স্ত্রীকে স্বামীর সকল ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করা হয়।[৩]

১৫। **অধিকারহীনতা:** পিতৃতান্ত্রিক সমাজে সম্পদের উপর নারীর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। জমির মালিকানা হস্তগত করা, ব্যবসা–বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ চাওয়া, ঋণ গ্রহণ করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের বাধা দেয়া হয়। পরিবারের ক্ষমতা লাভের সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়। পুরুষকে সংসার ও তাদের সমাজের মালিক হিসেবে দেখা হয়। রাজনৈতিক অঙ্গণে নারীরা কিছুটা দৃশ্যমানতা অর্জন করলেও সেখানে নারীদের অবস্থান অলঙ্কার স্বরূপ; সেখানে তারা মূলত পুরুষদের স্বার্থ ও পুরুষদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে থাকেন।[৪]

১৬। **স্বাস্থ্যহীনতা ও চিকিৎসার অভাব:** বিশ্বব্যাপী পুরুষের চাইতে নারীর নিম্নমানের খাবার তাদের নিম্ন মানের জীবনযাপনের অন্যতম কারণ। বাংলাদেশই কেবল একমাত্র দেশ নয় যেখানে নারীদের নিম্নমানের খাদ্য সেবা প্রদান করা হয় এবং যেখানে অনেক বেশি অনাবশ্যকভাবে সন্তান জন্ম দিতে

---

[১] ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৩৩

[২] প্রাগুক্ত

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪১

[৪] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

গিয়ে অনেক নারী মৃত্যুবরণ করেন। নারীর স্বাস্থ্য সেবা কেবল কম মূল্যের এবং প্রথাগত ভেষজ ও ঝাঁড়ফুকের মধ্যে সীমিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষের সাপেক্ষে নারীদের প্রয়োজন দ্বিতীয় পর্যায়ের বলে বিবেচিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ও নেপাল হচ্ছে একমাত্র দেশ যেখানে নারীরা পুরুষের মত দীর্ঘদিন বাঁচে না।[১]

১৭। **শিক্ষা ও দক্ষতার অভাব:** নৃতাত্ত্বিকভাবে এটা স্বীকৃত সত্য যে, সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা ভবিষ্যত প্রজন্মের মাঝে সঞ্চারিত হয়। নারীদের মাধ্যমে সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে তাদেরকে মূল দায়িত্ব পালন করতে হয়। প্রাচীন যুগে নারীরা তাদের মা ও নারীদের কাছ থেকে তাদের কাজের শিক্ষা লাভ করতো, যা ছিলো মূল্যবান। কিন্তু বিস্তৃত পারিবারিক লালন-পালনসহ কৃষিভিত্তিক সমাজের রূপান্তর এবং শিল্পায়িত সমাজের বিকাশের ফলে নারীরা এসব প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন করতে পারেনি। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে নারীরা বেকার এবং পুরুষদের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। যা নারীর প্রতি অবজ্ঞা ও নির্যাতনের মানসিকতা বৃদ্ধিতে সহায়ক।[২]

১৮। **যৌন ও প্রজনন ক্ষেত্রে নারীর মতামত গ্রহণ না করা:** সকল সমাজেই নিজেদের শরীরের উপর নারীদের নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অধিকাংশ সমাজেই সন্তান ধারণের বিষয়টি নারীরা নিজেরা নির্ধারণ করে না, তা নির্ধারিত হয় অন্যের বিশেষত স্বামীর দ্বারা। একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে ব্যবহার করাটাকে সব সমাজেই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হয় অথচ বিবাহিত স্ত্রীও যে স্বামী কর্তৃক ধর্ষিত হতে পারে তা স্বীকার করা হয় না। কিন্তু অনেক নারীই এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার সাক্ষী। এক কথায় যৌন সম্পর্ক এবং সন্তান জন্ম দানের ক্ষেত্রে নারীর মতামত গ্রহণ করা হয় না।[৩]

১৯। **প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি:** প্রচলিত আইনের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও অনেক সমাজে শাস্ত্রীয় বিধান লংঘন করার অজুহাতে স্ত্রীকে প্রহার করার ক্ষমতা সামাজিক প্রথা হিসেবে আমাদের সমাজে প্রচলিত থাকায় নারীর নিগ্রহ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এ অবস্থায় নারীর প্রতি পুরুষের অবজ্ঞা প্রদর্শনে সমাজের স্বীকৃতি রয়েছে বলে মনে হয়। ভারতে ৮০ শতাংশ নারী নিজ ঘরে স্বামী কর্তৃক প্রহৃত হয়। সর্বত্রই পুরুষের মত নারীরা উদারভাবে রাস্তায় বের হতে পারে না, নির্যাতিত হওয়ার ভয় থেকে যায়।

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩

[২] প্রাগুক্ত

[৩] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

শারীরিক ও মানসিক পীড়ন হলো এমন দুটি হাতিয়ার যা পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে নারীকে ঘরে আবদ্ধ রাখে।[১]

২০। **পুরুষ নির্ভরতা:** বাংলাদেশের অধিকাংশ নারী আর্থিক, সামাজিক, পারিবারিক এবং শারীরিকভাবেও পুরুষের উপর অতিমাত্রায় নির্ভর করে। নিজেরা উৎপাদন ও উপার্জনে যুক্ত কম থাকে বলে পুরুষের অর্থে তাকে জীবন চালাতে হয়। একই কারণে পরিবারে ও সমাজে সে পুরুষের পরিচয় ও প্রভাব ব্যবহার করে। কায়িক শ্রমের কোনো কাজ সে নিজে করে না। শারীরিক কমনীয়তার দোহাই দিয়ে সে কাজ পুরুষের মাধ্যমে সম্পন্ন করে। এতে সকল ক্ষেত্রে সে একান্তভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। যে কারণে পুরুষ নারীর উপর নির্যাতন করার সুযোগ পায়।[২]

২১। **ধর্মীয় বিধান সম্পর্কিত যথাযথ জ্ঞান এবং সঠিকভাবে অনুশীলনের অভাব:** তত্ত্বগতভাবে অধিকাংশ ধর্ম নারীকে যথাযথ সম্মান দেয়ার কথা না বললেও বাংলাদেশে প্রচলিত ও আচরিত প্রধান ধর্ম ইসলামে আদর্শিকভাবেই নারীকে বিপুল মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য অনিন্দ্য সুন্দর এবং বাস্তবসম্মত নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ ইসলামের এ সকল ধর্মীয় বিধান সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান রাখে না। যারা রাখেন তারাও সঠিকভাবে তা অনুশীলন করেন না। ফলে প্রায়ই ধর্মের নামে এখানে নারীকে অপমানকর নির্যাতনের শিকার হতে হয়, যার সাথে অন্তত ইসলামের ন্যূনতম সম্পর্কও নেই।[৩]

বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের ধরন ও প্রকৃতি

বাংলাদেশে নারী নির্যাতন কথাটি বিশেষ প্রচলিত এবং আলোচিত কিন্তু এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন। বিশেষ করে নির্যাতনের প্রকৃতি যখন বিভিন্ন ধরনের। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যে জানা যায়, বিশ্বের প্রতি তিনজন নারীর মধ্যে অন্তত একজন নারী নির্যাতনের শিকার হয়। নির্যাতনের ঘটনাগুলো অধিকাংশ যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণ ঘটনায় কেন্দ্রীভূত। প্রতিবছর বৃটেনে ধর্ষণের শিকার হয়

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪২-৩৪৩

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৩

Dhaka University Institutional Repository

৩ লক্ষ নারী।[১] যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে অবাধ যৌন স্বাধীনতার মধ্যেও ধর্ষণ ও নারী মর্যাদা হানিকর যৌন বিষয়ক কেলেংকারি অনেক সময় বিশ্বজুড়ে আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সেখানে প্রতি ছয় মিনিটে একটি ধর্ষণের রেকর্ড হতে দেখা যায়।[২]

বাংলাদেশের নারী নির্যাতন পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু বক্তব্য বিভিন্ন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়ে থাকে। অতি সম্প্রতি প্রকাশিত এ সংক্রান্ত কিছু খবর, প্রতিবেদন ও গবেষণা পরিপত্র থেকে এ দেশের নারী নির্যাতন পরিস্থিতি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। এ পর্যায়ে বাছাইকৃত কিছু খবর, প্রতিবেদন ও গবেষণা পরিপত্র তুলে ধরা হলো।

১। নারায়নগঞ্জ থেকে পোশাক কারখানার তরুণীদের ভালো বেতনে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ভারতে পাচার করা হচ্ছে। ভারত থেকে পালিয়ে আসা দুই তরুণী র‍্যাব ও পুলিশের কাছে চাঞ্চল্যকর এই তথ্য দিয়েছে। দুই তরুণী জানিয়েছে, নারায়নগঞ্জ থেকে কমপক্ষে ৭০ জনকে ভারতে পাচার করেছে ওই সংঘবদ্ধ চক্র। তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী র‍্যাব সদস্যরা শহরের দেওভোগ এলাকা থেকে রানী বেগম (৫৫) ও গতকাল সোমবার ভোরে ঢাকার গেন্ডারিয়া এলাকা থেকে হারুন (৩৫) নামের পাচারকারী চক্রের দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে।

ভারত থেকে পালিয়ে আসা ওই দুই তরুণী জানায়, তারা ফতুল্লায় রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানায় কাজ করতো। থাকত ইসদাইর এলাকায়। একই এলাকার রানী বেগম ৩ জানুয়ারি ভালো বেতনে চাকরি দেওয়ার কথা বলে তাদেরকে ঢাকা নিয়ে যায়। সেখানে চা পান করিয়ে তাদেরকে অচেতন করা হয়। পরে পাচার করা হয় ভারতের মুম্বাইয়ের পুনায় একটি যৌনপল্লীতে। ১০-১২ দিন পর সেখানে থেকে তারা দুজন জানালা ভেঙে পালিয়ে যায়। আশ্রয় নেয় একটি বাড়িতে। সাড়ে ছয় মাস ওই বাড়িতে কাজ করার পর ওই পরিবারের সহযোগিতায় শনিবার রাতে দেশে ফেরে তারা। দেশে ফেরার পর পরই বিষয়টি তারা র‍্যাবকে জানায়। র‍্যাব সদস্যরা রানী ও হারুনকে গ্রেপ্তার করেন। ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জীবন কান্তি সরকার জানান, ভারত থেকে পালিয়ে আসা দুই তরুণী জানিয়েছে, নারায়নগঞ্জ থেকে ৭০জন তরুণীকে ভারতে পাচার করা হয়েছে। সেখানে আটকে রেখে বাধ্য করা হয় যৌনবৃত্তিতে। ওসি বলেন, তাদের সঙ্গে কথা বলে ও গ্রেপ্তার

[১] আকরাম হোসেন চৌধুরী, *আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও বর্তমান চিত্র*, আজকের কাগজ, ৯ মার্চ ২০০০, পৃ.৫

[২] The Bangladesh Observer, 27 April 1995

Dhaka University Institutional Repository

হওয়া রানী বেগমকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পাচারের সঙ্গে একটি বিশাল চক্র জড়িত রয়েছে। এই চক্রের মূল হোতাদের শনাক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে।[১]

২। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় থাকার পরও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসেনি সেভাবে। জনগণ চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে আছে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় আছেন নারীরা। দরিদ্র নারীদের অবস্থা আরও করুণ। ... পিতৃতান্ত্রিক মনমানসিকতার কারণে নারীরা জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। ধর্মীয় মৌলবাদের কারণে হিন্দু আইনে সংশোধনী আনা যাচ্ছে না। অন্যান্য ধর্মের নারীরাও পারিবারিক আইনের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। ... জাতীয় সংবিধান, জাতীয় নারী উন্নয়ননীতি, জাতিসংঘের নারীর প্রতি সবধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দলিলে মানবাধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রের অঙ্গীকার থাকলেও তার বাস্তবায়ন হতাশাজনক। ..... বৈষম্য নিরসনের মাধ্যমে নারীর মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিলের মূল উপাদান হলো: নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক ও সামাজিক, সাংস্কৃতিক অধিকার, জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা, নিরাপত্তা এবং আইনের আশ্রয় লাভের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সম অধিকার। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে চরম বৈষম্যের শিকার হওয়ায় পুরুষের সমকক্ষ অবস্থানে এসে মানবাধিকার ভোগের সুযোগ নারীর পক্ষে সেভাবে সম্ভব হয়নি। ..... সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় ব্যক্তি ও সমাজজীবনে লিঙ্গবৈষম্যের উপস্থিতিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। তবে নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ বা সিডও সনদ প্রথম একটি মানবাধিকার সনদ, যা জনজীবন ও ব্যক্তিজীবন উভয় ক্ষেত্রে নারীর বৈষম্য নিরসনে সমান গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু এসব সনদ কাগুজে বিষয়ে পরিণত হয়েছে।[২]

৩। ঢাকা শহরে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিশু যৌন নির্যাতনের হার বেড়েছে। কন্যা শিশুরাই এর শিকার হয় বেশি। বর্তমানে রাজধানীতে প্রতিদিন গড়ে ৪জন কন্যাশিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, যাদের বয়স ১৪ বছরের মধ্যে। ২০০৫ সালে এ সংখ্যা ছিলো ২ জন। নির্যাতনকারীর ভয়ে বা হুমকির মুখে শিশুরা কিছু না বলায় বেশির ঘটনাই থেকে যাচ্ছে আইনি প্রক্রিয়ার বাইরে। যৌন জীবন

---

[১] ইফতেখার ইকবাল, *পাচার : একটি নির্মম অমানবিকতা*, সামাজিক গবেষণা কেন্দ্র জার্নাল, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১১, পৃ.১৪

[২] মানবাধিকার ও জেন্ডার বিষয়ক আঞ্চলিক সেমিনার, ব্র্যাক সেন্টার ইন, ঢাকা, ৫ অক্টোবর ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা না থাকার জন্যও অনেক ক্ষেত্রে নির্যাতনের ঘটনাগুলো চিহ্নিত হচ্ছে না বলে মনে করে শিশুবিষয়ক সংগঠনগুলো।

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের তথ্যমতে, ২০০৮ সালে সারা দেশে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে ১৫২ জন, যাদের প্রত্যেকেই কন্যাশিশু। শুধু ঢাকা শহরেই ছেলে ও মেয়ে মিলিয়ে দিনে যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে গড়ে ৬টি শিশু। ঘটনাগুলো আইনের আওতায় আসছে না। এর প্রধান কারণ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নির্যাতনকারীরা কাছে আত্মীয় বা পরিচিত। ফলে নির্যাতিত শিশুটি যেমন বলে না তেমনই কোনোক্রমে ঘটনা প্রকাশ পেলেও পরিবারের পক্ষ থেকে তা চেপে যাওয়া হয়।

জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের ৩৪ ধারায় যৌন নির্যাতন বন্ধে রাষ্ট্রের দৃঢ় অবস্থান নেওয়ার উল্লেখ থাকলেও আমাদের দেশে এর প্রয়োগ নেই। ...... রাষ্ট্র যখন আইন করে বা কোনো আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষর করে, তখন তা পালনে তাকে দায়িত্বশীল হতে হবে। বিষয়গুলো চেপে না গিয়ে প্রতিকারে শিশুদের অভিভাবকদের সরব হওয়ার আহ্বান জানাতে হবে। আমাদের দেশে যৌন নির্যাতন ধর্ষণের পর্যায়ে না গেলে মামলা করার প্রবণতা নেই। আবার ধর্ষণের শিকার শিশুর আলামত পরীক্ষার চিকিৎসক যদি পুরুষ হয়, সে ক্ষেত্রে কন্যাশিশুটি যেন আরেক দফা নির্যাতনের শিকার না হয়, তাও রাষ্ট্রকে দেখতে হবে। ..... যৌন নির্যাতনের শিকার কন্যাশিশুরা জীবনের শুরুতেই বিরূপ অভিজ্ঞতার শিকার হওয়ায় পরবর্তী জীবনে আত্মহত্যা, উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন, মাদকাসক্ত হয়ে পড়া, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি অশ্রদ্ধাবোধসহ নানা ধরনের সমস্যায় পড়ে। .... যে সব কন্যাশিশু জীবিকায় নামে, তারা সাধারণত দক্ষতার অভাবে বাসাবাড়িতে কাজ নেয়। তাদের প্রথম যৌন হয়রানিসহ নানা নির্যাতনের অভিজ্ঞতা শুরু হয় এখান থেকেই।[১]

৪। সম্প্রতি নির্যাতনের হার বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন শিশু অধিকার বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা। সার্কভুক্ত দেশের নারীশিশু সহিংসতা পর্যবেক্ষণের জন্য ২০০৪ সালে গড়ে ওঠা সংগঠন 'সার্ক অটোনোমাস উইমেন অ্যাডভোকেসি গ্রুপের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ১৪টি স্থায়ী যৌনপল্লীতে প্রায় ১৫ হাজার যৌনকর্মী রয়েছে। তাদের ৮৩.৪ শতাংশের বয়স ১৮

---

[১] অ্যাডভোকেট সালমা ইসলাম, *নারী নির্যাতন ও বাংলাদেশ*, আইন ও সালিশ কেন্দ্র স্মরণিকা ২০১০, পৃ.২৪

বছরের কম। এসব মেয়েরা যৌনপল্লীতে বিক্রি হওয়ার আগেই যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।[১]

৫। বিয়ের সব আয়োজন শেষ। বিয়ে উপলক্ষে আত্মীয়স্বজনেরা কনের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। সাজসজ্জার মালামালে বাড়ি ভরে গেছে। কিন্তু যৌতুকের ব্যাপারে কোনো ফয়সালা না হওয়ায় অবশেষে বিয়ের পিঁড়িতে বসা হলো না কলেজ ছাত্রী মনি আক্তারের (২৩)। সবাইকে কাঁদিয়ে তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। গত ২৭ নভেম্বর রাতে বরিশালের গৌরনদী পৌর শহরের দক্ষিণ পালরদী গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে।

পারিবারিক ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গ্রামের আলমগীর হোসেন খানের মেয়ে ও বরিশাল বিএম কলেজের সম্মান তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী মনি আক্তারের সঙ্গে পার্শবর্তী চরগাধাতলী গ্রামের ফজলুল হক মুন্সির ছেলে মনির হোসেনের বিয়ের দিন ছিলো সোমবার। গত শুক্রবার সন্ধায় বরপক্ষের লোকজন কনের বাড়িতে গিয়ে দেনাপাওনার বিষয়ে আলোচনায় বসেন। এক পর্যায়ে দেনাপাওনা নিয়ে কনের বাবা আলমগীর হোসেনের সঙ্গে হবু জামাতা মনিরের ও তার নিকট আত্মীয়দের বাগবিতণ্ডা হয়। এরই এক পর্যায়ে বর ও তার আত্মীয়রা কনের বাড়ি থেকে চলে যান। অভিমান করে মনি রাতেই তার শয়ন কক্ষের ফ্যানের সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন।[২]

৬। গাজিপুরের মৌচাক এলাকার গৃহবধূ পিংকী (১৯) স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ... বিয়ের পর থেকেই পিংকীর স্বামী সোহাগ ব্যবসা করার জন্য পিংকীর মাধ্যমে ৫০ হাজার টাকা যৌতুক দাবি করে। ... পিংকীকে সাথে নিয়ে তাদের বাসায় গিয়ে সোহাগ জানায়, ৭ দিনের মধ্যে টাকা দিতে হবে। তা না হলে সে আর পিংকীকে ঘরে তুলে নেবে না। এর প্রতিবাদ করায় সোহাগ তার শাশুরি সাহিদা বেগম (৬০) ও পিংকীর বোন ফাতেমাকে (৩০) মারধর করে। সপ্তাহ খানেক পর টাকা না পেয়ে সোহাগ পিংকীকে মারধরে করে বাড়ি নিয়ে যায়। .... মুঠোফোনে সোহাগ পিংকীর মাকে জানায়, আপনার মেয়ে অসুস্থ, তাকে গাজিপুর সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।' হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায়, পিংকীর লাশ পরে আছে।

---

[১] প্রাগুক্ত পৃ.২৩

[২] ড. মিযানুর রহমান, *বাংলাদেশের মানবাধিকার পর্যালোচনা ২০০৯*, মানবাধিকার কমিশন রিপোর্ট, ২০১০ পৃ.৭৮

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য লাশ হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করে। রিপোর্ট থেকে জানা যায়, পিংকী আত্মহত্যা করেছেন।[১]

বাংলাদেশের নারীদের বিয়ের গড় বয়স ১৫.৩ বছর। এই অল্প বয়সে বিয়ে করা নারীদের সন্তান ধারণের প্রবণতাও বেশি। দেশে কিশোরী মাতৃত্ব ৩৩ শতাংশ। এগুলো দেশের জনসংখ্যা সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ।

জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (নিপোর্ট) পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, ১৫ থেকে ১৯ বছরের বিবাহিত নারীদের মধ্যে ২৭% মা হয়েছেন। রাজশাহী বিভাগে কিশোরী মাতৃত্ব সবচেয়ে বেশি, যা ৪০%। শহরের চেয়ে গ্রামে কিশোরী মাতৃত্ব বেশি। একই জরিপে দেখা গেছে, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগে গড় বিয়ের বয়স ১৫ বছরের কম। সিলেট বিভাগের নারীদের গড় বিয়ের বয়স সবচেয়ে বেশি, ১৬.৭ বছর। চট্টগ্রাম বিভাগে তা ১৬ বছর।

নিপোর্ট দেশের ৩৪১টি নমুনা এলাকার ১০৪০০ খানার উপর জরিপ করে 'বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফি অ্যান্ড হেলথ সার্ভে ২০০৯' প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে কয়েক মাস আগে। প্রতিবেদনে পরিবার পরিকল্পনা, মাতৃস্বাস্থ্য, শিশুস্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিয়ে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।[২]

দেশের বিভিন্ন স্থানে শুধু নভেম্বর মাসেই যৌতুকের কারণে মৃত্যু হয়েছে ৩১ নারীর। একই কারণে নির্যাতিত হয়েছে আরো ৫জন। বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা মানবাধিকারের এক জরিপে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে মানবাধিকার সংস্থাটি এ জরিপ করে। অপরদিকে যৌতুকের কারণে, প্রেমে ব্যর্থ হয়ে, ইভটিজিং এবং পারিবারিক সহিংসতার কারণে এক মাসে আত্মহত্যা করেছে ১৫ নারী ও ৩ জন পুরুষ। এছাড়া ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৪৯ নারী ও শিশু। এরমধ্যে ৩৪ নারী ও ১৫ মেয়ে শিশু। ৩৪ জন নারীর মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ২১ জন, গনধর্ষণের শিকার হয়েছে ২জন এবং ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ১১ নারীকে। ১৫ মেয়ে শিশুর মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ১১জন, গণধর্ষণের শিকার হয়েছে ১জন এবং ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৩ শিশুকে।

---

[১] উইমেন ফর উইমেন সুভেনিয়র রিপোর্ট, ঢাকা ২০০৯, পৃ.৭

[২] জনসংখ্যা বিষয়ক জরিপ প্রতিবেদন, জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (নিপোর্ট), ২০১০, পৃ.৬৭

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক সহিংতায় আহত হয়েছে ১১২১ জন ও নিহত হয়েছে ১০০ জন ব্যক্তি। রাজনৈতিক সহিংসতায় আহত হয়েছে ৭৩৭ জন এবং নিহত হয়েছে ৫ জন। গত মাসের বিভিন্ন সময়ে দেশের ১৩টি জায়গায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন অপরাধ ও মামলায় জড়িত হয়ে গণগ্রেফতারের শিকার হয়েছে ১০৫৩ জন। এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছে ৮ জন। এর মধ্যে নিহত হয়েছে ১ জন। গৃহপরিচারিকা নির্যাতনের শিকার হয়েছে ৬ জন এর মধ্যে ৫ জন আহত ও ১ জন নিহত। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব, ক্ষমতার অপব্যবহার, এদেশের বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগ না থাকায় নভেম্বর মাসে সরকারের আইন রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে ২২ জন। পুলিশ হেফাযতে মারা গেছে ৩ জন, র‍্যাব ও পুলিশের হেফাজতে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে ১টি। হত্যাকাণ্ডের শিকার ২২ জনের মধ্যে ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছে ১১ জন। র‍্যাবের ক্রসফায়ারে মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের এবং বিএসএফের গুলিতে মারা গেছে ৪জন।[১]

আমাদের দেশে বিদ্যমান পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা নানা বৈষম্য ও প্রতারণার শিকার হয়। ভিডিওতে নারীর চরম অবমাননাকর ছবি তুলে বাজারে ছেড়ে দেওয়া এসবের মধ্যে ঘৃণ্যতম। ফরিদপুরে অস্ত্রের মুখে ১৪ বছরের ১ স্কুল ছাত্রীকে নির্যাতন করে সেই দৃশ্য ভিডিওতে ধারণ করেছে ৪ যুবক। আমরা এ ধরনের জঘন্য ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। কোনো সভ্য সমাজে এমনটি ঘটার কথা নয়।

এখানে একই সঙ্গে ২টি অপরাধ সংঘটিত হয়েছেঃ ধর্ষণ ও ধর্ষণের ভিডিও ধারণ। ২টিই ফৌজদারি অপরাধ। ওই ঘটনায় কালাম খান (২২), তুষার খান (২৩)সহ ৪ জনের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা হয়েছে। বিচারক তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন। ঘটনার অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হোক। বিচারক একই সঙ্গে ঘটনার ভিডিওচিত্র নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং ভিডিওচিত্র যার কাছে পাওয়া যাবে তাকেও গ্রেপ্তার করে তা জব্দ করতে বলেছেন। আমরা আশা করবো, এ ভিডিওচিত্রটি যাতে কোনোভাবেই ছড়িয়ে না পড়ে সে ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসন সক্রিয় থাকবে আশা করি।

দেশে এ ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন অসংখ্য বিপথগামী তরুণ। এই অপরাধী চক্রকে এখনই থামাতে হবে। আমরা এ ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসনকে আরো সক্রিয় ভূমিকায় দেখতে চাই।

[১] বাঁচতে শেখা, বার্ষিক প্রতিবেদন ও রিপোর্ট, ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ.৫

Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিই পারে জঘন্য অপরাধ নির্মূল করতে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নারীর নগ্ন ছবি হাতবদলের উদ্বেগজনক তথ্য এর আগেও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকায় প্রকাশিত ঘটনার বাইরেও নিশ্চয় এ রকম অসংখ্য ঘটনা ঘটছে। স্পর্শকাতর বলে এসব ঘটনায় মেয়েরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মামলা করতে ভয় পায়। আইনী সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত হবে এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসা। অপরাধ দমনে আইনের কঠোর প্রয়োগের পাশাপাশি প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা।[১]

পরিবারের সদস্যদের দ্বারা নির্যাতিত নারীদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে গত সোমবার পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইনের নীতিগত অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এটি আইনে পরিণত হলে পারিবারিক পরিসরে নারীর আইনি সুরক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটবে, এমন আশা আমাদের রয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে কেবল আইন প্রণয়নই যে যথেষ্ট নয়, এর প্রমাণ পাওয়া গেল তৃতীয়বারের মত কন্যা সন্তান জন্ম দেয়া এক মায়ের করুণ পরিণতির সংবাদে। নারীর প্রতি এমন দৃষ্টিভঙ্গি ও সহিংসতার মূলে আছে আমাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মনোভাব। এ ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা না গেলে শুধু আইন দিয়ে এ ধরনের আচরণ ও সহিংসতা পুরোপুরি বন্ধ করা যাবে না।

সামাজিকভাবে লোকজন দিন দিন সচেতন হলেও ধারাবাহিকভাবে ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ ও নারীদের উত্যক্তের মত নানা নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। এখনো কন্যা সন্তান জন্ম দেয়ার কারণে প্রাণ দিতে হয় মাকে। বাস্তবে নারীর অসহায়ত্ব যে কতটা ব্যাপক, তা আবারও স্পষ্ট হলো 'তৃতীয়বারও মেয়ে হওয়ায় মরতে হলো সাহেরা'কে শীর্ষক সংবাদে। পারিবারিক সহিংসতা আইনের নীতিগত অনুমোদনের খবর যেদিন পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, সেই মঙ্গলবারের প্রথম আলোতেই প্রকাশিত এই সংবাদটি দেশের সামাজিক পরিস্থিতির একটি দিক তুলে ধরে। যে দেশে এখনো কন্যাশিশু জন্ম দেয়ার জন্য মাকে জীবন দিতে হয়, সেখানে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষার কাজটি একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে রয়ে গেছে – এ উপলব্ধি নিয়ে এ বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। সাহেরার উপর নির্যাতন ও তাকে হত্যার শাস্তি নিশ্চিত করা জরুরি। প্রতিনিয়ত নানাভাবে এমন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হচ্ছে বহু নারীকে। কিন্তু সাহেরাকে যে মানসিকতার বলি হতে হয়েছে, সেই মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে এখনো। নারীর এই অসহায়ত্ব কোনো ধর্ম–বর্ণ–শ্রেণীর গণ্ডি মানে না। তাই নারীর প্রতি যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা প্রদানে পরিবারের

---

[১] উইমেন ফর উইমেন স্টুডেন্টস রিপোর্ট, ঢাকা ২০০৯, পৃ.১০

Dhaka University Institutional Repository

সদস্যদের বিশেষ করে পুরুষদের মানসিকতায় ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনা জরুরি। প্রয়োজন শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি। নারী নির্যাতনের দীর্ঘ মেয়াদি সমাধান হলো নারীর ক্ষমতায়ন। পরিবারসহ সব জায়গায় নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করা হলে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। এ কাজ কঠিন কিন্তু সবার জন্য একটি মানবিক পৃথিবী গড়ে তুলতে এতে আমাদের সফল হতেই হবে।[১]

সারা দেশে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল মামলাজটে পড়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, সময় মতো অভিযোগপত্র (চার্জশিট) না হওয়াই এর প্রধান কারণ। প্রতিদিন যে হারে মামলা হচ্ছে, সেই হারে অভিযোগপত্র দাখিল হচ্ছে না। আবার নিস্পত্তি হওয়া মামলার ৯৬ শতাংশই নিম্ন আদালতে খারিজ হচ্ছে। এর কারণ হিসেবে প্রাথমিক তথ্যবিবরণী (এফআইআর) দুর্বল, তদন্তে অবহেলা এবং সাজানো মামলাকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন আইনজীবিরা। ...... ঢাকার সিএমএম আদালতে ২০০৯ সালে নারী নির্যাতনের ১৩১১টি মামলার মধ্যে ২২৮টি ধর্ষণের আর বাকি ১২২৯টি মামলা যৌতুক, প্রতারণা ও আত্মহত্যায় প্ররোচিত করাসহ বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন সংক্রান্ত। নারী শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত বিশেষ আদালতে বিচার না পাওয়ার বিষয়ে অনুসন্ধানে ভয়াবহ যে তথ্য পাওয়া গেছে তা হলো, এই আইনের আওতায় ঘটনার মীমাংসা বা আপোসের কোনো এখতিয়ার না থাকলেও সে ধরনের একাধিক ঘটনার উদ্যোগ নিতে দেখা গেছে। .... ঢাকার বাইরের চিত্রও একই রকম। রাজশাহীতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিষয়ে বিশেষ ট্রাইবুনাল রয়েছে ২টি। সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, ২০০৯ সালে মোট ৫২০টি মামলার নিস্পত্তি হয়েছে। এরমধ্যে সাজা হয়েছে মাত্র ২১টিতে। অর্থাৎ এখানেও ৯৬ শতাংশ মামলায় বেকসুর খালাস পেয়েছেন অভিযুক্ত ব্যক্তিরা।[২]

গ্রামের মানুষ অনেক সময় বড় অপরাধের শিকার হয়েও আইন–আদালত এড়িয়ে চলতে চায়। তারা সালিসের আশ্রয় নেয়াকে কম ঝামেলাপূর্ণ মনে করে। কিন্তু গ্রাম্য সালিসে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এমন সব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, যা রীতিমতো নির্যাতন ও মানবাধিকার লংঘনের পর্যায়ে পড়ে। এ ধরনের সালিসকে প্রভাবিত করার আশঙ্কাও থাকে বেশি।

গতকাল বুধাবারের প্রথম আলোয় গর্ভপাত এবং পরবর্তী সালিসের ঘটনা নিয়ে দুটি প্রতিবেদন সবার দৃষ্টি কেড়েছে। নোয়াখালির কোম্পানিগঞ্জে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে এক নারীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক

---

[১] নারী নির্যাতন ও উন্নয়ন বিষয়ক কারিতাস কর্মশালা পত্র, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ.১২

[২] প্রাগুক্ত, পৃ.২৪ ও ২১

Dhaka University Institutional Repository

ও গর্ভপাতের ঘটনায় মা-মেয়েকে দোররা মারা হয়েছে। অন্যদিকে নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় এক সালিসে একই ধরনের ঘটনায় গর্ভপাতের জন্য নারীকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে যে ৫০ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিলো, তা মাতবরেরাই ভাগ-বাটোয়ারা করে খেয়েছেন। নারীর প্রতি অবিচারের চিত্রই তুলে ধরছে এ দুটি ঘটনা।

আমাদের মনে রাখা জরুরি, এ ধরনের সালিসের কোনো আইনি বৈধতা নেই। প্রায় ক্ষেত্রেই তা ক্ষমতাবানের হাতে দুর্বলকে লাঞ্ছিত করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যে কোনো সালিসের ঘটনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নারী-পুরুষ সংশ্লিষ্ট অপরাধে নারীকেই অপরাধী হিসেবে দায়ী করা হয়। এটি পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার প্রকাশ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। সমাজপতি বা মাতবরেরা অপরাধী-পুরুষকে বাঁচাতেই যে মনগড়া মতবাদ খাড়া করেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দোররা মারার ফতোয়া বরং অপরাধীকেই আরও উৎসাহিত করে।

সালিসের নামে এ ধরনের স্বেচ্ছাচার মেনে নেয়ার কোনো সুযোগ নেই। সালিসকারীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে হবে। প্রশাসনের কঠোর দৃষ্টিভঙ্গিই এ ধরনের অনাচার ঠেকাতে পারে। আমরা সংশ্লিষ্ট সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।[১]

চাঁদপুরের হাজিগঞ্জ উপজেলা সহকারি প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে একাধিক শিক্ষিকার সঙ্গে অশালীন আচরণ করার অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া গেছে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এ কথা জানান। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, সহকারি শিক্ষা কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত উপজেলার ৬ থেকে ৭ জন শিক্ষিকা অশালীন আচরণ করার অভিযোগ এনে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বরাবর লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।[২]

আইন বলছে, ১৮ বছরের নিচে মেয়েদের বিয়ে দেয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। অথচ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন তথ্যমতে, দেশে বর্তমানে গড়ে সাড়ে ১৫ বছর বয়সে মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যৌতুকের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার বিষয়গুলোকে মেয়েদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দেয়ার কারণ হিসেবে দেখাচ্ছেন অভিভাবকেরা।

---

[১] নারী নির্যাতন ও উন্নয়ন বিষয়ক কারিতাস কর্মশালা পত্র, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১০ পৃ.১০

[২] উইমেন ফর উইমেন স্যাভেনির, পূর্বোক্ত, পৃ.৭

Dhaka University Institutional Repository

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পপুলেশন রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিংয়ের (নিপোর্ট) প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই ৬৬ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয় এবং দুই দশক ধরে এ হার প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে। এদিকে বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে ২০০৭ (বিডিএইচএস) অনুযায়ী এ হার ৭০ শতাংশের কাছাকাছি। একই প্রতিবেদনে মেয়েদের গড় বিয়ের বয়স সাড়ে ১৫ বছরে দাঁড়িয়েছে বলে দাবি করা হয়। বিশ্বের যে কয়টি দেশে বাল্যবিবাহের হার বেশি, এর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। সরকার থেকে অবৈতনিক শিক্ষা, উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও কমছে না এ প্রবণতা। এমনকি আইন করে ১৮ বছরের নিচে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ বলা হলেও বাল্যবিবাহ ঠেকানো যাচ্ছে না।

দেশে বর্তমানে ১৩ থেকে ১৪ বছর বয়সেই মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে বেশি। বাল্যবিবাহ এবং অল্প বয়সে সন্তান ধারণের প্রবণতা পরিবর্তনে মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষা এবং গ্রামের মেয়েদের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি কিশোরীদের মধ্যে বালবিবাহবিরোধী কণ্ঠস্বর জোরদারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলছে নারী ও শিশু বিষয়ে কর্মরত সংস্থাগুলো।

ইউনিটারিয়ান সার্ভিস কমিটি কানাডার (ইউএসসি) তথ্য উল্লেখ করে বিশেষজ্ঞ এম এ জামান বলেন, ৭০ শতাংশ ক্ষেত্রে কণের বয়স ১৮ বছরের নিচে এবং ২৬ শতাংশের ক্ষেত্রে ১৩ বছরের মধ্যে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়ায় পরিস্থিতির ভয়াবহতা বাড়ছে। সামগ্রিক পরিস্থিতি পাল্টাতে হলে অভিভাবকদের সচেতনতা বাড়ানোর দিকে জোর দিতে হবে।' সেটা কীভাবে সম্ভব সে প্রশ্নে তিনি বলেন, বাল্যবিবাহের ফলে তাদের সন্তানদের মৃত্যুঝুঁকি বেড়ে যাওয়ার বিষয়গুলো বেশি করে জানানো এবং বয়স বাড়লেও বিয়ে হবে আবার যৌতুকের পরিমাণ বাড়বে না বলে নিশ্চয়তা দেয়া গেলে কোনো অভিভাবকই তাদের সন্তানদের এই পরিস্থিতির মুখোমুখি করতে চাইবেন না। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম বলেন, 'মেয়েপক্ষ মনে করে কম বয়সে বিয়ে না দিলে পরে অনেক বেশি যৌতুক দিতে হবে। এটা ভাবে না যে কম বয়সে বিয়ে দিলেও পরে যৌতুকের চাহিদা থাকে এবং সময়ে সময়ে তা বাড়তেও পারে।'

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও জাতিসংঘ শিশু তহবিলের (ইউনিসেফ) যৌথ জরিপ 'প্রগতির পথে'র তথ্য মতে, উত্তরাঞ্চলের চরাঞ্চল এবং বরেন্দ্র এলাকায় ২০ থেকে ৪৯ বছর বয়সী নারীদের ৭৪ শতাংশই ১৮ বছর হওয়ার আগে বিয়ে হয়েছে। তারা বলছে, 'দারিদ্র্য, মেয়েশিশুর নিরাপত্তা, পরিবারের সম্মান রাখার দায় – এসবই বাল্যবিবাহের মূল কারণ।'

Dhaka University Institutional Repository

পরিস্থিতির বর্ণনায় জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতির নির্বাহী পরিচালক সালমা আলী বলেন, 'কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষত যেখানে অর্থনৈতিক অবস্থা নাজুক, অভিভাবকেরা মাথা থেকে বোঝা নামানোর জন্য নারী পাচারকারীদের সঙ্গেও বিয়ে দিতে দ্বিধা করেন না।' ভয়াবহ বাল্যবিবাহের এলাকা হিসেবে চিহ্নিত রাজশাহী অঞ্চলের ৬৫.২ শতাংশ কিশোরীর বিয়ে হয় ১৫ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে। বর ও কনের বয়সের পার্থক্যটা অনেক বেশি।

ইউএনএফপিএর গবেষণা মতে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর ১০ থেকে ১৭ বছর বয়সী ৮ কোটি ২০ লাখ কন্যাশিশুর বিয়ে হয় প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে। এরা মানসিক, শারীরিক ও যৌনজীবনে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। বাল্যবিবাহের কারণে স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার বাড়ছে এবং সামাজিক যোগাযোগের সুযোগ কমছে। ৫৫ শতাংশ কন্যাশিশু মাধ্যমিকে ঝরে পড়ে বিয়ের পর স্বামীর সংসারে কায়িকশ্রম দেয়ার কারণে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক সুলতানা কামাল বাল্যবিবাহের কারণের কথা বলতে গিয়ে প্রথমে দায়ী করেন সর্বজনীন পারিবারিক আইন না থাকাকে। তিনি বলেন, "জন্মনিবন্ধন না থাকার কারণে মেয়েদের প্রকৃত বয়স প্রমাণের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। অপ্রাপ্তবয়স্ক যে কাউকে টাকার বিনিময়ে প্রাপ্তবয়স্ক বানিয়ে দেয়ার অবৈধ পদ্ধতি শক্ত হাতে প্রতিহত না করলে বাল্যবিবাহ ঠেকানো অসম্ভব। ইউএনএফপিএ, জাতীয় মহিলা আইনজীবি মহিলা সমিতি ও নওগাঁ হিউম্যান রাইট্স ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের পৃথক গবেষণায় কন্যাশিশুকে সামাজিক নিরাপত্তা না দিতে পারা, বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না হলে এসিড সন্ত্রাসের শিকার হওয়ার ভীতির সম্ভাবনার বিষয়কে বাল্যবিবাহের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[১]

দিন দিনই নারী কর্মীবির সংখ্যা বাড়ছে আর এ সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে তাদের যাতায়াত সমস্যা। অফিস সময়ে রাজধানীর প্রায় প্রতিটি বাসস্ট্যান্ডে অনেক নারী কর্মজীবিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। বাসের পর বাস আসে, পুরুষ যাত্রীদের উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়, নারী যাত্রীরা কেবল অসহায়ভাবে তাকিয়ে দেখেন। পুরুষদের সাথে প্রতিযোগিতা করে যেমন অনেকের পক্ষে ওঠা সম্ভব হয় না তেমনি বাসগুলোও নারী যাত্রীদের বাসে তুলতে চায় না। ফলে অফিস সময়ের অনেক আগে বাসা থেকে বেরোলেও তাদের পক্ষে সময়মত অফিসে যাওয়া সম্ভব হয় না।

---

[১] আইন ও সালিশ কেন্দ্র জরিপ ২০০৯, পৃ.২৪-২৩

Dhaka University Institutional Repository

গতকাল বৃহস্পতিবারের প্রথম আলোয় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, শুধু কর্মজীবি নারীদেরই নয়, স্কুল-কলেজগামী ছাত্রীদেরও একই অবস্থা। অনেক বাসের হেলপার নারী যাত্রীদের বাসে উঠতেই দেয় না। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, একজন নারী যাত্রীর জায়গায় চারজন পুরুষ যাত্রী নেয়া যায়, পুরুষ যাত্রীদের তুলনায় নারী যাত্রীদের ওঠানামায় সময় বেশি নেয় প্রভৃতি। আবার কেউ কেউ ধাক্কাধাক্কি করে বাসে উঠলেও নারীদের জন্য সংরক্ষিত স্থানে বসে থাকা পুরুষ যাত্রীরা আসন ছাড়েন না। ফলে তাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই যেতে হয়।

রাজধানীর অনেক সড়কেই এখন রিকশা চলাচল নিষিদ্ধ। স্কুটার, ট্যাক্সিক্যাবে মিটার থাকলেও কেউ মিটারে যাবে না। অফিস সময়ে ৩০ টাকার ভাড়া হাঁকবে ৭০ থেকে ৮০ টাকা। আবার কাছাকাছি দুরুত্বে তারা যাবেই না। এরপর যদি বাসেও উঠা না যায় তাহলে নারী কর্মজীবি বা স্কুল-কলেজগামী ছাত্রীদের চলাচলের উপায় কী? পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (ট্রাফিক) এসব ক্ষেত্রে কর্তব্যরত সার্জেন্টদের সহায়তা নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু অনেক নারী যাত্রীর অভিযোগ, সার্জেন্টদের বলতে গেলে তারা পাত্তাই দেন না। আবার বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) পরিচালক বলেছেন, এসব ব্যাপারে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা গেলে ভালো হতো, কিন্তু সে পরিমাণ লোকবল তাদের নেই।

তাহলে এসব আইন, নিয়মকানুন করে লাভ কী? আর কত দিন ধরে কাজির গরু কেবল কেতাবেই থেকে যাবে? নারীর ক্ষমতায়ন, সমানাধিকার, নারীদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা প্রভৃতি গালভরা কথা শুনিয়েই বা কী লাভ? আমরা আশা করি, নারীর যাতায়াতের ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিকূলতা দূর করতে কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হবে।[১]

আক্ষরিক অর্থেই গৃহবধূ ফাতেমা বেগম (২৫) মানুষের নীচতা, নৃশংসতা আর পৈশাচিকতার জ্বলন্ত নজির হয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় ভুগছেন। শরীরে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে তার বুক থেকে কোমর পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিয়েছে তার স্বামীসহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন। সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার মর্যাদাপুর গ্রামে গত ৫ সেপ্টেম্বর এ ঘটনা ঘটেছে। যৌতুক দিতে না পারার জন্যই তার জীবনে নেমে এল এমন অভিশাপ। যৌতুক আইনত নিষিদ্ধ। কিন্তু সেই যৌতুকের জন্যই কি না তাকে পুড়তে হলো লোভের আগুনে। আবারও প্রমাণিত হলো, কেবল আইন করলেই হয় না, সেই আইনের কঠোর

[১] আইন ও সালিশ কেন্দ্র জরিপ ২০০৯, পৃ.১২

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োগ এবং মানুষের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন প্রয়োজন। এছাড়া নারীর জন্য নিরাপদ পারিবারিক জীবন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

সমাজে অপরাধ কম-বেশি একটা মাত্রায় থাকবেই। কিন্তু নারীকে বীভৎস নির্যাতন করা এবং আগুন বা এসিডে পোড়ানোর মত পাশবিক অপরাধ কোনোভাবেই চলতে পারে না। অথচ কিছুদিন পরপর সেটাই ঘটতে দেখা যাচ্ছে। আগুনে পোড়ানো কিংবা এসিড ছুঁড়ে মারার মতো জঘন্য উপায়ই হয় এসব পাষণ্ডের অবলম্বন। এবং চিন্তার কথা যে, এ ধরনের কার্যকলাপের বেশির ভাগই হয় পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে। অথচ পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যেই মানুষ সবচেয়ে নিরাপদ বোধ করে অভ্যস্ত। কিন্তু সেখানে যদি এই মাত্রায় সহিংসতার বীজ লুকিয়ে থাকে, তাহলে কীভাবে একজন তার নিকটজনদের বিশ্বাস করবে? অবশ্য এ কথা ঠিক যে, অধিকাংশ পরিবারের সঙ্গে ফাতেমার স্বামীর পরিবারের কোনো তুলনা চলে না।

ফাতেমা বাঁচতে চেয়েছেন। আমাদের আশা, চিকিৎসকেরা তাকে বাচিয়ে রাখার সর্বোচ্চ যা করা দরকার তা করবেন। কিন্তু কোনো সমাজে তিনি বেঁচে থাকতে চাইছেন? এখনো বেশিরভাগ পরিবার পুরুষপ্রধান এবং নারী সেখানে তুচ্ছ হিসেবে চিহ্নিত হয়। মানুষ হিসেবে নারীল মর্যাদা এখনো সুদূরপরাহত। নইলে যৌতুকের মত অমানবিক অসভ্য প্রথার জন্য এখনো অজস্র নারীকে নিপীড়ন সইতে হতো না। একদিকে সরকার ও বেসরকারি সংস্থাগুলো যখন নারী উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি শ্লোগান নিয়ে অঢেল অর্থ খরচ করে উদ্যোগ নিয়ে চলছে, অন্যদিকে চোখের সামনে ঘটে চলছে নারীর উপর অনাচার। পরিস্থিতি বদলের জন্য দৃষ্টিভঙ্গি বদলের প্রয়োজন। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ রাষ্ট্রের সব প্রতিষ্ঠানকে নারীবান্ধব হওয়া প্রয়োজন। এর জন্য শিক্ষাসহ সর্বস্তরে নারীকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করার প্রণোদনা থাকতে হবে। পাশাপাশি এ ধরনের ঘটনা ঘটলে দ্রুত বিচার ও কঠিনতম শাস্তির ব্যবস্থা করার বাধ্যবাধকতা বিনা শর্তে পালিত হতে হবে।[১]

গত ১৪ মে হাইকোর্ট যৌন হয়রানী রোধে একটি যুগান্তকারী রায় দিয়েছিলেন। রায়ে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে অভিযোগকেন্দ্র গঠনসহ বিভিন্ন নির্দেশনা দেয়া হয়। বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন ও বিচারপতি কামরুল ইসলাম সিদ্দিকীর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ রায় ঘোষণা করেছিলেন। সংবিধানের ১১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাইকোর্টের দেয়া দিক নির্দেশনামূলক রায় পালন করা

[১] নারী নির্যাতন রোধ বিষয়ক কর্মশালা পত্র ব্র্যাক ২০০৯, পৃ.১২

Dhaka University Institutional Repository

বাধ্যতামূলক। তবে ৭ মাস পরও রায়টি সম্পর্কে অনেক প্রতিষ্ঠান তেমন কিছু জানে না; জানলেও নির্দেশনা অনুযায়ী কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।[১]

সমাজে বিদ্যমান পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সবচেয়ে ঘৃণ্য প্রকাশ এসিড নিক্ষেপ। সর্বশেষ ২৮ অক্টোবর এসিড সন্ত্রাসের শিকার হলেন কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার কমলাপুরের শিলা ও নিলুফার। বিয়ের এক দিন আগে দুর্বৃত্তের ছোড়া এসিড অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিয়েছে শিলার স্বপ্ন। শিলার (২০) সঙ্গে এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন তার বড় বোন নিলুফারও (২৫)।

দেশজুড়ে এসিড সন্ত্রাস বিরোধী নানা প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু তার পরও এসিড সন্ত্রাসের ভয়াবহতা থেকে নারীদের রক্ষা করা যাচ্ছে না। এসিড সন্ত্রাস বন্ধ করতে এসিডের সহজলভ্যতা বন্ধ করা জরুরি। কিন্তু অসংখ্যবার উচ্চারিত এ বিষয়টি নিয়ে নীতিনির্ধারকদের কোনো মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না।

উপরোক্ত এসিড সন্ত্রাসের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে একই এলাকার মিরাজ হোসেন (২৫), মনোয়ার হোসেন (১৮), রেজাউল (১৮) ও আইয়ুব আলীর (২৫) বিরুদ্ধে খোকসা থানায় মামলা করেছেন শিলার বাবা ইদ্রিস আলী। আইনের ফাঁক গলিয়ে অপরাধীরা যেন কোনোভাবেই রক্ষা পেতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। এসিড নিক্ষেপের বিভিন্ন ঘটনায় দেখা গেছে, পুলিশের ধীরে চল নীতি কোনো ফল দেয় না। এসিড নিক্ষেপের মত ভয়াবহ ঘটনায় আমরা পুলিশের আরও ত্বরিত পদক্ষেপ প্রত্যাশা করছি।

প্রথম আলোয় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ১৯৯৯ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ১৮০৫ জন নারী ও ৭১৪জন শিশু এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন। এ সংখ্যা যে কোনো সভ্য দেশের জন্য উদ্বেগজনক। এসিড নিক্ষেপের মত নৃশংস ও পৈশাচিক অপরাধ হ্রাস করতে আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের কোনো বিকল্প নেই। আমরা ঘটনার দ্রুত বিচার দাবি করছি।[২]

পথে–ঘাটে বখাটেরা শিশু, কিশোরী ও নারীদের হরহামেশাই উত্যক্ত করে। মুঠোফোন, ইন্টারনেটেও নানাভাবে নারীদের উত্যক্ত করা হয়। নারী নির্যাতনের নানা রূপের মধ্যে এটি প্রতিনিয়ত ঘটলেও এর

[১] উইমেন ফর উইমেন, পূর্বোক্ত, পৃ.২০

[২] হাসান জামান, *একুশ শতকের বাংলাদেশে নারী*, ঢাকা ২০০৯, পৃ.১০

Dhaka University Institutional Repository

আপাত অহিংস চেহারার কারণে তা সাধারণত গোচরে আসে না। সমাজে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের প্রাধান্যের ফলে একে অপরাধ হিসেবে না দেখে স্বাভাবিক বিষয় মনে করার চল আছে। নারীর উপর এই নির্যাতনের প্রভাব যে কত ভয়াবহ হতে পারে, উত্যক্ত হওয়া থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য নারীদের আত্মহত্যার ঘটনা থেকেই তা অনুধাবন করা যায়।

বখাটেদের উৎপাতে নিজের জীবন বাঁচাতে পানিতে পড়ে মারা গেছে তৃষা। নারায়নগঞ্জের চারুকলার ছাত্রী সিমি এবং খুলনার রুমি উৎপাত থেকে রক্ষা পেতে আত্মহত্যা করেছেন। বখাটেদের উৎপাতে স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের একটি অংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়তে বাধ্য হয়। অনেক অসহায় অভিভাবক মেয়েদের বাল্যবিবাহের মাধ্যমে উৎপাত থেকে উদ্ধারের পথ খুঁজে নেন।

স্থানীয়ভাবে এ সমস্যা মোকাবিলার উদ্যোগের উপর গত রবিবার প্রথম আলোর দুটি সংবাদ বেশ আশাপ্রদ। একটি সংবাদ থেকে জানা যায়, হবিগঞ্জ জেলার পইল গ্রামের বাসিন্দারা সালিসে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কোনো স্কুলছাত্রী বা তরুণীকে উত্যক্ত করলে বখাটেদের জরিমানা করা হবে। অন্যদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আখাউড়া পৌর শহরে স্কুল ছাত্রীকে লাঞ্ছিত করায় সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দেশের অন্যান্য এলাকার লোকজন এভাবে জেগে উঠলে এ ধরনের ঘটনা অনেক কমবে। সাম্প্রতিক সময়ে এ সমস্যা প্রতিহত করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু ইতিবাচক ঘটনা দেখা গেছে। বিশেষ করে, এ বছরের ১৪ মে হাইকোর্ট একটি যুগান্তকারী রায় দিয়েছেন – উত্যক্ত করাকে যৌন হয়রানিমূলক অপরাধ হিসেবে বিবেচনার কথা বলা হয়েছে রায়ে।[১]

কিন্তু শুধু আইন করেই কি ঠেকানো যাবে এ অপরাধ? আমাদের অনেক আইন আছে, অনেক কাজই আইন দিয়ে হয় না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর বেড়ে ওঠা ও সামাজিকীকরণ ঘটে নাজুকতার মধ্য দিয়ে; এর সুযোগ নেয় বখাটেরা। নারীকে নাজুক রেখে এর অবসান হয়তো ঘটানো যাবে না। উত্যক্ত করা থেকে নারীরা কি রেহাই পাবে না – এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা আমরা করেছিলাম ২০০৭ সালের ১২ সেপ্টেম্বর এক গোলটেবিল বৈঠকে। এ বিষয়ে নানা জায়গা থেকে যারা কাজ করেন, নাগরিক সমাজের সেসব মানুষের কণ্ঠে সেদিন আশার কথা শোনা গিয়েছিলো; এই আশাবাদের মূলে ছিলো মানসিকতা বদলে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার স্বপ্ন, সব মানুষকে সচেতন করে তোলা, তাদের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানোর আকাঙ্ক্ষা। এ জন্য

---

[১] ড. নুরুল ইসলাম, *সামাজিক সমস্যা গবেষণাপত্র*, ঢাকা ২০১২, পৃ.২৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজন জোরদার সামাজিক আন্দোলন। সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া এই সামাজিক সমস্যা প্রতিহত করা যাবে না।[১]

সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের হিসাব, দেশের প্রায় ৩৩ শতাংশ গর্ভধারণ অপরিকল্পিত। ইচ্ছার বিরুদ্ধে গর্ভধারণের কারণে অনেকে গর্ভপাত ঘটান। অধিকাংশ সময় সেই গর্ভপাত হয় অনিরাপদ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মতে, বাংলাদেশে ১৪ শতাংশ মাতৃ মৃত্যুর কারণ অনিরাপদ গর্ভপাত। অপরিকল্পিত এই গর্ভধারণ ও গর্ভপাতের পুরো ঝক্কি পোহাতে হয় নারীকে।

দুই সন্তানের জননী গৃহবধূ নাজমা ইচ্ছার বিরুদ্ধে তৃতীয়বারের মত গর্ভধারণ করেন। অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তান নষ্ট করার জন্য হাতুড়ে চিকিৎসকের কাছে গর্ভপাত করান। শারীরিক জটিলতা দেখা দেওয়ার পর তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে (সেপটিক) ভর্তি হয়েছিলেন। গত জুলাই মাসে প্রথম আলোর কাছে নাজমা শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার কথা বলেছিলেন। হাসপাতালে ভর্তির ২মাস ১০দিন পর তিনি মারা যান। নাজমার বড় বোন জমিলা প্রথম আলোকে বলেন, সন্তান রাখা না রাখার ব্যাপারে নাজমার স্বামী কোনো খোঁজ নেননি, হাসপাতালের খরচও দেননি।

নিরাপদ মাতৃত্ব নিয়ে কাজ করে ইন্টারন্যাশনাল প্লানড পেরেন্টহুড ফেডারেশন। এই আন্তর্জাতিক এনজিওটির কাগজপত্র বলছে, বাংলাদেশে বছরে প্রায় ৪০ লাখ নারী গর্ভধারণ করেন। তাদের মধ্যে ১৩ লাখই থাকেন অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ। পরিবার–পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সঠিক ব্যবহার না জানা, পদ্ধতির স্বল্পতাই অপরিকল্পিত গর্ভধারণের মূল কারণ।

জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতির অধিকাংশই নারীর ব্যবহারের জন্য। পুরুষের ব্যবহারের জন্য কনডমই একমাত্র পদ্ধতি। পরিবার–পরিকল্পনা কর্মীরা বলছেন, নারীর তুলনায় কমসংখ্যক পুরুষ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করেন। রায়ের বাজারের একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের আয়া মিনু (ছদ্মনাম) বলেন, স্বামী জন্মনিয়ন্ত্রণের কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করেন না। স্বামীর ইচ্ছা অনুসারে যৌন কাজে সম্মতি দিতে হয়। তা না হলেই স্বামী শারীরিক নির্যাতন করেন। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মিনু গর্ভধারণ করেন। পাঁচ মাস পর গর্ভপাত করে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

এনজিও মেরি স্টোপস প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা দেয়। এনজিওটির পরিচালক (প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট) কাজী গোলাম রসূল বলেন, "অনিরাপদ গর্ভপাতের পর ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলেও অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ,

[১] হাসান জামান, পূর্বোক্ত, পৃ.১২

Dhaka University Institutional Repository

জরায়ু, মূত্রনালি এবং অন্ত্রনালি ছিদ্র হয়ে যাওয়া, প্রস্রাব ও পায়খানার রাস্তা ছিড়ে এক হয়ে যাওয়া, বন্ধ্যাত্বের শিকার হওয়াসহ বিভিন্ন জটিলতার সম্মুখীন হন নারীরা।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রিভেনশন অব সেপটিক এবরশনের পরিচালক আলতাফ হোসেন বলেন, অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তান না রাখতে চাইলে তার পথও খোলা আছে। নারীর শেষ মাসিকের প্রথম দিন হিসাবে ৬ থেকে ১০ সপ্তাহের মধ্যে এমআর বা মাসিক নিয়মিত করার পদ্ধতি (যে কোনো কারণে মাসিক বন্ধ থাকলে তা নিয়মিত করে দেয়া) বৈধ। তিনি বলেন, অনেক স্বামী নিজে সচেতননা হয়ে নিরাপদ ব্যবস্থা হিসেবে এমআরকে বেছে নেন। এটা স্ত্রীর শারীরিক ক্ষতির কারণ, তা আমলে নেন না।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগের সহকারি অধ্যাপক নার্গিস আকতার বলেন, শারীরিক কারণে অনেক নারী স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন না। তাঁদের স্বামীরাও কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করেন না। তাই কোনো কোনো নারীকে ২/৩ বার পর্যন্ত এমআর করে দিতে হচ্ছে।

রিপ্রোডাকটিভ হেলথ সার্ভিসেস ট্রেনিং অ্যান্ড এডুকেশন প্রোগ্রামের (আরএইচস্টেপ) নির্বাহী পরিচালক কাজী সুরাইয়া সুলতানা বলেন, দেশে বহু বিবাহের প্রবণতা বেশি। এছাড়া অনৈতিক সম্পর্ক করার ঝুঁকিও আছে। তাই একজন পুরুষ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করলে অনেক ক্ষেত্রে একাধিক নারী অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণের হাত থেকে রেহাই পেতে পারেন।

সংশ্লিষ্টদের মতে, অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণের কুফল সম্পর্কে গণমাধ্যমে প্রচার বাড়ানো জরুরি। পাশাপাশি পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য পরিবার-পরিকল্পনা কর্মসূচিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনা দরকার বলে অনেকে মনে করেন।[১]

দোররা মারার মধ্য দিয়ে নারীর প্রতি সহিংসতার ধরন আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সূত্র মতে, গত এক মাসে দেশের তিনটি অঞ্চলে গ্রাম্য সালিসে দোররা মারা হয় ৪জন নারীকে। এরমধ্যে সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটে নোয়াখালির কোম্পানিগঞ্জ থানার চর কাঁকড়া গ্রামে।[২]

[১] নারী নির্যাতন বিরোধী কনভেনশন, ঢাকা, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ.৩

[২] উইমেন ফর উইমেন, পূর্বোক্ত, পৃ.১৩

Dhaka University Institutional Repository

'আন্তর্জাতিক নারী দিবসেই পৃথিবীর মায়া কাটালেন গৃহবধূ সিদ্ধা দাস সোমা (২২)। রেখে গেলেন ৪৬ দিনের মারাত্মক অসুস্থ্য-অবুঝ শিশুপুত্রকে। অনেক আশা নিয়ে, একমাত্র মেয়ের সুখের কথা ভেবে কানাডা প্রবাসী পাত্র সমীরের সঙ্গে বাবা গণেশ দাস তার বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তার আর সুখ জোটেনি, জুটেছে পাশবিক নির্যাতন। বিয়ের মাত্র ৪ মাসের মাথায় শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার তাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাবার বাড়িতে চলে আসতে বাধ্য করেছিলো। স্বামী সমীর গোপনে সটকে পড়েছিলো কানাডায়। শারীরিক ও মানসিকভাবে চরম বিপর্যস্ত সোমা অবশেষে ৮ মার্চ রাতে ঘুমের মধ্যেই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান।[১]

১৫ বছরের কিশোরীকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে ১০ নরপশু। নন্দীপাড়ায় এক বাড়ির একটি ঘরে বড় বোনের সঙ্গে ভাড়া থাকত ওই কিশোরী। নরপশুদের হামলার মুখে ওই কিশোরীকে নিয়ে তার বড় বোন আশ্রয় নিয়েছিলেন বাড়ির তত্ত্বাবধায়কের ঘরে। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। তত্ত্বাবধায়কের সামনেই তাকে তুলে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা, ওই বাড়িতেই অন্য এক ঘরে কিশোরীর উপর চলে অমানুষিক বর্বরতা।

রোববারের প্রথম আলোর ২১ পৃষ্ঠায় এক প্রতিবেদনে ছাপা হয়েছে সেই বর্বরতার বিবরণ। পোশাককর্মী বড় বোনটি তার ১৫ বছরের কিশোরী বোনকে সঙ্গে নিয়ে ওই বাড়ির একটি ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন। তাদের সঙ্গে কোনো পুরুষ থাকে না বলে বখাটেরা বলে, তারা খারাপ মেয়ে। আর কী বিস্ময়, কী করুণ অসহায়ত্ব যে, বখাটে যুবকেরা বড় বোনকে আটকে রেখে ছোট বোনটিকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যায় নিজেদের ঘরে। তারপর কিশোরীর আর্তচিৎকার শোনা যায়। কিন্তু বখাটে যুবকদের ভয়ে কেউই মেয়েটির সাহায্যার্থে এগিয়ে যায়নি। অল্প কিছু সময় আর্তচিৎকারের পর আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি।

নিশ্চয়ই তারপর নেমে এসেছিলো এক ভয়াবহ নৈশব্দ। এমন নৈশব্দ ব্যঙ্গ করে রাষ্ট্র, সরকার, সমাজের সমস্ত নীতি-আদর্শকে। মানুষ হিসেবে, নারী হিসেবে, রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকার, স্বাভাবিক জীবন যাপন করার ন্যূনতম অধিকার যখন এভাবে ধূলিসাৎ হয়, তখন নির্বাক হতে হয়।

---

[১] সৌমিত্র মানব, আন্তর্জাতিক নারী দিবসেই নির্যাতনে গৃহবধূ সোমার মৃত্যু, সাপ্তাহিক ২০০০, ১২ মার্চ ২০১০ বর্ষ ১২ সংখ্যা ৪৪, পৃ.৪৪

পুলিশের বর্ণনামতে, রাজধানীর খিলগাঁওয়ের ওই এলাকায় মূলত নিম্নবিত্ত খেটে খাওয়া মানুষের বাস, যেখানে মাদকদ্রব্যের অবৈধ ব্যবহার যথেষ্ট। নারী ধর্ষণ ও তাদের উত্যক্ত করার ঘটনা ওই এলাকায় অপেক্ষাকৃত বেশি। গত কয়েক বছরে সেখানে স্কুলছাত্রী ও পোশাকশিল্পের নারী কর্মীদের উপর নির্যাতনের বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি। কর্তৃপক্ষ যেন ধরেই নিয়েছে, এলাকাটির জন্য এসবই স্বাভাবিক।

কিন্তু এভাবে চলতে পারে না। ধর্ষণের শিকার কিশোরীটি বাদী হয়ে ১০ ধর্ষক ও তাদের ২ সহযোগীসহ ১২ জনকে আসামি করে মামলা করেছে। এক ধর্ষককে গ্রেপ্তার ও ২ সহযোগীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। আসামিদের একজন রাজীব খিলগাঁও থানা কৃষকলীগের সভাপতির ছেলে। সরকারি দল বা তার অঙ্গসংগঠনগুলোর সঙ্গে জড়িত লোকদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগে গড়িমসি চলে। এ ক্ষেত্রে যেন তা না হয়। অবিলম্বে রাজীবসহ বাকি সব ধর্ষককে গ্রেপ্তার করা হোক। সেই সঙ্গে ধর্ষণের শিকার কিশোরী ও তার বোনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হোক।[১]

পত্রিকার এ সকল খবর, প্রতিবেদন, সম্পাদকীয়, গবেষণা ইত্যাদি থেকে বর্তমান বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের নাজুক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। লক্ষ্যনীয়, নারী নির্যাতনের ঘটনাগুলো দেশের প্রভাবশালী এবং সবচেয়ে বেশি প্রচারিত প্রথম আলো পত্রিকার বরাতে উদ্বৃত। মাত্র একটি পত্রিকায় যদি নারী নির্যাতনের এই বীভৎসতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাহলে গোটা দেশের অবস্থা কী? প্রকাশিত এ সকল প্রতিবেদন ও গবেষণার ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় বাংলাদেশে নারীরা বিভিন্ন প্রক্রিয়া, পদ্ধতি ও মাধ্যমে নির্যাতিত হয়ে থাকেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রক্রিয়া এখানে বিশ্লেষিত হলো।

১। **প্রহার:** নারীদের শারীরিকভাবে নির্যাতন, প্রহার বা গায়ে হাত তোলা আমাদের দেশের গ্রাম-গঞ্জে, বস্তি ও নিম্নবিত্ত পরিবারে সাধারণত হয়ে থাকে এবং এর প্রধান শিকার হচ্ছেন স্ত্রীরা। আর স্ত্রীদের বেলায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ নির্যাতনের মূল কারণ হলো শশুর বাড়ি বা স্বামীর পক্ষ থেকে যৌতুকের দাবি, বহু বিবাহ, পুত্র সন্তান জন্ম দিতে ব্যর্থতা এবং দারিদ্র্য; যার কোনোটিই সাধারণভাবে স্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। বাংলাদেশে নারীদের উপর সংঘটিত এ ধরনের নির্যাতন সম্পর্কে বলা হয়েছে, "It is one of the under reported type because in this country patriarchal

---

[১] কারিতাস কর্মশালা পত্র, পূর্বোক্ত, পৃ.১২

Dhaka University Institutional Repository

norms about unequal gender relations in the family prevail. A husband's right to absence his wife is recognized by family and society.[1]

২। **হত্যা:** বাংলাদেশে নারীরা যেমন ঘরের বাইরে নিরাপদ নয় তেমনি নিজ ঘরেও তারা পুরোপুরি নিরাপদ এমন বলার উপায় নেই। পারিবারিক কলহ, যৌতুকের দাবি, পুত্র সন্তান প্রসবে ব্যর্থতা, বহুবিবাহ, সম্পত্তি দাবি ইত্যাদিকে উপলক্ষ্য করে নিজ পরিবারে, নিজের ঘরে নারীরা অত্যন্ত আপনজনদের হাতে খুন হয়ে থাকেন। ভাই, ছেলে, বাবা, শশুর, শাশুরি, দেবর, ভাসুর, ননদ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী খুন হন তার স্বামীর হাতে।

৩। **অপহরণ:** ধর্ষণ, জোরপূর্বক বিয়ে, সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে গ্রামে, গঞ্জে ও শহরে ব্যাপকভাবে নারীরা অপহরণের শিকার হন। স্কুলে যাবার পথে বা অন্য কারণে কিশোরীরা এবং কাজে বা বেড়াতে নারীরা বের হয়ে এলে অপহরণকারীরা তাদের অপহরণ করে। কোথাও কোথাও নিজ ঘর থেকেও নারী অপহৃত হয়ে থাকেন। অপহরণের পর অক্ষত অবস্থায় বাংলাদেশে কোনো নারীকে উদ্ধারের ঘটনা একেবারেই বিরল। "Incidence of these (kidnapping and abduction has also been reported to be on the increase. In Bangladesh recently there has been an increase of such incidents for ransom.[2]

৪। **এসিড নিক্ষেপ:** বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে নারীর প্রতি সবচেয়ে ঘৃণ্যতম নৃশংস নির্যাতন হলো এসিড নিক্ষেপ। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হলে, বিয়ে করতে ব্যর্থ হলে, স্বামীকে আরেকটি বিয়ে করতে বাধা দিলে বা ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ করে সম্পদ দখল করায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করলে কিংবা পুরুষের যে কোনো কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ালে নারীকে এসিড মেরে ঝলসে দেয়া হচ্ছে। বিকৃত মনস্ক পুরুষরা নারীদেরকে নিজেদের অস্থাবর সম্পত্তি ছাড়া বেশি কিছু মনে করে না বলে নারীদের স্বাধীন ইচ্ছাকে সহজভাবে মেনে না নিয়ে বরং এটাকে তাদের স্পর্ধা মনে করে এবং এর শাস্তি হিসেবে এসিড নিক্ষেপের কাপুরুষোচিত কাজ করে পুরো মানবজাতিকে কলঙ্কিত করে।

৫। **মানসিক নির্যাতন:** তথাকথিত শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত পরিবারে নারীর প্রতি শারীরিক নির্যাতনের পরিবর্তে ভয়াবহ মানসিক নিপীড়ন চালানো হয়। এতে নারীর বিভিন্ন ধরনের

---

[1] Women for Women, *A Research and Study Group, 1997,* Regional Overview on Violence Against Women: A Working Paper for Expert Group Meeting, Dhaka, p.3

[2] Ibid, p.4

Dhaka University Institutional Repository

সুযোগ-সুবিধা পরিকল্পনামাফিক সংকুচিত করা হয়। তার মন্দ লাগা বিষয় প্রবর্তন করে বা তার প্রিয় লোকদের এবং তার নিজের সত্তাকে বারবার নানাভাবে অপদস্থ করে নারীকে মনোদৈহিক বৈকল্যের দিকে ঠেলে দেয়া হয়। প্রচলিত আইনে এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ না হলেও বা প্রত্যক্ষভাবে একে শাস্তিযোগ্য অপরাধের আওতায় আনা না গেলেও অনেক নারীর আত্মহত্যা, আচরণ বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হওয়ার নেপথ্যে মানসিক নির্যাতনের ভূমিকাই মুখ্য।

৬। **উত্যক্তকরণ:** স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বিশেষ করে স্কুল কলেজের মেয়েরা রাস্তায়, স্কুল-কলেজের গেটের সামনে, পাড়ায় পাড়ায়, গার্মেন্টস শ্রমিকসহ বিভিন্ন নারী শ্রমিকগণ, অফিসগামী মহিলা, যানবাহনযাত্রী নারী, কেনাকাটায়-রাস্তায় হাটাচলায় রত নারী, মেলা বা বিনোদনের অন্যান্য স্পটে আগমণকারী নারী এক ধরনের বিকৃতরুচি সম্পন্ন পুরুষের দ্বারা নানাভাবে উত্যক্ত হয়ে থাকেন। একটি কন্যাশিশু শৈশব থেকেই এই বিরূপ অবস্থার শিকার হয় বলে তার মানসিক বিকাশ নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে বখাটে পুরুষ কর্তৃক নারীর এই উত্যক্তকরণ নির্যাতনে অতিষ্ঠ একাধিক নারী আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন।

৭। **ধর্ষণ:** ধর্ষণ নারীদের প্রতি নির্যাতনের সবচেয়ে আদিমতম এবং সর্বাধিক অমানবিক রূপ। এসিড নিক্ষেপে একজন নারীর যদি চেহারায় বিকৃতি ঘটে তবে ধর্ষণের ফলে তার জীবনের সকল কামনা-বাসনার মৃত্যু ঘটে।[১]

"This most repugnant type of violence is on the increase in all the countries, two new and alarming trends are; gang rape and custodial rape. In Bangladesh for instance, newspapers reported of cases where a gang of four or five youths have broken into a house and after binding the parents by hand and feet have forced them to witness the rape of their daughters.[২]

৮। **গৃহের অভ্যন্তরে নির্যাতন:** পরিবারের নারী বা শিশুনারী পরিবারের সদস্যদের দ্বারা পরিবারে বা ঘরে নির্যাতনের শিকার হলে তা এই পর্যায়ের নির্যাতনের আওতায় পরে। এ ধরনের নির্যাতনের শিকার হয় শহুরে বাড়িতে নবপরিণীতা স্ত্রী, গৃহপরিচারিকা এবং অন্য যে কোনো নারী। ঘরের

---

[১] বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবি সমিতি, নারী নির্যাতন দিবস সংখ্যা ১৯৯৮, পৃ.৫

[২] Women for Women, Ibid, p.4

Dhaka University Institutional Repository

১১। **পতিতাবৃত্তিঃ** বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য, এমন একটি মুসলিম দেশে পতিতাবৃত্তিকে ব্যবসা এবং পতিতাদেরকে 'যৌনকর্মী' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার অসভ্য ধারা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। অথচ পতিতাবৃত্তি একজন নারীর প্রতি পাশবিক নিপীড়ন ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ অর্থের বিনিময়ে একজন নারী প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১০জন খদ্দরের যৌনসঙ্গী হয়ে থাকে যা নারীর জন্য গণধর্ষণের সমান বেদনাদায়ক। এ জাতীয় নারী বিয়ে করা, সন্তান জন্ম দেয়া এবং মানবিক জীবন যাপনের অধিকার থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হন। দুঃখজনক বিষয় হলো, বাংলাদেশে কর্মরত বিভিন্ন মহিলা সংস্থা পতিতাবৃত্তি বন্ধের জন্য কাজ না করে পতিতারা যেন নির্বিঘ্নে পতিতাবৃত্তি করতে পারেন, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা লাভ করতে পারেন সে জন্য আন্দোলন করছেন। অথচ যে বৃত্তিটা নারীর জন্য ভয়ঙ্কর অসভ্য নিপীড়ন হিসেবে গণ্য হতে পারে তা নির্মূলের জন্য তাদের কোনো কর্মসূচী নেই। পতিতাদের সামাজিক পুনর্বাসনের জন্য তাদের কোনো দাবি পর্যন্ত নেই!

১২। **আত্মহত্যাঃ** পারিবারিক কলহ, নির্যাতন, যৌতুকের দাবি আদায়ে ব্যর্থতা, উত্যক্তকরণ, মানসিক যাতনা, প্রেমে ব্যর্থতা ইত্যাদি নানা কারণে বাংলাদেশে নারীরা আত্মহত্যা করে থাকেন। কোনো কিশোরী বা নারী ঘরে বা বাইরে পাশবিক নির্যাতনের শিকার হওয়ার পর বেঁচে থাকলেও সমাজ তাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে না। ধর্ষণকারী পুরুষকে সমাজ কিছু না বললেও নারীকে ক্ষমা করে না। পদে পদে তার জীবন বিষিয়ে তোলে। ফলে সে শারীরিক ধর্ষণের পর প্রতিনিয়ত মানসিক ধর্ষণের শিকার হয় এবং পরিণতিতে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়।

বাংলাদেশে নির্যাতিত নারী অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার নির্যাতনের বিষয় গোপন রাখেন। পারিবারিক শান্তি, সন্তানের ভবিষ্যত, নিজের সম্মান ইত্যাদি নানা কারণে মুখ বুজে ভয়ঙ্কর সব নিপীড়ন মুখ বুজে সহ্য করেন। এদেশে যতো নারী নির্যাতিত হন, তার খুব ছোট অংশই কেবল প্রকাশিত হয়; তাও প্রকাশিত হয় তখন যখন প্রকাশ না করে আর কোনো উপায় থাকে না। দেশে নারীরা এসব নির্যাতনের শিকার হয়ে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে বসবাস করছে, যা একটি দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এই প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের এই দেশে ইসলামী আইন ও বিধান কার্যকর করে বর্তমান সমাজ কাঠামো অক্ষুন্ন রেখে কীভাবে নারীকে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করা যায়, কীভাবে বন্ধ করা যায় ভয়ঙ্কর নিপীড়ন – এ পর্যায়ে সে কর্মকৌশল অনুসন্ধান করা হবে। এ জন্য প্রথমে জানা প্রয়োজন ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে কী মানসিকতা পোষণ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়: নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ইসলামী বিধান এবং এগুলোর প্রচার ও প্রসারে মসজিদের ভূমিকা

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ইসলামী বিধান

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন একজন নারী ও একজন পুরুষের সমন্বয়ে। মানব ভূমিষ্ঠের ক্ষেত্রে একজন পুরুষ এবং একজন নারীর ভূমিকা প্রায় সমান। এক্ষেত্রে নারীর আবদান বরং বেশীই বলা যায়।[১] মা গর্ভান্তরে লুকিয়ে রাখে তার অনাগত সন্তানটি দশ মাসের অধিক সময় পর্যন্ত। এক সময় জীবনের শংকা নিয়ে ভূমিষ্ঠ করেন একটি নবজাতক শিশু। এখানেই সমাপ্তি নয় প্রায় আড়াই বছর পর্যন্ত অবলানারী তার শিশু সন্তানটিকে স্বযত্নে দায়িত্বের সাথে দুধপান করিয়ে থাকেন। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে,

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"আমি মানুষকে তার মা বাবার সাথে সদয় আচরণের আদেশ দিয়েছি। তার মা তাকে অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করেছে, তাকে প্রসব করে কষ্টের সাথে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার দুধপান ছাড়াতে সময় লেগেছে ত্রিশ মাস। ক্রমে সে যখন বিকশিত হয় এমনকি তার বয়স হয় চল্লিশ তখন সে বলে: হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে ক্ষমতা দিন, যেন আমি আপনার নিআমাতের শোকর করতে পারি, যে নিআমাত আপনি আমাকে ও আমার মা বাবাকে দান করেছেন। আপনি আমাকে ক্ষমতা দিন, যেন আমি এমন ভাল কাজ করতে পারি যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন, আমার বংশধরদেরকেও সৎকর্মশীল করুন। নিশ্চয় আমি আপনার নিকট তওবা করলাম এবং নিশ্চিতভাবেই আমি আপনার নিকট আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।"[২]

---

[১] অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শামসুল হুদা, *নারীর অধিকার ও মর্যাদা*, ঢাকা ১৯৯৫, পৃ.২১

[২] সূরা আহকাফ, আয়াত-১৫

Dhaka University Institutional Repository

সন্তান ভূমিষ্ঠ ছাড়াও নারীরা সমাজের বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজে অবদান রাখছে। সাংসারিক জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকসহ সর্বাঙ্গনে নারীদের ভূমিকা অসামান্য। দেশ ও দেশের স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রেও নারীদেরও অবদান উল্লেখ করার মত। যে জাতিকে এক সময় সমাজের বোঝা হিসেবে মনে করা হত তারাই আজ পৃথিবীর যাবতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখছে। পুরুষের পাশাপাশি একজন নারী সমানভাবে কার্যদক্ষতা দেখিয়ে তারা তাদের আসনকে সমুন্নত করেছে।[১]

কিন্তু বর্তমান এ সভ্য সমাজেও কতিপয় মানবরূপী প্রাণী হায়েনার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ঐ সুন্দর অবলা নারীদের উপর বিভিন্নভাবে চড়াও হচ্ছে। যে মায়ের জাতি প্রতিনিয়ত তাদের কর্মকাণ্ড দ্বারা এ পৃথিবীটাকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিচ্ছে, যাদের পদচারণা না হলে সামাজিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যেত সেই জাতিকে লাঞ্ছিত করে উন্নয়নের ধারাকে ব্যাহত করা হচ্ছে। পরিবারে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, কর্মস্থলে নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। নারীর প্রতি পুরুষের যে দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা আবশ্যিক করে দিয়েছেন, তা আজ বিস্মৃত। প্রাচীন মূর্খ যুগের ন্যায় নারীর সম্মানকে ভূলুণ্ঠিত করা হচ্ছে। বিশ্ব যখন নারীর সম অংশগ্রহণে চরম উন্নয়নের দ্বার প্রান্তে উপনীত ঠিক তখন নারী নির্যাতন এ উন্নয়নের ধারাকে বাধাগ্রস্ত করবে বৈ কিছু নয়।[২] তাই বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে জাতীয় উন্নয়নধারাকে অক্ষুণ্ন রাখতে নারী নির্যাতন রোধসহ নারীর পূর্ণ সম্ভ্রম নিশ্চিত করা সময়ের অত্যাবশ্যকীয় দাবী।

উল্লেখ্য যে, যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্ম ও গোষ্ঠির লোকেরা নারীর উপর অমানবিক আচরণ করেছে। হিন্দু ধর্মে নারীকে লক্ষীনি, পদ্মীনি, রাক্ষসী, অপয়া বিভিন্ন নামে সীমাহীন হেয় করেছে এবং সতীদাহ প্রথা চালু করে নারী জাতির চিরস্বাধীনতা হরণ করেছে। ইহুদী ও খ্রিস্টবাদে নারীর কোনো অধিকারই ছিলো না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইংরেজ নারীরা ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দের আগে, জার্মান নারীরা ১৯০০

---

[১] অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ যাইনুল আবেদীন, *নারী নির্যাতন রোধে ইমামগণের ভূমিকা*, বাংলাদেশ মসজিদ মিশন, ঢাকা নভেম্বর ২০০৬, পৃ.১১

[২] অধ্যাপক মাজহারুল ইসলাম, *পর্দা প্রগতির সোপান*, শেরপুর ১৯৯৩, পৃ.২৭

Dhaka University Institutional Repository

খ্রিস্টাব্দের আগে, সুইস নারীরা ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের আগে এবং অষ্ট্রেলীয় নারীরা ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের আগ পর্যন্ত কোনো প্রকার সম্পদের অধিকারী হতে পারতো না।[১]

যখন কোনো মানব সমাজে নারীদের কোনো কিছুর অধিকার ছিলো না তখন আল্লাহ তাআলা সেই ভ্রান্তির অপনোদন করে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিলেন-

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের।"[২]

ইসলাম পূর্ব যুগে নারীর ওপর যে অত্যাচার-অবিচার চলত তার প্রতিবাদ করে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

মুমিনগণ! নারীদেরকে জোর করে উত্তরাধিকারী বানানো তোমাদের জন্য হালাল নয়। তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করার জন্য তাদেরকে আটক করে রেখ না, যদি না তারা স্পষ্টভাবে ব্যভিচার করে। তাদের সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করবে। তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের জন্য যার মধ্যে অনেক কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকেই অপছন্দ করলে![৩]

কোনো জাতিই নারীর কোনো কিছুর ওপর নিজস্ব অধিকার থাককে স্বীকার করত না। ইসলাম এসে নারী জাতির অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে স্বীকার করেছে। যেমন, আল্লাহ তাআলার বাণী-

وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

[১] আব্দুল কারিম বিআজার সিরাজী, *নারী নির্যাতন যুগে যুগে* ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা ডিসেম্বর-১৯৯২ পৃ.৫

[২] সূরা বাকারা, আয়াত-২২৮

[৩] সূরা নিসা, আয়াত-১৯

Dhaka University Institutional Repository

যা দিয়ে আল্লাহ তোমাদের একজনের উপর অন্যজনকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তোমরা তার লোভ কর না। পুরুষ যা উপার্জন করে তা তার প্রাপ্য আর নারী যা উপার্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ। আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ কামনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয় সম্পর্কে মহাজ্ঞানী।[১]

জাহেলী যুগে মানুষ সম্পদশালিণী নারীদের বিয়ে করত তাদের সম্পদের লোভে। ঐ নারীদের স্বামী মারা গেলে তখনকার লোকেরা ঐ ব্যক্তির মাল-সম্পদের ন্যায় তাদের বিধাব স্ত্রীকেও জবরদস্তি নিজেদের ওয়ারিশ বলে গণ্য করত।[২] তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়েও করে বসত, কিন্তু আল্লাহ তাআলা নির্দেশ জারি করলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

মুমিনগণ! নারীদেরকে জোর করে উত্তরাধিকারী বানানো তোমাদের জন্য হালাল নয়। তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করার জন্য তাদেরকে আটক করে রেখ না, যদি না তারা স্পষ্টভাবে ব্যভিচার করে। তাদের সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করবে। তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের জন্য যার মধ্যে অনেক কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকেই অপছন্দ করলে![৩]

নারীদেরকে যখন তদের পাওনা মোহরানা থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে বন্দী করে রাখা হত, তখন আল্লাহ তাআলা ঘোষনা কররেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

মুমিনগণ! নারীদেরকে জোর করে উত্তরাধিকারী বানানো তোমাদের জন্য হালাল নয়। তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করার জন্য তাদেরকে আটক করে রেখ না, যদি না

---

[১] সূরা নিসা, আয়াত-৩২

[২] অধ্যাপক নাজির আহমেদ ও ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস*, ঢাকা ১৯৮৯ পৃ.৩৭

[৩] সূরা নিসা, আয়াত-১৯

Dhaka University Institutional Repository

তারা স্পষ্টভাবে ব্যভিচার করে। তাদের সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করবে। তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের জন্য যার মধ্যে অনেক কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকেই অপছন্দ করলে![১]

জাহিলী যুগের মানুষ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে মনে করত নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে শুধুমাত্র পুরুষের সেবা করার উদ্দেশ্যে।[২] কিন্তু আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করলেন,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

"তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ"।[৩]

পুরুষরা আর একটি বিয়ে করার দূরভিসন্ধি নিয়ে নিজের স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচার বা এ ধরনের কোনো অভিযোগ খাড়া করতে, যাতে সেই স্ত্রী স্বেচ্ছায় নিজস্ব সম্পদ ও প্রাপ্য ত্যাগ করেই চলে যায়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করলেন,

وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

তোমরা যদি এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির করে থাক ও আগের স্ত্রীকে অঢেল অর্থও দিয়ে থাক, তাও আগের স্ত্রীর নিকট থেকে কোন কিছুই গ্রহণ কর না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে প্রকাশ্য পাপের মাধ্যমে তা গ্রহণ করবে?[৪]

পিতামাতার সম্পত্তিতেও ইসলাম নারীর অধিকার লিপিবদ্ধ করেছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

মাতাপিতা ও আত্মীয়–স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদে পুরুষের অংশ আছে; মাতাপিতা ও আত্মীয়–স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদে নারীরও অংশ আছে; কম হোক বা বেশি, নির্ধারিত অংশ।[১]

---

[১] সূরা নিসা, আয়াত-১৯

[২] আবদুল খালেক, *নারী*, ঢাকা ১৯৯৫, পৃ.৮

[৩] সূরা বাকারা ঃ আয়াত-১৮৭

[৪] সূরা নিসা ঃ আয়াত-২০

Dhaka University Institutional Repository

নবী (সা.) বিদায় হজ্জে বলেছেন, "সাবধান! তোমাদের নারীদের ওপর তোমাদের অধিকার রয়েছে এবং তোমাদের ওপরও তাদের অধিকার রয়েছে।[২]

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে যুগে যুগে সকল ধর্মের মানুষরা নারীদের উপর অমানবিক নির্যাতন চালিয়েছে। কেবল মাত্র ইসলামই নারীকে মাতা, ভগ্নি, স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করেছে এবং নারী জাতির মর্যাদা সংরক্ষণ করেছে। নারীর এ নিশ্চিত অধিকার আদায়ের জন্য এবং সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মসজিদের ইমামগণই সঠিক দায়িত্ব পালন করতে পারেন।[৩]

বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ইসলামী বিধানের ভূমিকা

রাসূলুল্লাহ (সা) এর আবির্ভাব প্রাক্কালীন সময়ে আরবে নারী নির্যাতন চরম আকার ধারন করেছিলো। নারীর জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের কোনো নিরাপত্তা ছিলো না। প্রকাশ্য আসরে ব্যভিচারিতার নির্লজ্জ প্রদর্শনে নারীকে বাধ্য করা হয়েছিলো। খুন, রাহাজানী, ধর্ষণ, অপহরণ, ব্যভিচারিতার মিথ্যা অভিযোগ, নিরাপত্তাহীনতা প্রভৃতি নারী জীবনের প্রতিশব্দ হয়ে উঠেছিলো। নারীদের চলাফেরা, খোলামেলা পোশাক আর উত্তেজক আবেদনময়ী শারীরিক কসরত পুরুষকে একাজে আরো বেশি উদ্বুদ্ধ করছিলো।[৪] ইসলাম নারীকে এমন নির্যাতিত জীবনের পরিবর্তে সম্মানের জীবন দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। নারী নির্যাতনের সকল পথ ও পদ্ধতি নিষিদ্ধ করে নারীর মর্যাদাপূর্ণ ও শান্তিময় জীবনযাত্রা নিশ্চিত করেছে।[৫]

পরিবারে ও সমাজে নারী বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হয়। কন্যা হয়ে জন্মানোর অপরাধে তাকে মা-বাবা ও অন্যান্যদের বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হতে হয়। ছেলে সন্তানের চেয়ে সকল ক্ষেত্রে সে কম সুবিধা ও অধিকার পায়। বিবাহের ক্ষেত্রেও তার কোনো মতামত নেয়া হয় না। বিয়ের পর স্বামী ও তার আত্মীয়দের যৌতুক দাবি এবং সে কারণে নির্যাতন কিংবা এমনিতেই মৌখিক শারীরিক ও

---

[১] সূরা নিসা ঃ আয়াত-৭

[২] ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, পৃ.২৫৪

[৩] অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ যাইনুল আবেদীন, *ইমামদের দায়িত্ব ও কর্তব্য*, ঢাকা ২০০১, পৃ.১৭

[৪] অধ্যাপক মাজহারুল ইসলাম, *পর্দা প্রগতির সোপান*, শেরপুর ১৯৯৩, পৃ.২৮

[৫] অধ্যাপক নাজির আহমেদ ও ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, পূর্বোক্ত, পৃ.২৬৭

Dhaka University Institutional Repository

মানসিক লাঞ্ছনা নারীকে দুঃসহ জীবনে ঠেলে দেয়। আর্থিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা, মানুষ হিসেবে সমান অধিকার ও মর্যাদা না দেয়া, নারীরা পাপের কারণ বলে অবহেলা ও উপেক্ষা করা, ব্যভিচারে বাধ্য করা, ধর্ষণ, হত্যা, অকারণে তালাক দেয়া, মিথ্যা অপবাদ দেয়া, অসমশ্রমে বাধ্য করা, ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করা ধর্ম ও শিক্ষা চর্চা থেকে দূরে রাখা, নাচ, গান, বিজ্ঞাপন, নাটক এবং চলচ্চিত্রে নারীদেহকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার, বিবাহপূর্ব প্রেম এবং শিক্ষা চাকুরি ও জীবনে অবাধ নারী সম্ভোগের ব্যবস্থা রাখা প্রভৃতি পদ্ধতিতে নারী নির্যাতনের শিকার হয়।[১] ইসলামের বিধান অনুসারে নির্যাতনের এ সকল ক্ষেত্র থেকে নারীকে কীভাবে রক্ষা করা যায় কুর'আন-হাদীসে তার বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে। যেমন,

১। **দৃষ্টি শক্তি নিয়ন্ত্রণঃ** কোনো নারীর প্রতি কোনো পুরুষ ইচ্ছা করে তাকিয়ে থাকতে পারবে না। বরং দৃষ্টি সংযত করাবে। নারীও কোনো পুরুষের দিকে তাকিয়ে থাকবে না। অনিচ্ছায় হঠাৎ করে চোখ পড়ে গেলও সাথে সাথে ফিরিয়ে নেবে। কেননা কামনা সৃষ্টি হওয়া বা লোভ জন্ম নেয়ার শুরু চোখের দেখা থেকেই হয়। আল্লাহ বলেন, 'মুমিন পুরুষদের বলো, তারা যেনো তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে। মুমিন নারীদের বলো তারা যেনো তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে।'[২]

২। **সৌন্দর্য প্রকাশ না করাঃ** সৃষ্টিগতভাবেই নারীদেহের প্রতি পুরুষের এবং পুরুষের প্রতি নারীর জৈবিক আগ্রহ থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় একে নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও পুরুষ বা নারীদেহের উত্তেজক প্রদর্শনী এমনকি সাধারণ প্রকাশও বিপরীত লিঙ্গকে উত্তেজিত করে তুলতে পারে। ফলে নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। এক্ষেত্রে নারী নির্যাতনের শিকার হয় বেশি। সে কারণে সে অপর পুরুষকে নিজের রূপ সৌন্দর্য দেখা যাবে না। অপর পুরুষের মন বা দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এমন পোশাক পরবে না। অলংকার ব প্রসাধনে নিজেকে আকর্ষণীয় করে পরের সামনে উপস্থাপন করবে না। আল্লাহ বলেন, 'মুমিন নারীরা সাধারণভাবে যা প্রকাশ পায় তাছাড়া যেনো তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে। তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেনো তারা মাথায় কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখে। গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে তারা যেনো সজোরে পদক্ষেপ না করে।'[৩]

---

[১] আল্লামা আবদুস সামাদ রাহমানী, *নারী মুক্তি কোন পথে?* ভাষান্তরঃ মুফতী মুঈনদ্দীন তৈয়বপুরী, ঢাকা ২০০০, পৃ.৭৭

[২] আল-কুরআন, সূরা নূর, আয়াতঃ ৩০-৩১

[৩] আল-কুরআন, সূরা নূর, আয়াতঃ ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

৩। **লজ্জাস্থান হিফাযত করা:** মুমিন পুরুষ এবং নারী তাদের লজ্জাস্থান হিফাজত করবে। একজন অপরজনকে তার লজ্জাস্থান দেখাবে না এবং যে কোনো হারাম কাজে লজ্জাস্থান ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে। উল্লেখ্য সাধারণভাবে পুরুষের লজ্জাস্থান হলো নাভীমূল থেকে হাটু পর্যন্ত এবং নারীর লজ্জাস্থান হলো তার হাত, পা ও মুখমণ্ডল ছাড়া পুরো শরীর।[১]

৪। **অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে প্রবেশ না করা:** মুমিন নর-নারী কেউ কারো ঘরে অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ করবে না। কেননা এতে লজ্জাস্থানের হিফাযত অসম্ভব হয়ে পড়বে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নিজেদের ঘর ব্যতীত অপর কারো ঘরে প্রবেশ করো না যতোক্ষণ না ঘরের লোকদের অনুমতি নাও ও তাদের সালাম জানাও। যদি তোমরা ঘরে কাউকে না পাও তাহলেও প্রবেশ করবে না। যদি তোমাদেরকে বলা হয় "ফিরে যাও" তাহলে ফিরে যাবে।'[২]

৫। **ভালো ধারণা রাখা:** মুমিন নরনারী পরস্পরের পবিত্রতার ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করবে। কেউ কারো ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করে তাকে মানসিক নির্যাতনের শিকার বানাবে না। আল্লাহ বলেন, 'যখন তারা অপবাদ সম্পর্কে শুনলো তখন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা আপন লোকদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করলো না কেনো?"[৩]

৬। **অশ্লীলতা প্রসারের সকল পথ বন্ধ রাখা:** মুসলিম সমাজে অশ্লীল অশোভন কোনো বিষয়ের স্থান নেই। সমাজে অশ্লীলতা প্রসার পেলে নারীর মর্যাদা নষ্ট হয়। তার সম্মান বিনষ্টের সমূহ সম্ভাবনা গড়ে ওঠে। আল্লাহ তাই শুধু অশ্লীল আচরণ নয় বরং অশ্লীল বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলা ও হারাম করেছেন। বলেছেন – 'নিশ্চয় যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্যে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।'[৪]

৭। **মিথ্যা অপবাদ দান শাস্তিযোগ্য অপরাধ:** সৎ চরিত্রবান পবিত্র নারীর প্রতি ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ উত্থাপন করলে নারী নিদারুণ মানসিক নির্যাতনের শিকার হন। নারীকে নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা একে কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। বলেছেন,

[১] আবদুল হামিদ আহমদ আবু সুলাইমান, *বৈবাহিক সমস্যা ও কুরআন মজীদের সমাধান*, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ঢাকা ২০১০, পৃ.৭৭

[২] আল–কুরআন, সূরা নূর, আয়াত: ২৭ - ২৮

[৩] আল–কুরআন, সূরা নূর, আয়াত: ১২

[৪] আল–কুরআন, সূরা নূর, আয়াত: ১৯

Dhaka University Institutional Repository

'যারা সতি ও পবিত্র চরিত্রবতী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে কিন্তু চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না তাদেরকে আশিটি কষাঘাত করবে এবং তাদের সাক্ষ্য কখনোই কবুল করবে না।'[১]

৮। **ধর্ষণ অপরাধের শাস্তিঃ** নারী পুরুষ উভয়ে পারস্পরিক সম্মতিতে অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তুললে এবং তা চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রমাণ হলে তাদেরকে একশত কষাঘাত করা হবে।[২] এ শাস্তি অবিবাবিহত পুরুষের জন্য। যদি তারা বিবাহিত হয় তাহলে তাদেরকে পাথর দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা হবে।[৩] কিন্তু অপরাধটি যদি নারীর অমতে হয়, তাকে যদি এ কাজে বাধ্য করা হয় এবং সাক্ষী প্রমাণের ভিত্তিতে নারীর অসহায়ত্ব ও অমত সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে তাহলে এ জন্যে নারী কোনো শাস্তি পাবেন না। বরং এজন্যে ধর্ষক পুরুষই শাস্তি পাবে। সে অবিবাহিত হলে তাকে একশত কষাঘাত করা হবে। সে বিবাহিত হলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে। এক্ষেত্রে নারীর অব্যাহতি প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'আর যে তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করে তাহলে তাদের জবরদস্তির পর আল্লাহতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৪]

৯। **লিআনের বিধানঃ** স্বামী যেনো ব্যভিচারিতার মিথ্যা অভিযোগ তুলে স্ত্রীকে মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করতে না পারে সে জন্যে আল্লাহ তা'আলা লিআনের বিধান দিয়েছেন। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাভিচারের অভিযোগ তুলতে স্বামীকে চারবার আল্লাহর নামের কসম করে বলতে হয় – তার স্ত্রীর ব্যাপারে ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপনের ব্যাপারে সে সত্যবাদী। পঞ্চমবারে শপথ করে বলতে হয় – 'যদি সে এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার উপর আল্লাহর লানত।'[৫] অভিযোগ উত্থাপনের পর স্বামী যদি কসম করতে অস্বীকার করে তাহলে তাকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে।[৬]

১০। **ব্যভিচার প্রতিরোধে ইসলামের বিধান ও ভূমিকাঃ** ব্যভিচারের শাস্তির বিধান বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন – "তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের

---

[১] আল-কুরআন, সূরা নূর, আয়াতঃ ৪

[২] আল-কুরআন, সূরা নূর, আয়াতঃ ২ (اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة)

[৩] ইমাম বুখারী, সহীহ, পূর্বোক্ত, পৃ.৬৫

[৪] আল-কুরআন, সূরা নূর, আয়াতঃ ৩৩

[৫] আল-কুরআন, সূরা নূর, আয়াতঃ ৬-৯

[৬] আবু বকর আল-রাযী, *যাদুল মাআদ*, দিল্লী ১৪০৬, পৃ.৭৫

Dhaka University Institutional Repository

চারজন পুরষকে সাক্ষী আনো। যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে নারীদের ঘরে আবদ্ধ করে রাখো, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য অন্য কোনো পথ করে দেন। তোমাদের যে পুরুষ এই অপকর্ম করে তাকে শাস্তি দাও। এরপর সে যদি তওবা করে সংশোধিত হয়ে যায়, তাহলে তাদের চিন্তা পরিত্যাগ করো। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তওবা কবুলকারী, দয়ালু।[১]

এ আয়াতদ্বয়ে প্রথমত ব্যভিচার প্রমাণের বিশেষ পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে যে, চারজন পুরুষের সাক্ষ্য দরকার হবে। দ্বিতীয়ত ব্যভিচারের শাস্তি নারীর জন্যে ঘরে আবদ্ধ রাখা এবং উভয়কে কষ্ট প্রদান করার কথা উল্লেখিত হয়েছে, এ প্রসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, ব্যভিচারের শাস্তি সংক্রান্ত এই বিধানই সর্বশেষ নয়, বরং ভবিষ্যতে অন্য বিধান আসবে। সূরা নূরে আল্লাহ তা'আলা সেই অন্য বিধান বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন – "ব্যভিচারী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ তাদের প্রত্যেককে একশত করে কষাঘাত করো। আল্লাহর বিধান কার্যকর করায় তাদের প্রতি দয়া যেনো তোমাদের প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও। মুমিনদের একটি দল যেনো তাদের শাস্তি প্রত্যেক্ষ করে।[২] অর্থাৎ শাস্তিটি গোপনে দেয়া যাবে না। দিতে হবে প্রকাশ্যে। বলা বাহুল্য সূরা নূরের আলোচ্য আয়াতে কোনো রূপ বিবরণ ও বিশেষায়ণ ছাড়াই ব্যভিচারের শাস্তি একশত কষাঘাত বর্ণিত হয়েছে। এ শাস্তি কোনো ধরনের পুরুষ ও নারীর জন্যে আল্লাহ তা'আলা তার সুনির্ধারিত ব্যাখ্যা দেন নি। কিন্তু তাঁর পরোক্ষ নির্দেশ ও নির্দেশনায় রাসূলুল্লাহ (সা) এ শাস্তির প্রয়োগগত দিক বিশ্লেষণ করে বলেছেন, "আমার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করো। আল্লাহ ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীর জন্যে সূরা নিসার প্রতিশ্রুত পথ সূরা নূরে বিবৃত করেছেন। তা হচ্ছে অবিবাহিত নারী ও পুরুষের জন্যে একশত কষাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসন আর বিবাহিত নারী ও পুরুষের জন্যে একশত কষাঘাত ও পাথরের আঘাতে হত্যা।[৩]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আবু হুরায়রা ও যায়দ বিন খালিদ যুহানী (রা) এর বর্ণনা থেকে বিষয়টি জোড়ালোভাবে প্রমাণ হয়। তাঁরা বর্ণনা করেন, জনৈক বিবাহিতা মহিলা তার অবিবাহিত চাকরের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। ব্যভিচারীর পিতা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট উপস্থিত হন। স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ঘটনা প্রমাণিত হয়ে গেলে রাসুলুল্লাহ (সা) বলেন, "আমি তোমাদের

[১] আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াতঃ ১৫-১৬

[২] আল-কুরআন, সূরা নূর, আয়াতঃ ২

[৩] আবূল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি, *সহীহ মুসলিম*, পূর্বোক্ত, পৃ.৭৫৪

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করবো"। তারপর তিনি আদেশ দিলেন ব্যভিচারী অবিবাহিত ছেলেকে একশত কষাঘাত করো"। তিনি বিবাহিত মাহিলাকে পাথরের আঘাতে হত্যা করার জন্য উনায়স (রা) কে আদেশ দিলেন। উনায়স (রা) নিজে মহিলার স্বীকারোক্তি নিলেন। তারপর তার উপর প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান প্রয়োগ করলেন"।[১]

এ হাদীসে রাসুলুল্লাহ (সা) বিবাহিত ও অবিবাহিতকে ভিন্ন ধরনের শাস্তি দিয়েছেন এবং দুটো শাস্তিকেই আল্লাহ তা'আলার ফায়সালা বলে উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ হলো যদিও কুর'আনে প্রস্তারাঘাতে হত্যার বিধান দেয়া হয়নি কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) এ ফায়সালা ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকেই পেয়েছেন।[২]

ব্যভিচার যেমন জঘন্যতম অপরাধ তেমনি এর শাস্তিও কঠিন। কিন্তু এ শাস্তি সহজেই প্রয়োগ করা যাবে না। এজন্যে চারজন প্রত্যক্ষদর্শী পুরুষের সাক্ষী প্রয়োজন। সাক্ষী প্রমাণে ব্যভিচার প্রমাণিত হলে শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রে কোনো দয়া প্রদর্শন করা যাবে না। আবার কষাঘাতের শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এতোটা কাঠিন্যও অবলম্বন করা যাবে না যাতে ব্যক্তি মারাত্মকভাবে আহত হয় বা তার জীবন সংশয় ঘটে।[৩]

১১। শারীরিক নির্যাতন প্রতিরোধে ব্যবস্থাঃ নারীদেরকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হলে বা নির্যাতন করা হলে তার প্রতিবিধানে ইসলাম কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। নারীর শ্লীলতাহানির জন্য নির্যাতন হলে সংশ্লিষ্ট পুরুষ ব্যভিচারের শাস্তিতে দণ্ডিত হবে। কারণ তার লক্ষ্য ছিলো ব্যভিচার। যে কোনো কারণেই হোক সে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে ব্যর্থ হয়েছে। আর্থিক বা অন্য কোনো বৈষয়িক কারণে নারীকে শারীরিকভাবে আঘাত করে নির্যাতন করা হলে ইসলামী আদালত কিসাসের বিধান অনুসারে অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করবে। যতোটুকু নির্যাতন নারীকে করা হয়েছে বা যেভাবে তাকে আহত করা হয়েছে কিংবা আঘাত করা হয়েছে, নির্যাতনকারীকেও ঠিক ততোটুকু পরিমাণ আঘাত করতে হবে।[৪] কুর'আন মজীদে এ জাতীয় শাস্তির উল্লেখ করে বলা হয়েছে,

---

[১] ইমাম বুখারী, সহীহ, পূর্বোক্ত, পৃ.৬৭৩

[২] আবদুল হালীম আবু শুককাহ, *রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা ১ম খণ্ড*, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ঢাকা ২০১১, পৃ.৪৩

[৩] আহমদ রফিক, *ইসলামী পরিবার : প্রকৃতি ও বিধান*, চট্টগ্রাম ২০০৭, পৃ.৫৬

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ.৭৭

Dhaka University Institutional Repository

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"আমি তাদের জন্য তাওরাতে বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের পরিবর্তে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে সমান যখম। এরপর কেউ যদি তা ক্ষমা করে তাহলে ক্ষমাকারীর পাপ মোচন হবে। আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুসারে যারা বিচার ফায়সালা করে না তারাই যালিম।[১]

তাই শারীরিকভাবে নারী যতোটুকু নির্যাতিত হবে, ইসলামী আইনের আলোকে ততোটুকু নির্যাতন নির্যাতনকারীর উপর চালানো যাবে। অবশ্য নারী নিজে এই কাজ করবেন না। ইসলামী আদালত নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় শাস্তি দানের ব্যবস্থা করবে। নারীকে শারীরিকভাবে নির্যাতনের সাথে সাথে যদি তাকে অসম্মান করার জন্য অশালীন কোনো কাজ করা হয় বা কোনো কথা বলা হয়, অপরাধের ক্ষতিকর প্রভাব বিবেচনা করে বিচারক সে জন্যও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।[২]

১২। **এসিড নিক্ষেপ প্রতিরোধে ব্যবস্থা:** এসিড নিক্ষেপ ভয়ানক কাপুরুষতা এবং অমানবিক বর্বরতা। বাংলাদেশে এটি কী ভীতিকর অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে তা ইতোপূর্বে বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হয়েছে। এসিড নিক্ষেপের ব্যাপারে কিসাসের শাস্তিইই কার্যকর করা হবে।[৩] অর্থাৎ যে এসিড নিক্ষেপ করবে, তাকেও এসিড দিয়ে ঝলসে দেয়া হবে, ততোটুকু, যতোটুক সে করেছে। এর পাশাপাশি এসিড নিক্ষেপের সাথে সাথে সন্ত্রাস সৃষ্টির একটি সম্পর্ক রয়েছে বলে সন্ত্রাসীর জন্য ইসলাম যে শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছে এসিড নিক্ষেপকারীর উপর সে শাস্তিও কার্যকর করা যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

---

[১] আল-কুরআন, সূরা মায়িদা, আয়াত: ৪৫

[২] আহমদ রফিক, *ইসলামী পরিবার : প্রকৃতি ও বিধান, চট্টগ্রাম ২০০৭*, পৃ.২৯

[৩] গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামে নারী ও শিশু প্রসঙ্গে, ঢাকা ১৯৮১*, পৃ.৬০

Dhaka University Institutional Repository

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের শাস্তি হলো – তাদেরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ার জীবনে এটাই তাদের লাঞ্ছনা আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।[১] ইসলামের শাস্তিবিধান অনুসারে এসকল শাস্তি প্রকাশ্যে জনসমাবেশে কার্যকর করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো মমতা বা দয়া দেখানো যাবে না। তাহলে মূলত অপরাধী আরো অপরাধ করার উৎসাহ পাবে। শাস্তি যদি জনসমাবেশে প্রকাশ্যে কার্যকর করা হয় তাহলে নতুন করে কেউ আর একই অপরাধ করতে সাহসী হবে না।[২] শাস্তি কার্যকর করার ক্ষেত্রে এই নীতি ও পদ্ধতি উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন,

وَلَاتَأْخُذْ كُمْ بِهِمَا رَافَةٌ فِى دِيْنِ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤ مِنِيْنَ-

"আল্লাহর বিধান কার্যকর করায় তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখিরাতে বিশ্বাসী হয়ে থাকো। মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।"[৩]

এমন কঠোর পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হলে এসিড নিক্ষেপ থেকে নারীকে সহজেই রক্ষা করা যাবে।

১৩। **উত্যক্তকরণ প্রতিরোধে ব্যবস্থাঃ** পথে–প্রান্তরে নারী নানা অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির শিকার হন। বখাটে এবং ভদ্রবেশী বিভিন্ন বয়সের পুরুষরা তাদেরকে নানাভাবে উত্যক্ত করে। অশ্লীল কথা বলে, অঙ্গভঙ্গি করে, শীষ বাজিয়ে, স্বাভাবিক পথচলা ব্যাহত করে, নানা কুপ্রস্তাব দিয়ে প্রভৃতি রকমারি পদ্ধতিতে নারীকে উত্যক্ত করা হয়। বলা বা লেখায় নারীর প্রতি উত্যক্তকরণের ক্ষতিকর প্রভাব বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। বরং সংশ্লিষ্ট নারীই এই বিড়ম্বনার অন্তহীন কষ্টের কথা বলতে পারেন। যে কারণে আমরা বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে উত্যক্তকরণের শিকার নারীকে আত্মহননের পথ বেছে নিতে দেখি।[৪] এসব ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান হলো, উত্যক্তকরণের কারণে নারী যদি আত্মহননের পথ বেছে নেয় তাহলে সংশ্লিষ্ট উত্যক্তকারী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে। কারণ প্রত্যক্ষভাবে হত্যায় অংশ না নিলেও

---

[১] আল–কুরআন, সূরা মায়িদা, আয়াতঃ ৩৩

[২] এ জেড এম শামসুল আলম, *ইসলামী প্রবন্ধমালা*, ইফাবা, ঢাকা ২০০৪, পৃ.২৮৭

[৩] আল–কুরআন, সূরা নূর, আয়াতঃ ২

[৪] ইসহাক ওবায়দী, *যুগে যুগে নারী*, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ.৫৪

Dhaka University Institutional Repository

সেই মূলত হত্যাকারী। তাকে ইসলাম নির্ধারিত হত্যার শাস্তিই দেয়া হবে। আর যদি উত্যক্তকৃত নারী আত্মহননের পথ বেছে না নেয় তাহলে সমাজে বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় এবং অশালীন কার্যকলাপ সৃষ্টির দায়ে উত্যক্তকারীদের বিরুদ্ধে বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির দণ্ডবিধান কার্যকর করা হবে।[১] আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

انَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের শাস্তি হলো – তাদেরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ার জীবনে এটাই তাদের লাঞ্ছনা আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।[২]

১৪। **যৌতুক প্রতিরোধে ব্যবস্থাঃ** বাংলাদেশে যৌতুক এক ভয়ঙ্কর বিভীষিকা।[৩] হিন্দুধর্মাবলম্বীদের বিবাহরীতিতে আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে যে পণপ্রথার ব্যবস্থা রয়েছে তাই যৌতুক হিসেবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। হিন্দু ধর্মমতে পিতা-মাতার সম্পদে নারীর কোনো অংশ নেই বলে বিবাহের সময় স্বামী পক্ষ যথাসম্ভব বেশি বেশি অর্থ ও উপহার পণ হিসেবে গ্রহণ করেন। বিবাহের আগে দর কষাকষির মাধ্যমে এটা নির্ধারিত হয়ে থাকে। ইসলামে এমন বিধান নেই। ইসলামে বরং বিবাহের জন্য স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে মোহরনা আদায় করতে হয়। যৌতুক তাই সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং ইসলাম বিরুদ্ধ প্রথা। মুসলিমদের এ প্রথায় অভ্যস্থ হওয়ার অর্থ হলো ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাওয়া। ইসলামী আদালত ইসলামী বিধানের বিরুদ্ধাচারণের জন্য যারা যৌতুক দাবি করবে তাদের বিরুদ্ধে অবস্থা অনুসারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।[৪]

---

[১] ড. জামাল আল বাদাবী, ইসলামী শিক্ষা সিরিজ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ঢাকা ২০০৮, পৃ.৮৭

[২] আল-কুরআন, সূরা মায়িদা, আয়াতঃ ৩৩

[৩] বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি, নারী নির্যাতন দিবস সংখ্যা ১৯৯৮, পৃ.৮৭

[৪] বি আইশা লেমু ও ফাতেমা হীরেন, *ইসলামের দৃষ্টিতে নারী*, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ঢাকা ২০১০, পৃ.২১

Dhaka University Institutional Repository

১৫। নারীর প্রতি অবিচার ও অসম আচরণ প্রতিরোধে ব্যবস্থাঃ নারী হওয়ার কারণে নারীর প্রতি কোনো অসম আচরণ করা যাবে না।[১] যেমন নারী শিশুকে কম খেতে দেয়া, পুরুষ শিশুকে বেশি খেতে দেয়া, নারী শিশুকে কম আদর করা বা অবহেলা করা আর পুরুষ শিশুকে বেশি আদর করা, নারীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা আর পুরুষকে সকল উত্তরাধিকারের মালিক করে দেয়া। নারী বলে কাউকে কাজে নিয়োগ না দেয়া (যদি সে কাজে নিয়োগ দেয়ার ক্ষেত্রে শরীয়াতের নিষেধাজ্ঞা থাকে, সে কথা স্বতন্ত্র), নারী হওয়ার কারণে তাকে লেখাপড়া থেকে দূরে রাখা ইত্যাদি বিষয়গুলো ইসলাম সমর্থন করে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলাম বরং নারী শিশু ও নারীকেই পুরুষের উপর অধিক মর্যাদা এবং অধিকতর অধিকার প্রদান করে থাকে।[২]

বাংলাদেশের মত তথাকথিত আদমশুমারির মুসলিম দেশে নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নারীরও কিছু দায়িত্ব রয়েছে।[৩] যেহেতু এ দেশের পুরুষরা ইসলামের বিধি-বিধান সত্যিকারার্থে অনুশীলন করে না, তাদের নীতি-নৈতিকতা ইসলামী আদর্শে গড়ে উঠেনি, সে কারণে মানসিক দিক দিয়ে তারা অধিকাংশই মন্দ। অধিকাংশই নারীকে মর্যাদা দেয়ার পরিবর্তে ভোগের সামগ্রি হিসেবে দেখতেই পছন্দ করে। আখিরাতের ভয় না থাকায় নারীর সাথে যে কোনো অন্যায় করার ক্ষেত্রে তাদের এতটুকু দ্বিধা হয় না। সে কারণে যে সকল নারীর ক্ষমতা আছে তারা ব্যক্তি পর্যায় থেকে জীবনের সকল পর্যায়ে ইসলামের উন্নত নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, সন্তানদের ইসলামের নৈতিকতা সমৃদ্ধ করে তুলতে পারেন, নিজেরা ইসলামের শালীনতার বিধান মেনে চলতে পারেন। তাহলে আশা করা যায়, অনেক বিব্রতকর অবস্থা থেকে তারা এমনিতেই রক্ষা পাবেন। বাংলাদেশে অনেকেই ফ্যাশন করে পর্দা করার নামে বোরখা[৪] পরেন। অনেকেই পর্দার জন্য বোরখা পরতে বাধ্য হন পারিবারিক

---

[১] মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকা ১৯৮৮, পৃ.৮৮

[২] মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *নারী*, ঢাকা ২০০৮, পৃ.৪৭

[৩] মুহাম্মদ আতাউর রহমান কাশেমী, *ইসলামের দৃষ্টিতে নারী শিক্ষা*, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ.৮৪

[৪] বাংলাদেশে অনেক মন্দ চরিত্রের নারী নিজেদের আড়াল করার জন্য বোরকা পরে থাকেন। অনেক অপরাধী আত্মগোপনের জন্য বোরকা ব্যবহার করেন। অনেক অভিনেত্রী ভক্তদের নিকট থেকে বাঁচার জন্য বাইরে চলাচলের ক্ষেত্রে বোরখা পরেন। এসব কাজে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য বোরকাকে দোষ দেয়া উচিত নয় বা এটা বলা উচিত নয়, বোরকা পরিহিতা নারীরাই বেশি খারাপ। পোশাকটি ভাল উদ্দেশ্যে সৎ নিয়তে পবিত্রতার পরিচ্ছেদ হিসেবেই তৈরি হয়ে থাকে। কেউ যদি মন্দ নিয়তে, খারাপ কাজে এটি ব্যবহার করেন, সেটি তার দোষ; পোশাকটির নয়। যেমন অস্ত্রোপাচারে চাকু ব্যবহার হয়, ছিনতাইয়েও চাকু ব্যবহার হয়। দোষটি চাকুর নয়। বরং আমরা যারা ব্যবহার করছি, দোষ তাদেরই। [মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *নারী ও আধুনিক চিন্তাধারা*, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ.২৩]

Dhaka University Institutional Repository

কারণে। মনে রাখা প্রয়োজন, পর্দা কেবল নারীর জন্য ফরয নয়, পুরুষের জন্যও সমানভাবে ফরয। আর বোরখা পরলেই পর্দা করা হয় না। এটা পর্দার একটা মাধ্যম মাত্র। তা সত্ত্বেও এই বাংলাদেশে যতোজন নারী এসিডে ঝলসিত হয়েছে তাদের কেউ–ই পর্দানশীল বা বোরখা পরিহিতা নারী নন। এ থেকে এটাও প্রমাণ হয়, এ সকল নারীদের অনেকেই আন্তরিকভাবে পর্দাবিধান না মেনে চললেও কেবল বোরখা পরার কারণে যেখানে অনেকখানি নির্যাতন থেকে রেহাই পাচ্ছেন, সেখানে তারা যদি ইসলামের সকল বিধান মেনে চলেন, তাহলে তারা যে নির্যাতন থেকে পুরোপুরি রক্ষা পাবেন, তা সহজেই প্রতীয়মান হয়। সাথে সাথে সমাজের পুরুষগণ যদি ইসলামের বিধান মেনে নারীর অধিকার আদায় এবং নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে এগিয়ে আসেন, তাহলে আলাদা করে নারী দিবস ঘোষণা করার প্রয়োজন হবে না। বরং প্রতিদিনই নারীর সম্মান ও অধিকার যথাযথভাবে রক্ষিত হবে। এই বাংলাদেশে একজন নারীও আর নির্যাতনের শিকার হবেন না।[১]

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ইসলামী বিধানের প্রচার ও প্রসারে মসজিদের ভূমিকা

বাংলাদেশসহ সমগ্র পৃথিবী ব্যপি রয়েছে অসংখ্য মসজিদ। মসজিদকে ইসলামী সমাজের একটি মডেল বিবেচনা করা হয়। তবে মসজিদ কোন স্বয়ংক্রিয় প্রতিষ্ঠান নয়। মুসলিম উম্মাহর বিশেষত ইমামগণের সঠিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে মসজিদ সক্রিয় হয়। এ কারণে মসজিদের ভূমিকা বলতে প্রকারান্তরে ইমামগণের ভূমিকাকেই নির্দেশ করা হয়।[২] প্রত্যেক মসজিদের ধর্মীয় কার্যাবলী সম্পাদন করতে নিযুক্ত থাকে এক বা একাধিক ইমাম ও খতিব। যিনি ঐ মসজিদের আওতাভুক্ত সকলের নেতৃত্ব প্রদান করে থাকেন। স্বভাবতই প্রত্যেক শ্রেণীর সাধারণ জনতা একজন ইমামকে সম্মানের সাথে দেখেন। তার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ভক্তি রাখেন। পৃথিবীর সকল মুসলমানগণই কোনো না কোনো ইমামের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সে ক্ষেত্রে একজন ইমাম যদি একটু সোচ্চার ও সতর্ক থাকেন, তাহলে তিনি নারী নির্যাতন রোধে যে ভূমিকা পালনে সক্ষম হবেন তা অন্য কারো পক্ষে প্রায়শই দুষ্কর। তাই ইমাম সাহেবগণ ইচ্ছা করলে বিভিন্নভাবে আপামর জনতাকে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সচেতনসহ তাদের নিয়ে সামাজিক দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন। আর একজন ইমামের সামান্য প্রচেষ্টা

---

[১] অধ্যক্ষ যাইনুল আবেদীন, *নারী নির্যাতন রোধে ইমামগণের ভূমিকা*, ঢাকা ২০০৬, পৃ.১৩

[২] এ এন এম সিরাজুল ইসলাম, *ইসলামে মসজিদের ভূমিকা*, ঢাকা ২০০৪, পৃ.৮২

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে নারী জাতিকে ফিরিয়ে দিতে পারে ন্যায্য অধিকার। নারী ফিরে পেতে পারে তার হারিয়ে যাওয়া সম্মান।[১]

ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন, অনুসরণ ও অনুশীলনে আগ্রহ তৈরি

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে মসজিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং মসজিদের ভূমিকার প্রকৃত সুবিধা জনগণকে দিতে হলে প্রথমেই 'বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ইসলামী বিধানের ভূমিকা' শীর্ষক অনুচ্ছেদে যে ১৫টি ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে সেগুলো বিভিন্নভাবে মুসল্লিগণকে বুঝাতে হবে। তাদের সামনে নিয়মিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যবস্থাগুলো বাস্তবায়নের সুবিধা এবং বাস্তবায়নের কর্মকৌশল সম্পর্কে আলোচনা পেশ করতে হবে। তাদের নিকট থেকে মতামত নিয়ে তারা যেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে, স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগে নিজেরাই সংগঠিত হয়ে ব্যবস্থাগুলো কার্যকর করার জন্য উদ্যোগী হয়ে ওঠে, ইমামগণ সে লক্ষ্যে তাদেরকে নিরন্তর উৎসাহ প্রদান করবেন। এর পাশাপাশি তাঁরা আরও কিছু কা করবেন, যাতে ব্যবস্থাগুলোর অনুসরণ, অনুশীলন ও বাস্তবায়নের সঠিক প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। যেমন,

ফরয নামাযসমূহের পর আলোচনা

যেহেতু আমাদের দেশে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের শেষে কিছু সময় নিয়ে ইমাম সাহেব মুসল্লিগণের সাথে বিভিন্ন দু'আসহ অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করে থাকেন। এ সুযোগে যদি ইমাম সাহেব কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে নারীদের অধিকার কি? এবং নারী নির্যাতন করলে এর পার্থিক ও পারলৌকিক ভয়াবহতা কি? এ বিষয়ে আলোচনা করেন, আশা করা যায় নারী নির্যাতন রোধে তা কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।[২]

জুমুআ'র খুতবা

প্রতি জুমুআ'বার অধিকাংশ মুসলমানই পবিত্র জুমুআর নামায আদায় করার লক্ষ্যে মসজিদে উপস্থিত হয়। সে ক্ষেত্রে ইমাম সাহেব যদি তার ওয়ায বা খুতবা দ্বারা নারী নির্যাতনের ধরন, নারী নির্যাতনের

---

[১] অধ্যক্ষ যাইনুল আবেদীন, নারী নির্যাতন রোধে ইমামগণের ভূমিকা, পূর্বোক্ত, পৃ.১৭

[২] মুহাম্মদ আবদুর রশিদ, *মসজিদের মূল্যবোধ ও দর্শন, ঢাকা ১৯৯৮, পৃ.৭৭*

Dhaka University Institutional Repository

ভয়াবহতা ও নারীর প্রতি পুরুষের করণীয় ইত্যাদি বিষয়গুলো কুরআন-হাদীসের আলোকে তুলে ধরেন এটা নারী নির্যাতন রোধে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করবে আশা করা যায়।[১]

ওয়াজ–মাহফিল দ্বারা

বাংলাদেশসহ বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে দেখা যায় হাট-বাজারে, গ্রাম-গঞ্জে, মাদরাসা-মসজিদে বিভিন্ন সময় ওয়াজ-মাহফিলের আয়োজন করা হয়। সেখানে ওয়াজ-নসীহত করার জন্য ইমামগণকে দাওয়াত করা হয়। সে ক্ষেত্রে ইমাম সাহেব সামান্য সচেতন হলে এ সুযোগে তিনি নারীদের অধিকারসমূহ ও নারীর প্রতি পুরুষের অনাচার সম্পর্কে সাধারণ লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। যা সামাজিক ক্ষেএে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে।[২]

সাপ্তাহিক ও মাসিক বৈঠক দ্বারা

ইমামগণ প্রতি সপ্তাহে বা মাসে একবার পূর্ব ঘোষণানুযায়ী সাধারণ মুসল্লিদের নিয়ে আলোচনা রাখতে পারেন। যার বিষয়বস্তু হবে 'নারী সম্ভ্রম রক্ষায় পুরুষের করণীয়'।

কমিটি গঠন দ্বারা

প্রত্যেক ইমাম তার মসজিদ পরিচালনার জন্য কিছু সংখ্যক জ্ঞানী-গুণীর সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করতে পারেন। যারা মসজিদ পরিচালনাসহ সামাজিক নেতৃত্ব ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে জোরদার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।[৩]

সেমিনার ও জনসমাবেশ দ্বারা

সেমিনার ও জনসমাবেশে শিক্ষিত-অশিক্ষিত ছোট-বড়, প্রায় সব ধরনের লোকের সমাগম ঘটে। ইমামগণ যদি এ সকল স্থানে নারীদের প্রতি সদাচরণ, তার ন্যায্য অধিকার এবং নারী স্বাধীনতার পেক্ষিতে পবিত্র আল কুরআন মজীদ ও হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন তাহলে এট গণসচেতনতা সৃষ্টির ব্যাপার ব্যাপক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে।[৪]

---

[১] মুহাম্মদ আবু তাহের শফিউদ্দীন, *মহিলাদের হিজাব কেন*, ঢাকা ২০০৭, পৃ.১৭

[২] মওলানা রহমতুল্লাহ, *ইসলামের দৃষ্টিতে মাতৃজাতির মর্যাদা ও অধিকার*, ঢাকা ১৯৯৯, পৃ.৮৭

[৩] বাংলাদেশ মসজিদ মিশন ম্যানুয়াল, ২০০৭, পৃ.২৮

[৪] বাংলাদেশ মসজিদ মিশন ম্যানুয়াল, ২০০৭, পৃ.২৯

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহে আলোচনা

ধর্মীয় বিভিন্ন দিবসকে সামনে রেখে সাধারণ জনগণ মসজিদে আগমন করে। যাদের অনেককে প্রায়শঃই দেখা যায় না অথচ ঈদ, শবে কদর, শবে বরাত উপলক্ষে তারা মসজিদের পানে ছুটে আসেন। এ সময় ইমাম সাহেব তাদের উদ্দেশ্যে নারীর অধিকার, নারীর সম্মান রক্ষা বিষয়ক আলোচনা করতে পারেন। যা নারী নির্যাতন রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।[১]

সামাজিক প্রতিরোধ

প্রায় স্থানেই জনগণ এমন রয়েছে যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযী, শরীয়তের অন্যান্য বিধি বিধান যথাযথ পালন করলেও নারীর অধিকার সমন্ধে তারা অজ্ঞ। এ সকল ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসী জনগণ মাঝে মধ্যে তাদের বাসা-বাড়িতে ইমামগণকে দু'আর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দাওয়াত দিয়ে থাকেন। এ সকল অনুষ্ঠানেও ইমামগণ নারীর অধিকার, নারীর প্রতি পুরুষের দায়-দায়িত্বসহ নারী নির্যাতন শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটা মারাত্বক অপরাধ সে বিষয়ে আলোচনা তুলে ধরতে পারেন।[২]

প্রায় স্থানেই ইমাম সাহেব সমাজের অন্যতম নেতা হিসেবে বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও সামাজিক কর্ম-কাণ্ডে অংশ নিয়ে থাকেন। যদি ঐ সকল বৈঠকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও নারী নির্যাতনে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[৩] এতে ফলাফলের আশা করা যায়।

নেতৃস্থানীয় লোকদের

সমাজের নেতৃবর্গ যদি আল্লাহভীরু ও সৎ হয় সে এলাকা বা মহল্লায় নারী নির্যাতনের দুঃসাহস কেউ প্রদর্শন করবে না। সেক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে যদি ইমাম সাহেব নারী সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা দিতে সক্ষম হন এবং কুরআন-হাদীসে বর্ণিত নারী অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করেন তাহলে এতে সুদূর প্রসারী ফলাফলের আশা করা যায়।[৪]

[১] বাংলাদেশ মসজিদ মিশন ম্যানুয়াল, ২০০৭, পৃ.৩০

[২] অধ্যক্ষ মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন, ইমামদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, পূর্বোক্ত, পৃ.২১

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ.২৩

[৪] অধ্যক্ষ মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন, নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ইমামগণের ভূমিকা, পূর্বোক্ত, পৃ.৩২

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদভিত্তিক মকতব/গণশিক্ষার আয়োজন

আজকের শিশু আগামী দিনের পিতা, এ ধারাকে সামনে রেখে, ইমামগণ যদি তাদের ছোট বিদ্যা শিক্ষার আসর মকতব বা গণশিক্ষা কেন্দ্রে কঁচিকাঁচা শিশুদেরকে নারী পুরুষের পারস্পরিক অধিকার এবং নারী জাতির সম্মান ও নারী নির্যাতনের কুফল সম্বন্ধে ধারণা প্রদান করেন এবং পবিত্র আল কুরআন মজীদ ও হাদীসের মধ্যে এ বিষয় সম্বন্ধীয় আয়াত ও হাদীসের দারস পেশ করেন তাহলে দেখা যাবে সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন মানবজাতি নারী নির্যাতন কি তা চিন্তাও করবে না।[১]

লেখনির মাধ্যমে

বর্তমান যুগ প্রযুক্তির যুগ এ যুগের সাথে সমান তালে এগিয়ে ইমামগণ যদি তাদের লিখনি দ্বারা দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক,ত্রৈমাসিক, বার্ষিক পত্র-পত্রিকায় জনগণের প্রতি নারীর অধিকার বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা এবং নারী নির্যাতনের কুফল বিষয়ক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা,পত্র ইত্যাদি বিষয়ে ভূমিকা রাখতে পারে তা অবশ্যই শিক্ষিত আপামর জনতাকে নারীর অধিকার সম্বন্ধে সজাগ করতে সহায়ক হবে। নারীর অধিকার, নারী নির্যাতনের অপরাধ বিষয়ক পুস্তক রচনা দ্বারাও একজন ইমাম যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারেন।[২]

পরিশেষে বলা যায়- নারী নির্যাতন একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি। আজ যারা নারী মুক্তি, নারী স্বাধীনতার নামে নারীকে মাঠে নামিয়েছেন তারা নারীর মর্যাদা রক্ষাতো করেইনি বরং নারীকে বেপর্দা, বেহায়া বানিয়ে তাদের ইজ্জত-সম্মান ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্ম ও গোষ্টির নির্যাতন ও নিস্পেষিত নারী সমাজকে একমাত্র ইসলামই পরিপূর্ণ মর্যাদা নিশ্চিত করেছে। মসজিদের ইমাম ও খতিবগণ কুরআন হাদীসে বর্ণিত নারীর মর্যাদসমূহ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জুমুআর খুতবায় উল্লেখিত কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে নারীর সঠিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে নারী নির্যাতনের দ্বারা বন্ধ করতে পারবে।

[১] প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫

[২] আহমদ বশির ও মুর্তজা মুহাইমেন, বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা : একটি মূল্যায়ন, ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র স্মরণিকা, ঢাকা ২০০৯, পৃ.৭৬

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

নারী নির্যাতন বাংলাদেশের একটি ভয়ানক সামাজিক সমস্যা। ধর্মপরায়ণ মানুষের এ দেশে ধর্মকে উপেক্ষা করে বা ধর্মকে বাদ দিয়ে কেবল নানাবিধ উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচীর মাধ্যমে নারী নির্যাতন রোধ করা সম্ভব হবে না। সুনির্দিষ্টভাবে বললে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের এ দেশে নারী নির্যাতনের মত একটি ভয়ঙ্কর সামাজিক সমস্যা নির্মূল করতে হলে ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন করতে হবে। ধর্মপরায়ণ মুসলিমগণ সাধারণভাবেই ইসলামের আইনসমূহ মেনে চলেন। যারা মেনে চলেন না, তারাও না মেনে চলার জন্য গর্ববোধ করেন না, বরং লজ্জিত হন, মর্মপীড়ায় দগ্ধ হন। এই লোকদেরকে যদি সঠিকভাবে ইসলামের কেন্দ্রীভূত উদ্দেশ্য ও মূলীভূত চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যায়, তাহলে তারা নিজেরাই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ইসলামী বিধানসমূহ অনুশীলনে ও বাস্তবায়নে আগ্রহী হয়ে উঠবে। বিভিন্ন সংকট সন্ধিক্ষণে এ দেশের ধর্মপরায়ণ মুসলিমদের আবেগ ও আকীদার স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায়। সালমান রুশদীর কুখ্যাত স্যাটানিক ভার্সেস কিংবা অধুনা মুক্তিপ্রাপ্ত পাশ্চাত্যের চলচ্চিত্র 'দি ইনোসেন্স মুসলিম'–এর বিরুদ্ধে আপামর মুসলিমদের প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ থেকে তাদের ভেতরের আকীদা ও আবেগের ব্যাপক স্ফুরণ লক্ষ্য করা গিয়েছে। সঠিক পরিচর্যা, যথাযথ নির্দেশনা এবং প্রকৃত মূল্যবোধে এ আবেগকে ব্যবহার করা সম্ভব হলে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধেও তা কার্যকর হয়ে উঠবে। এ অভিসন্দর্ভে আমরা একান্তভাবে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ইসলাম যে সকল বিধান প্রদান করেছে সেগুলো বিন্যস্তাকারে উপস্থাপন করেছি এবং বাংলাদেশের সমাজ থেকে এই অভিশাপ দূর করার জন্য ইসলাম বিধানগুলো কীভাবে কার্যকর করা যায় তার পথ উদ্ভাবনের প্রয়াস পেয়েছি। অভিসন্দর্ভেও শিরোনামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্বাভাবিকভাবেই আমরা এ অনুসন্ধানে মসজিদ কী ভূমিকা পালন করতে পাওে বিশেষভাবে সে বিষয়টি অনুসন্ধান করেছি। এতে একান্তভাবে প্রমাণ হয়েছে, বাংলাদেশের মত একটি ধর্মপরায়ণ মুসলিম জনসাধারণের দেশকে নারী নির্যাতনের অভিশাপ মুক্ত করার সামাজিক আন্দোলন যদি মসজিদকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয় তাহলে সে আন্দোলন সফল হতে বাধ্য। কারণ মহান আল্লাহ মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাব সম্পর্কে জেনেই ইসলামী বিধানসমূহ প্রদান করেছেন। মসজিদকে কেন্দ্র করে সে বিধান বাস্তবায়নের আন্দোলন শুরু করা সম্ভব হলে মানুষ তার প্রকৃতিকে সঠিকভাবে বুঝায় ও নিয়ন্ত্রণের তাগিদ পাবে। আল্লাহর বিধান মেনে না চলার পার্থিব ও পারলৌকিক পরিণতি সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞান লাভ করতে পারবে। বলা বাহুল্য যে, মসজিদ কেন্দ্রিক এই সামাজিক আন্দোলনে ইমামগণই হবেন সর্বজনগ্রাহ্য নেতা। এ অভিসন্দর্ভ ইমামগণের

Dhaka University Institutional Repository

অবিস্মরণীয় এই ভূমিকা পালনের উপরেই অনুসন্ধানলব্ধ সকল কর্মকৌশলের সফল বাস্তবায়ন নির্ভরশীল বলে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে।

বস্তুত বাংলাদেশের নারী নির্যাতন প্রতিরোধে মসজিদের ভূমিকা বলতে প্রকৃতপক্ষে ইমামগণের যথাযথ ভূমিকা পালনের কথাই বলা হয়েছে। কারণ মসজিদ একটি প্রতিষ্ঠান, ইমামগণ হলেন সে প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রক। ইমামগণ নিস্ক্রিয় হলে বা সঠিকভাবে পথ নির্দেশ না করলে বা যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হলে, মসজিদও সঠিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে না। অভিসন্দর্ভে আমরা একান্তভাবে মসজিদ ও ইমাগণের এই মেল বন্ধনের মাধ্যমে ইসলামী বিধান বাস্তবায়নের সম্ভাবনার মধ্যে নারী নির্যাতন প্রতিরোধের অব্যর্থ উপায় উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছি। এ উপায় সফলভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হলে বাংলাদেশ নারী নির্যাতনের অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

আল–কুরআনুল কারীম

আহমাদ বিন শুআইব আন–নাসাঈ, *আস–সুনান*, কায়রো, ১৪০১ হিজরি

আবূ দাউদ সুলায়মান ইবন আল-আশ'আস, *আস–সুনান*, দিল্লী, ১৪০৭ হিজরি

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আদ–দারেমী, আস–সুনান, বৈরুত, ১৪১২ হিজরি

আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল–মুসনাদ*, মক্কা, ১৯৭৮

আহমদ আন্দালুসী, *আল–মুসনাদ*, কায়রো, ১৪০০ হিজরি

আন্দালিব রাশদি, *আল–খিলাফাত*, কায়রো, ১৩৯৮ হিজরি

আবূ য়ুসূফ, *কিতাবুল খারজ*, উর্দূ সংস্করণ, করাচী ১৯৬৬ খ্রি.

আবদুল হক দেহলভী, *আল–লুমআত*, দিল্লী, ১৩৯৮ হিজরি

আবদুল মালিক ইবনে হিশাম, *সীরাতুন নববিয়্যাহ*, কায়রো ২০০৮

আল-মুনজিদ, বৈরূত, ২০০৩

আবদুল ওয়াহাব যুহরী, *ইসলাম কা নেযামে হায়াত* (উর্দূ), লাহোর, ১৯৫৯

আল্লামা শিবলী নু'মানী, *সীরাতুন্নবী* (উর্দূ), লাহোর ২০০২

আবূ বকর আল–রাযী, *যাদুল মাআদ*, দিল্লী, ১৪০৬ হিজরি

আহমদ কুস্তালাবী, *আল–লুগাত*, বৈরুত, ১৯৯৯

আহমাদুল মুস্তফা, *আল–মারাগী*, বৈরুত, ১৪১১ হিজরি

ইমাম মুনযিরী, *বিররুল ওয়ালিদাইন*, বৈরুত, ১৪২৩ হিজরি

ইমাম শাফি'ঈ, *তাহকীক খায়রি সা'ঈদ*, কায়রো ২০০২

ইবন হাজার আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, বৈরুত, ১৪০০ হিজরি

Dhaka University Institutional Repository

ইবন হাজার আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, বৈরুত, ১৪০০ হিজরি

কাযী মুহাম্মদ সুলায়মান মানসূরপূরী, *রাহমাতুল্লিল আলামীন* (উর্দূ), লাহোর ২০০৬

খালিদ বিন আবদুল মাআল, *ইত্তেহাফুস সাজিদ বি আহকামিল মাসাজিদ*, আন্দালুস, ১৪২৮/২০০৭

গালিব কান্দুলাবী, মাসাজিদুল মুজাসসাম, কায়রো ১৯৮৯

জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *আল-আজিউস সাগীর*, কায়রো, তারিখ বিহীন

দায়েরায়ে মা' আরিফে ইসলামিয়াহ, লাহোর, ১৯৮০

বদরুদ্দীন আইনী, *উমদাতুল ক্বারী*, কায়রো ১৯৭২

মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আল–বুখারী, *আস–সহীহ*, দিল্লী, ১৪০২ হিজরি

মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল–কুশাইরী, *আস–সহীহ*, দেওবন্দ, ১৪০০ হিজরি

মুহাম্মদ বিন ঈসা আত–তিরমিযী, *আস–সুনান*, কায়রো, ১৪০১ হিজরি

মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ, *আস–সুনান*, দেওবন্দ, ১৩৯৮ হিজরি

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল–খতীব, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, কুতুবখানা রশিদীয়া, দিল্লী ১৩৮৭ হিজরি

মুহাম্মদ বিন আহমদ কুরতুবী, *আল-জামিউ লি আহকামিল কুরআন*, কায়রো, ১৯৯৭

মুফতী মুহাম্মদ শফী, *আদাবুল মাসাজিদ* (উর্দূ), আশরাফিয়া কুতুবখানা, চট্টগ্রাম ১৯৭৮

মুহাম্মদ সায়্যিদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, কায়রো ১৪১৯ হিজরি

মুস্তফা আল-গালায়ীনী, *আল-ইসলাম রুহুল মাদানিয়্যাহ*, বৈরুত ১৯৯৫

রাগিব ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাতু ফি গারীবিল কুরআন*, করাচী, ১৩৭৮ হিজরি

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা*, ঢাকা, তারিখ বিহীন

শায়খ তুআহাল ওয়ালী, *আল-মাসাজিদু ফিল ইসলাম*, বৈরূত ১৯৮৮

শাওকানী, *নাইলুল আউতার*, বৈরুত, ১৯৭৩

Dhaka University Institutional Repository

সুলায়মান বিন আহমদ আত-তাবরানী, *মু'জামুস সাগীর*, বৈরূত, ১৯৮১

হাসান আহমদ সুদাসী, *আল-মাসাজিদুল জামিয়া*, বৈরুত, ১৪১২

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৮, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ঢাকা ২০০৯

অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক, *মানব সভ্যতায় মসজিদের অবদান*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ৩য় সংস্করণ-১৪২৫/২০০৪

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শামসুল হুদা, *নারীর অধিকার ও মর্যাদা*, ঢাকা ১৯৯৫

অধ্যক্ষ মোহাম্মদ যাইনুল আবেদীন, *ইমামদের দায়িত্ব ও কর্তব্য*, বাংলাদেশ মসজিদ মিশন, ঢাকা, নভেম্বর ২০০১

অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ যাইনুল আবেদীন, *নারী নির্যাতন রোধে ইমামগণের ভূমিকা*, বাংলাদেশ মসজিদ মিশন, ঢাকা, নভেম্বর ২০০৬

অধ্যাপক নাজির আহমেদ ও ড. মুহাম্মদ নুরুল আমিন, *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস*, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৮৯

অধ্যাপক লুৎফর রহমান, *মসজিদের সামাজিক ভূমিকা*, ঢাকা ১৯৭৯

অধ্যাপক মাজহারুল ইসলাম, *পর্দা প্রগতির সোপান*, শেরপুর, ১ম সংস্করণ-১৯৯৩

অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মসজিদের ইতিহাস*, বুক চয়েজ, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০৩

আবদুল খালেক, *নারী*, ঢাকা ১৯৯৫

আবদুল কাদির সম্পাদিত, *নজরুল রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড*, ঢাকা, ১৯৮৪

আহমদ বশির ও মুর্তজা মুহাইমেন, *বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা:একটি মূল্যায়ন*, ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র স্মরণিকা, ঢাকা ২০০৯

আব্দুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, ঢাকা-১৯৮০

আবদুল হাফিয, *মৌলিক সংস্কার ও মানব সমাজ*, মুক্তধারা ১৯৭৫

Dhaka University Institutional Repository

আলবাহি আল খাওলী, অনুবাদক, মোহাম্মদ নুরুল হুদা, *নারী : ইসলামের দৃষ্টিতে*, ঢাকা-১৯৯০

আল্লামা আব্দুস সামাদ রাহমানী, *নারী মুক্তি কোন পথে?* ভাষান্তর-মুফতী মঈনুদ্দীন তৈয়বপুরী, বাড পাবলিকেশন, ঢাকা-২০০০

আজাদুর রহমান চন্দন, *ধর্ষণ, খুন ও নারী নির্যাতন : প্রতিকারহীন না প্রতিকারযোগ্য বাস্তবতা*, উন্নয়ন পদক্ষেপ, স্টেপস টুওয়ার্ড ডেভেলপমেন্ট, ৪র্থ–১১শ সংখ্যা, এপ্রিল–জুন ১৯৯৮

অ্যাডভোকেট সালমা ইসলাম, *নারী নির্যাতন ও বাংলাদেশ*, আইন ও সালিশ কেন্দ্র স্মরণিকা ২০১০

আব্দুল কারিম বিআজার সিরাজী, *নারী নির্যাতন যুগে যুগে* ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা ডিসেম্বর-১৯৯২

আজিজুল বান্না, *নারী মুক্তি যুক্তির কষ্টিপাথরে*, ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, মার্চ ১৯৮০

আল মাসুদ হাসানউজ্জামান (সম্পাদনা), *বাংলাদেশের নারী : বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০২

আবদুল হামিদ আহমদ আবু সুলাইমান, *বৈবাহিক সমস্যা ও কুরআন মজীদের সমাধান*, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০১০

আবদুল হালীম আবু শুককাহ, রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা (১ম খণ্ড), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১১

আবদুল হালীম আবু শুককাহ, রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা (২য় খণ্ড), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ঢাকা, নভেম্বর ২০০২

আবদুল হালীম আবু শুককাহ, রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা (৩য় খণ্ড), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১১

আবদুল হালীম আবু শুককাহ, রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা (৪র্থ খণ্ড), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ঢাকা, ডিসেম্বও ২০০৬

আহমদ রফিক, *ইসলামী পরিবার: প্রকৃতি ও বিধান*, চট্টগ্রাম ২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

আহমাদুল বান্না, *ইসলামে নারী*, অনুবাদঃ আখতার ফারুক, ঢাকা ২০০২

ইসলামী বিশ্বকোষ, ১-২৫ খণ্ড, ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩

ইফতেখার ইকবাল, *পাচার : একটি নির্মম অমানবিকতা*, সামাজিক গবেষণা কেন্দ্র জার্নাল, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১১

ইউনিসেফ, *বাংলাদেশের শিশু ও তাদের অধিকার*, ঢাকা ১৯৯৭

ইসহাক ওবায়দী, *যুগে যুগে নারী*, ঢাকা ১৯৯৭

ইয়াসিন আহমেদ, *বাংলাদেশের মসজিদ*, ঢাকা ২০০১

এ জেড এম শামসুল আলম, *ইসলামী প্রবন্ধমালা*, ইফাবা, ঢাকা এপ্রিল ২০০৪

এ কে এম সিরাজুল ইসলাম, *মসজিদ ও আমাদের সমাজ*, ঢাকা ২০০২

এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম, *ইসলামে মসজিদের ভূমিকা*, ঢাকা, ২য় সংস্করণ-১৪২৫/২০০৪

এফ এম আবদুল জলীল, *মুসলিম সভ্যতায় নারী*, খুলনা, ১৯৮০

এ কে এম শাহনেওয়াজ, *বিশ্বসভ্যতা*, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৫

কাজী আবদুর রউফ, *মানুষ ও সংস্কৃতি*, গোল্ডেন বুক হাউজ, ঢাকা ১৯৭৬

খুরশিদ আহমদ, *ইসলামের আহবান*, ঢাকা ১৯৮৭

গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামে নারী ও শিশু প্রসঙ্গ*, ঢাকা ১৯৮১

গোলাম হোসায়ন সলিম, *রিয়াযুস সালাতীন*, বাংলা অনুবাদঃ বাংলার ইতিহাস, আকবর উদ্দীন অনূদিত, ঢাকা, ১৯৭৪

জনসংখ্যা বিষয়ক জরিপ প্রতিবেদন, নিপোর্ট, ২০১০

ড. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, *মনুসংহিতা*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ২০০০ খ্রি

ড. কে এম মোহসীন ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ*, ইফাবা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩

Dhaka University Institutional Repository

ড. মুহাম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ঢাকা, মার্চ ২০০৩

ড. হাসান জামান, *সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য*, ঢাকা–১৯৬৭

ড. আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি*, রংপুর, জানুয়ারি ২০০৩

ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মসজিদের ইতিহাস*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ-১৪২৪/২০০৩

ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *বাংলাদেশের মসজিদ*, সুবর্ণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১১

ড. ইয়াকুব আলী, *মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা*, রাজশাহী, ৫ম সংস্করণ, ১৪১৭/১৯৯৬

ড. আসাদ শফিক, *মসজিদের সামাজিক প্রভাব : পর্যালোচনা*, ইফাবা, মুহররম ১৪০০

ড. মাহমুদুল হাসান, মসজিদের ইতিবৃত্ত, ঢাকা ১৯৯২

ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *ইসলামের সামাজিক ব্যবস্থা ও পরিবার কল্যাণ*, ঢাকা ২০১১

ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্ম*, ঢাকা ২০১২

ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *আস–সীরাতুন নববীয়া*, ঢাকা ২০১২

ড. ইফতেখার আহমেদ, *মসজিদ ও আমাদের সমাজব্যবস্থা*, আইআরসি, ঢাকা ২০০০

ড. মফিজুল ইসলাম, *গ্রীক ইতিহাস*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৮০

ড. মিযানুর রহমান, *বাংলাদেশের মানবাধিকার পর্যালোচনা* ২০০৯, এইচআরপি ২০১০

ড. মাহবুবা রহমান, *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী*, ইফাবা, ঢাকা জুন ২০০৮

ড. জামাল আল বাদাবী, *ইসলামী শিক্ষা সিরিজ*, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ঢাকা, আগস্ট ২০০৮

ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ–সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল–হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা আগস্ট ২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

ড. মুহাম্মদ আবদুল বাকী, *বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৫

ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে মসজিদের ভূমিকা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা ১৯৯৭

তানযীলুর রহমান, *মজমু আ ই কাওয়ানীনে ইসলাম*, ১ম খণ্ড, করাচী-১৯৬৫

নঈম সিদ্দিকী, *নারী অধিকার : বিভ্রান্তি ও ইসলাম*, শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা, জুলাই ২০০৭

প্রফেসর ড. আ. ন. ম. রইছ উদ্দীন, *সুফিবাদ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়*, ঢাকা ফেব্রুয়ারি ২০০৯

প্রফেসর এ.কে.এম আবদুল আলীম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, ঢাকা, জুন ১৯৯০

প্রফেসর মোহাম্মদ নূরনবী, *মুসলমানের ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, ঢাকা ২০০৯

বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবি সমিতি, *নারী নির্যাতন দিবস সংখ্যা ১৯৯৮*

বিমান চন্দ্র বড়ুয়া, *বুদ্ধের কল্যাণবাদ : একটি প্রায়োগিক বিশ্লেষণ*, দর্শন ও প্রগতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২৪ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন–ডিসেম্বর ২০০৭

বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর ও জরিনা রহমান খান, *বাংলাদেশে নারী নির্যাতন*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩

ব্রহ্মপুরাণ, কলকাতা ১৯৯৫

বি. আইশা লেমু ও ফাতেমা হীরেন, *ইসলামের দৃষ্টিতে নারী*, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০১০

মনসুর মূসা (সম্পাদনা), *বাঙলাদেশ*, এম.আই চৌধুরী, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা–১৯৭৪

মোহাম্মাদ আজরফ, *জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৪১১/১৯৯১

মোঃ রুহুল আমিন, *আমার বিশ্ব*, ওরিয়েন্ট পাবলিকেশন্স, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৮

Dhaka University Institutional Repository

মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.), আনু. মাওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দীন খান, *মা'আরিফুল কুরআন*, খাদেমুল হারামাইন বাদশা ফাহ্‌দ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, মদীনা মুনাওয়ারা, ১৪১৩/১৯৯২

মাওলানা আমিনুল ইসলাম, *তাফসীরে নূরুল কুরআন*, ইফাবা, ঢাকা, ২য় সংস্করণ-১৯৮৮

মোহাম্মাদ আকরাম খাঁ, *মুস্তফা চরিত*, ঢাকা, ১৯৯৮

মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, *মসজিদ ও জীবন্ত মসজিদ*, ঢাকা, ২০০৩

মোহাম্মদ শামসুল হক, *ইসলামী স্থাপত্য: তত্ব ও দর্শন*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, দ্বাত্রিংশ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮৮

মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, খায়রুন প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ঢাকা ১৯৮৮

মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলাম ও মানবাধিকার*, খায়রুন প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, ঢাকা ১৯৮৯

মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *নারী ও আধুনিক চিন্তাধারা*, খায়রুন প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, ঢাকা ১৯৯৭

মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *নারী*, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা মে ২০০৮

মুহাম্মদ আতাউর রহমান কাশেমী, *ইসলামের দৃষ্টিতে নারী শিক্ষা*, আল-আতহার একাডেমী, কাজী প্রিন্টার্স, ঢাকা-১৯৯৭

মুহাম্মদ আবু তাহের শফিউদ্দীন, *মহিলাদের হিজাব কেন*, ঢাকা ২০০৭

মওলানা ইসমাঈল ফরিদী, *মসজিদ ও মুসলিম সমাজ*, ঢাকা ২০০২

মুহাম্মদ আবদুর রশিদ, *মসজিদের মূল্যবোধ ও দর্শন*, ঢাকা ১৯৯৮

মোঃ নজরুল ইসলাম, *ইসলামী অর্থনীতি : প্রয়োগ ও ক্ষেত্র*, ঢাকা ১৯৯২

মোঃ হাসান আলী চৌধুরী, *ইসলামের ইতিহাস*, ঢাকা ১৯৯৬

মর্তুজা খালেদ, *জরথুস্ত্রবাদ ও প্রাচীন পারসিক ধর্ম : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, খণ্ড ১৩, সংখ্যা ১ ও ২, জুন-ডিসেম্বর ২০০৪

মওলানা খলিলুর রহমান, *ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা*, ঢাকা ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা রহমতুল্লাহ, *ইসলামের দৃষ্টিতে মাতৃজাতির মর্যাদা ও অধিকার*, রইসুল মু' আল্লিমীন সংকলন, ঢাকা ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯৯

মানবাধিকার ও জেন্ডার বিষয়ক আঞ্চলিক সেমিনার, ব্র্যাক সেন্টার ইন, ঢাকা, ৫ অক্টোবর ২০০৯

মোঃ এনামুল হক, *বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে বিবাহ ও নারীবাদ*, বাংলাদেশ কো–অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, ঢাকা, জানুয়ারি ২০০৫

মুহাম্মদ ফখরুদ্দীন, *নারী ও রাজনীতি*, মিলেনিয়াম পাবলিকেশন্স, ঢাকা মে ২০০৮

রমেশ কান্তি দাশ, *পৌরাণিক ভারতীয় নারী*, কলকাতা, ১৯৮৯

শাহনাজ পারভীন, *ইসলামে নারীর অধিকার ও অবস্থান*, ইফাবা, ঢাকা ২০১০

সুবল চন্দ্র মিত্র, *সরল বাংলা অভিধান*, কলিকাতা ১৯৮৫

সুকুমার ভট্টাচার্য, *প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য*, কলকাতা ২০০৪

সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, *নারী নির্যাতনের রকমফের*, বাংলাদেশ কো–অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, ঢাকা, অক্টোবর ২০০২

সেমিনার স্মারক–গ্রন্থ ২০০৮, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, নভেম্বর ২০০৮

সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা মে ১৯৯৭

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম ও ২য় খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২

সীরাত বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৪২৩/২৫০০৬

হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ*, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, আগস্ট–২০০০

Dr. Srinidhi Chowhan, *Women's History*, MacMillan & Co, London 1986

Mazhar Afza and khurshid Ahmad, *The position of woman in Islam*, Islamic Book Publishers, Kuwait 1982

Dhaka University Institutional Repository

Bangladesh: An Overview, 2008 Statistical Yearbook of Bangladesh, Government of The People's Republic of Bangladesh, 28th Edition, March 2009

M. A. Rahim, *Social and Cultural History of Bengal,* Dhaka-1968

M. Anamul Haque, *A History of Sufism in Bengal,* Dhaka, 1980

Bos-worth and others, *The Encyclopaedia of Islam,* vol. vi, leiden: E-J Brill, 1991

Edward William lane, *Arabic-English lexicon,* part 4, Asian educational services, New Delhi, 1985

Thomas Patrick Hughes, *Dictionary of Islam,* Adam publishers and distributors, New Delhi. 2nd ed,-2003

The world book Encyclopaedia, Vol-13, Ascott Fetzer Company, London. 1992

Gordon D. Newby, *A concise Encyclopaedia of Islam,* oxford, 2006

A.Z.M. Shamsul Alam, *The message of Tableg and Da wah,* Islamic foundation Banglades, Dhaka, 1993

Sir Muhammad Iqbal, *The Re-construction of religious Thought in Islam,* kitab bhavan, New Delhi, Fifth ed.-1994

Philip K. Hitti, *History of the Arabs,* MecMillan education Ltd, London. Tenth ed. 1970

Abdul Kadar Tayob, *Islam a short introduction,* one world oxford, 2006

Mofti Zafeeruddin, *Mosque in Islam,* Quzi publishers and distributors, New Delhi, 1996

Dhaka University Institutional Repository

Sir Thomas Arnold, *The caliphat*, Adam pubkishers and distributors, Delhi, Reprinted-1994

M.M. Pocthal, *Cultural side of Islam*, Kitab bhavan, New Delhi, 1990

HR Crelighton, *Ruins of Gaur*, London, 1817

M A Karim, Socio-Religious History of East Bangal, Dhaka 1978

A Cunnigham, *The Archaeological Survey of India Report*, Vol. XV, 'Report of a Tour in Bihar and Bengal in 1879-80', Calcutta, 1882

Arnold D. Macgil, *An Introduction to Indian Religious Institution*, Vol-iv, London 1994

Abid All Khan and HE Stapleton, *Memoirs of Gaur and Pandua*, Calcutta, 1931

ABM Husaun, 'The Ornamentation of the Sultanate Architecture in Bengal', *Journal of the Bangladesh Shilpakala Academy*, Dhaka, 1978

Ahdani, *Muslim Architecture in Bengal*, Dhaka, 1961

'Bengal Style of Muslim Architecture', *Islam Today*, Journal of the ISESCO, Rabat, 1985

Gaur-Lakhnauti, Dhaka, 1997

Sonargaon - Panam, Dhaka, 1997

Perween Hasan, *Sultanate Mosque Types in Bangladesh: Origins and Development*, Harvard University PhD Thesis, 1984

M Hafizullah Khan, *Terracotta Ornamentation in the Muslim Architecture Of Bengal*, Dhaka, 1988

Dhaka University Institutional Repository

Bible, *The New Testament in today's*, English Version 4th Edition. (Edit) American Bible society, New York 1976

Dida Hussain Malik; *Wives of the prophet (SM)*. (Pakistan: Lahore Asharaf Publications, 1983, B.C

Sail Abdullah Seif Al-Hatimy, *Woman in Islam,* Islamic Publication Ltd. Lahore, Pakistan, 1976

Professor G. K. Strong, *China Soceity,* London 1983

Ramesh Chandra Mazumdor, *Position of Indian Women in Domestic life,* (*Great Women of India)* Swamei and Mazumdar. Delhi 1996

A.L. Bashau, *The Wandar That was India,* Fontana, 1971

Professor Indra, *Statues of Woman in Mohabharat,* Chennai, 1999

Ahmad Gassani, *Zendabesta,* Tehran, 1983

Libra, *Womanhood and the Bible,* New York 2000

Klanser, *Joseph: From Jesus to Paul,* London 1964

Shaner, Donald W, *A Christian View of Divonce*, Leiden 1969

Report of the commission, Marriage, Divorce and the Church, London-1971

The Jewish Encyclopaedia

Pospishil, Victor, *Divorce and Marriage,* London 1987

Bettany, *World's Religions,* London, 1969

Rustum and Zurayk, *History of the Arabs and Arabic culture,* Beirut, 1940

O'lerry, De lacy: *Arabia before Muhammad,* London 1927

Dhaka University Institutional Repository

Jones Beven, *Woman in Islam*, Luckhnow; 1951

W. Smith, *Kinshipant marriage in Early Arabia*, London 1907

Jamshid Katrak, *Marriage in Ancient Iran*, Mombay, 1965

Thomas Bertram: *The Arabs*, London 1937

Ameer Ali, *The Spirit of Islam*, Delhi, 1965

Alfred Guillaume, *The life of Muhammad*, Oxford University Press, 1955

R. R. Wright, *An Internal Biological Analysis*, Oxford 1998

Dr. H. Korimov Andrey, *Women Rights in Islam*, London, 2003

Dr. Mohammad Abdur Rob and Mostaq Mohammad, *Violence against city women*, The Independent, 10 September 1999, Dhaka

Jyoti Talukder, *Violence Against Women in Nepal*, Country Report CWCD, Nepal, 1997

United Nation, *The Worlds Women Trends and Statistics*, 1995

Government of Bangladesh, Planning Commission, 1998 *Fifth Five Year Plan 1997-2002*, Ministry of Planning

Syed Mehdi Momin, *Violence against women and children : searching for causes*, Weekend Independent, 12 February 1999, Dhaka

Abdul Halim, *The Enforcement of Human Rights*, Dhaka 1995

Women for Women, A Research and Study Group, 1997, *Regional Overview on Violence Against Women: A Working Paper for Expert Group Meeting, Dhaka*

United Nations Leaf-let Published on the Year of the Family 1993